ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা
সাইয়েদ কুতুব শহীদ

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৩ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২২

প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৯৭

৮ম সংস্করণ

সফর	১৪২০
জ্যৈষ্ঠ	১৪০৬
জুন	১৯৯৯

বিনিময় ঃ ৯৩.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

معالم فى الطريق -এর বাংলা অনুবাদ

ISLAMI SAMAJ MIPLABER DHARA is a translation of MILE STONE by Sayyid Qutb of Egypt. Bengali Translated by Md. Abdul Khaleque Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 93.00 Only.

ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা বইখানি আরব জাহান তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ, হাফিয-এ কুরআন, প্রখর দীনি জ্ঞানসম্পন্ন আলেম, সুসাহিত্যিক, কবি, নিবন্ধকার এবং খ্যাতনামা সাংবাদিক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর যাঁকে এ মহাগ্রন্থ রচনার অপরাধে (!) তদানিন্তন মিসর সরকার ১৯৬৬ সালের ২৫শে আগষ্ট মৃত্যুদন্ড দেয়। معالم فى الطريق নামক বৈপ্লবিক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। গ্রন্থখানি ইংরেজীতে MILE STONE নামে অনূদিত হয়েছে। ইংরেজী থেকে সুসাহিত্যিক জনাব মরহুম মুহাম্মাদ আবদুল খালেক সাহেব বাংলায় ভাষান্তরিত করেছেন।

ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারীদের জন্যে বইখানি অতীব প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে। তাগুতের বিরুদ্ধে কিভাবে জিহাদ করতে হবে এবং কিভাবে ঈমানের পরীক্ষায় ব্যক্তির জান ও মাল তুচ্ছ হয়ে যায় তার মনোজ্ঞ বর্ণনায় বইখানি ভরপুর বইখানি মুসলিম মিল্লাতকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে ঈমানী দায়িত্ব পালনে কার্যকরভাবে সাহায্য করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এ মূল্যবান গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় ভাষান্তর করার মহান দায়িত্ব পালনের জন্যে আমরা তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। সাথে সাথে 'বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার' কর্তৃপক্ষকে—যাঁরা ভাষান্তরের পেছনে সক্রিয় প্রেরণা ও সহযোগিতা দান করেছেন তাঁদেরকেও মোবারকবাদ জনাচ্ছি। আমরা আশা করি বিপ্লবী পাঠক সমাজে বইখানি যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করবে।

—প্রকাশক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

গ্রন্থকার পরিচিতি

সাইয়েদ কুতুবের জন্ম, শিক্ষা ও কর্মজীবন

গ্রন্থকারের নাম সাইয়েদ। কুতুব তাঁর বংশীয় উপাধি। তাঁর পূর্বপুরুষগণ আরব উপদ্বীপ থেকে এসে মিসরের উত্তরাঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী ইবরাহীম কুতুব। ইবরাহীম কুতুবের পাঁচ সন্তান ছিল। সাইয়েদ কুতুব, মুহাম্মদ কুতুব, হামিদা কুতুব, আমিনা কুতুব। পঞ্চম কন্যা সন্তানটির নাম জানা যায়নি। সাইয়েদ কুতুব ভাই বোনদের মধ্যে বড়, তাঁরা সকল ভাই বোনই উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন; ইসলামী জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে জিহাদ করেন এবং কঠোর অগ্নি পরীক্ষায় ঈমানের দৃঢ়তার পরিচয় দেন।

সাইয়েদ কুতুব উনিশ শ' ছয় সালে মিসরের উসইউত জিলার মুশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আম্মা ফাতিমা হোসাইন উসমান অত্যন্ত দ্বীনদার ও আল্লাহভীরু মহিলা ছিলেন। সাইয়েদের পিতা হাজী ইবরাহীম চাষাবাদ করতেন কিন্তু তিনিও ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও চরিত্রবান।

গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাইয়েদ কুতুবের শিক্ষা শুরু হয়। মায়ের ইচ্ছানুসারে তিনি শৈশবেই কুরআন হেফজ করেন। পরবর্তীকালে তাঁর পিতা কায়রো শহরের উপকণ্ঠে হালওয়ান নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন। সাইয়েদ তাজহিযিয়াতু দারুল উলুম মাদ্রাসায় ভর্তি হন। উনিশ শ' উনত্রিশ সালে ঐ মাদ্রাসায় শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কায়রোর বিখ্যাত মাদ্রাসা দারুল উলুমে ভর্তি হন। উনিশ শ' তেত্রিশ সালে ঐ মাদ্রাসা থেকে বি. এ. ডিগ্রি লাভ করেন এবং সেখানেই অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

কিছুকাল অধ্যাপনা করার পর তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্কুল ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হন। মিসরে ঐ পদটিকে অত্যন্ত সম্মানজনক বিবেচনা করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকেই তাঁকে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি পড়া-শুনার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়। তিনি দু'বছরের কোর্স শেষ করে বিদেশ থেকে দেশে ফিরে আসেন। আমেরিকা থাকা কালেই তিনি বস্তুবাদী সমাজের দুরবস্থা লক্ষ্য করেন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, একমাত্র ইসলামই সত্যিকার অর্থে মানব সমাজকে কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারে।

আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার পরই তিনি ইখওয়ানুল মুসলেমুন দলের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী যাচাই করতে শুরু করেন। উনিশ শ' পয়তাল্লিশ সালে তিনি ঐ দলের সদস্য হয়ে যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার

যুদ্ধ শেষে মিসরকে স্বাধীনতা দানের ওয়াদা করেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ইখওয়ান দল বৃটিশের মিসর ত্যাগের দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। এর ফলে তাদের জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বেড়ে যায়। মাত্র দু'বছর সময়ের মধ্যে এ দলের সক্রিয় কর্মী সংখ্যা পঁচিশ লক্ষে পৌছে। সাধারণ সদস্য, সমর্থক ও সহানুভূতিশীলদের সংখ্যা ছিল কর্মী সংখ্যার কয়েকগুণ বেশী। বৃটিশ ও স্বৈরাচারী মিসর সরকার ইখওয়ানের জনপ্রিয়তা দেখে ভীত হয়ে পড়েন এবং এ দলের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

ইংরেজী উনিশ শ' উনপঞ্চাশ সালে ১২ই মার্চ দলের প্রতিষ্ঠাতা মোরশেদ-এ-আম উস্তাদ হাসানুল বান্না শাহাদাত বরণ করেন এবং ইখওয়ানুল মুসলিমুন বেআইনি ঘোষিত হয়।

ইংরেজী উনিশ শ' বায়ান্ন সালের জুলাই মাসে মিসরে সামরিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বছরই ইখওয়ান দল পুনরায় বহাল হয়ে যায়। ডঃ হাসানুল হোদাইবি দলের মোরশেদ-এ-আম নির্বাচিত হন। সাইয়েদ কুতুব ইখওয়ান দলের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত হন। দলের আদর্শ প্রচার ও আন্দোলনের সম্প্রসারণ বিভাগ তাঁর পরিচালনাধীনে অগ্রসর হতে থাকে। পরিপূর্ণরূপে নিজেকে আন্দোলনের কাজে উৎসর্গ করেন তিনি।

উনিশ শ' চুয়ান্ন সালে ইখওয়ান পরিচালিত সাময়িকী—"ইখওয়ানুল মুসলিমুন"-এর সম্পাদক নির্বাচিত হন সাইয়েদ কুতুব। ছ'মাস পরই কর্নেল নাসেরের সরকার পত্রিকাটি বন্ধ করে দেন। কারণ, ঐ বছর মিসর সরকার বৃটিশের সাথে নতুন করে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন, পত্রিকাটি তার সমালোচনা করে। পত্রিকা বন্ধ করে দেয়ার পর নাসের সরকার এ দলের উপর নির্যাতন শুরু করেন। একটি বানোয়াট হত্যা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযোগে ইখওয়ানুল মুসলিমুন দলকে বেআইনি ঘোষণা করে দলের নেতাদেব গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার ও নির্যাতন

গ্রেফতারকৃত ইখওয়ান নেতাদের মধ্যে সাইয়েদ কুতুবও ছিলেন। তাঁকে মিসরের বিভিন্ন জেলে রাখা হয়। গ্রেফতারের সময় তিনি ভীষণভাবে জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। সামরিক অফিসার তাঁকে সে অবস্থায়ই গ্রেফতার করেন। তাঁর হাতে পায়ে শিকল পরানো হয়। শুধু তাই নয়, সাইয়েদ কুতুবকে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় জেল পর্যন্ত হেঁটে যেতে বাধ্য করা হয়। পথে কয়েকবার বেহুঁশ হয়ে তিনি মাটিতে পড়ে যান। হুঁশ ফিরে এলে তিনি বলতেন ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ (আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ)।

জেলে ঢুকার সাথে সাথেই জেল কর্মচারীগণ তাঁকে মারপিট করতে শুরু করে এবং দু'ঘন্টা পর্যন্ত এ নির্যাতন চলতে থাকে। তারপর একটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরকে তাঁর উপর লেলিয়ে দেয়া হয়। কুকুর তাঁর পা কামড়ে ধরে জেলের আঙ্গিনায় টেনে নিয়ে বেড়ায়। এ প্রাথমিক অভ্যর্থনা জানানোর পর একটানা সাত ঘন্টা ব্যাপী তাঁকে জেরা করা হয়। তাঁর স্বাস্থ্য এসব নির্যাতন সহ্য করার যোগ্য ছিল না। কিন্তু তিনি তাঁর সুদৃঢ় ঈমানের বলে পাষাণ প্রাচীরের ন্যায় সব অমানুষিক অত্যাচার অকাতরে সহ্য করেন। তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হতে থাকে ঃ الله اكبر ولله الحمد। (আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ)।

জেলের অন্ধকার কুঠরী রাতে তালাবন্ধ করা হতো। আর দিনের বেলা তাঁকে রীতিমত প্যারেড করানো হতো। তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। বক্ষপীড়া, হৃদপিন্ডের দুর্বলতা ও সর্বাঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় ব্যাথা ইত্যাদি বিভিন্ন রোগে তিনি কাতর হয়ে পড়েন। তবু তাঁর গায়ে আগুনের ছেঁকা দেয়া হতে থাকে। পুলিশের কুকুর তাঁর শরীরে নখ ও দাঁতের আঁচড় কাটে। তাঁর মাথায় খুব গরম এবং পরক্ষণেই বেশী ঠান্ডা পানি ঢালা হতে থাকে। লাথি, কিল, ঘুষি, অশ্লীল ভাষায় গালাগালি ইত্যাদি তো ছিল দৈনন্দিন ব্যাপার।

উনিশ শ' পঞ্চান্ন সালের তেরই জুলাই, গণআদালতের বিচারে তাঁকে পনর বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়। অসুস্থতার দরুন তিনি আদালতে হাজির হতে পারেননি। তাঁর এক বছর কারাভোগের পর নাসের সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়া হয় যে, তিনি সংবাদপত্রের মাধ্যমে ক্ষমার আবেদন করলে তাঁকে মুক্তি দেয়া যেতে পারে। মর্দে মুমিন এ প্রস্তাবের যে জবাব দিয়েছিলেন, তা ইতিহাসের পাতায় অম্লান হয়ে থাকবে। তিনি বলেন ঃ

"আমি এ প্রস্তাব শুনে অত্যন্ত আশ্চার্যান্বিত হচ্ছি যে, মযলুমকে যালিমের নিকট ক্ষমার আবেদন জানাতে বলা হচ্ছে। আল্লাহর কসম ! যদি ক্ষমা প্রার্থনার কয়েকটি শব্দ আমাকে ফাঁসি থেকেও রেহাই দিতে পারে, তবু আমি এরূপ শব্দ উচ্চারণ করতে রাযী নই। আমি আল্লাহর দরবারে এমন অবস্থায় হাযির হতে চাই যে, আমি তাঁর প্রতি এবং তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট।"

পরবর্তীকালে তাঁকে যতবার ক্ষমা প্রার্থনার পরামর্শ দেয়া হয়েছে ততবারই তিনি একই কথা বলেছেন ঃ "যদি আমাকে যথার্থই অপরাধের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়ে থাকে, তাহলে আমি এতে সন্তুষ্ট আছি। আর যদি বাতিল শক্তি আমাকে অন্যায়ভাবে বন্দী করে থাকে, তাহলে আমি কিছুতেই বাতিলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো না।"

উনিশ শ' চৌষট্টি সালের মাঝামাঝি ইরাকের প্রেসিডেন্ট আবদুস সালাম আরিফ মিসর সফরে যান। তিনি সাইয়েদ কুতুবের মুক্তির সুপারিশ করায় কর্নেল নাসের তাঁকে মুক্তি দিয়ে তাঁরই বাসভবনে অন্তরীণাবদ্ধ করেন।

আবার গ্রেফতার ও দন্ড

এক বছর যেতে না যেতেই (?) তাঁকে আবার বলপূর্বক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। অথচ তিনি তখনও পুলিশের কড়া পাহারাধীন ছিলেন। শুধু তিনি নন, তাঁর ভাই মুহাম্মাদ কুতুব, বোন হামিদা কুতুব ও আমিনা কুতুবসহ বিশ হাযারেরও বেশী লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিলো। এদের মধ্যে প্রায় সাত শ' ছিলেন মহিলা।

উনিশ শ' পয়ষট্টি সালে কর্নেল নাসের মস্কো সফরে থাকাকালীন এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, ইখওয়ানুল মুসলিমুন তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আর এই ঘোষণার সাথে সাথেই সারা মিসরে ইখওয়ান নেতা ও কর্মীদের ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। উনিশ শ' চৌষট্টির ছাব্বিশে মার্চে জারীকৃত একটি নতুন আইনের বলে প্রেসিডেন্টকে যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার, তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ প্রভৃতি দন্ডবিধানের অধিকার প্রদান করা হয়। তার জন্যে কোন আদালতে প্রেসিডেন্টের গৃহীত পদক্ষেপের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা যাবে না বলেও ঘোষণা করা হয়। কিছুকাল পর বিশেষ সামরিক আদালতে তাদের বিচার শুরু হয়। প্রথমত ঘোষণা করা হয় যে, টেলিভিশনে ঐ বিচারানুষ্ঠানের দৃশ্য প্রচার করা হবে। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ অপরাধ স্বীকার করতে অস্বীকার এবং তাদের প্রতি দৈহিক নির্যাতনের বিবরণ প্রকাশ করায় টেলিভিশন বন্ধ করে দেয়া হয়। তারপর রুদ্ধদার কক্ষে বিচার চলতে থাকে। আসামীদের পক্ষে কোন উকিল ছিল না। অন্য দেশ থেকে আইনজীবীগণ আসামী পক্ষ সমর্থনের আবেদন করেন। কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। ফরাসী বার এসোসিয়েশনের ভূতপূর্ব সভাপতি উইলিয়াম থরপ (Thorp) ও মরোক্কোর দু'জন আইনজীবী আসামী পক্ষ সমর্থনের জন্য রীতিমত আবেদন করেন। কিন্তু তা না মঞ্জুর করা হয়। সুদানের দু'জন আইনজীবী কায়রো পৌছে তথাকার বার এসোসিয়েশনে নাম রেজিষ্ট্রী করে আদালতে হাযির হন। পুলিশ তাঁদের আদালত থেকে ধাক্কা মেরে বের করে দেয় এবং মিসর ত্যাগ করতে বাধ্য করে। সাইয়েদ কুতুব ও অন্যান্য আসামীগণ উনিশ শ' ছেষট্টি সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে বিচার চলাকালে ট্রাইবুনালের সামনে প্রকাশ করেন যে, অপরাধ স্বীকার করার জন্যে তাঁদের উপর অমানুষিক দৈহিক নির্যাতন চালানো হয়। ট্রাইবুনালের সভাপতি আসামীদের কোন কথার প্রতিই কান দেননি।

ইংরেজী উনিশ শ' ছেষট্টি সালের আগস্ট মাসে সাইয়েদ কুতুব ও তাঁর দু'জন সাথীকে সামরিক ট্রাইবুনালের পক্ষ থেকে মৃত্যুদন্ডাদেশ শুনানো হয়। সারা দুনিয়ায় প্রতিবাদের ঝড় উঠে। কিন্তু পঁচিশে আগস্ট, উনিশ শ' ছেষট্টি সালে ঐ দন্ডাদেশ কার্যকর করা হয়।

সাইয়েদ কুতুবের জ্ঞান ও সাহিত্য চর্চা

সাইয়েদ কুতুব মিসরের প্রখ্যাত আলেম ও সাহিত্যিকদের অন্যতম। শিশু সাহিত্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূচনা। ছোটদের জন্যে আকর্ষণীয় ভাষায় নবীদের কাহিনী লিখে তিনি প্রতিভার পরিচয় দেন। শিশুদের মনে ইসলামী ভাবধারা জাগানোর জন্যে এবং তাদের চারিত্রিক মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তিনি গল্প লিখেন। পরবর্তীকালে 'আশওয়াক' (কাঁটা) নামে ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট একখানা উপন্যাস রচনা করেন। পরে ঐ ধরনের আরও দু'টো উপন্যাস রচনা করেন। একটি 'তিফলে মিনাল ক্বারীয়া' (গ্রামের ছেলে) ও অন্যটি 'মাদিনাতুল মাসহুর' (যাদুর শহর)।

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

(১) مشاهد القيامة فى القران (কুরআনের আঁকা কেয়ামতের দৃশ্য)।

কুরআন পাকের ১১৪টি সূরার মধ্য থেকে ৮০টি সূরার ১৫০ স্থানে কেয়ামতের আলোচনা রয়েছে। সাইয়েদ বিপুল দক্ষতার সাথে সেসব বিবরণ থেকে হাশরের ময়দান, দোযখ ও বেহেশতের চিত্র এঁকেছেন।

(২) التصوير الفنى فى القران —২০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত গ্রন্থখানায় সাইয়েদ কুতুব কুরআনের ভাষা, ছন্দ, অলংকার ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনাভঙ্গীর আলোচনা করেছেন।

(৩) العدالة الاجتماعية فى الاسلام (ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার)। এ পর্যন্ত বইখানার ৭ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বইখানা অনূদিত হয়েছে। (যথা ঃ ইংরেজী, ফারসী, তুর্কী ও উর্দুভাষায়)।

(৪) تفسير فى جلال القران —সাইয়েদ কুতুবের এক অনবদ্য অবদান। আট খন্ডে সমাপ্ত এক জ্ঞানের সাগর। ঠিক তাফসীর নয়—বরং কুরআন অধ্যয়নকালে তাঁর মনে যেসব ভাবের উদয় হয়েছে তা-ই তিনি কাগজের বুকে এঁকেছেন এবং প্রতিটি আয়াতের ভিতরে লুকানো দাওয়াত, সংশোধনের উপায়, সতর্কীকরণ, আল্লাহর পরিচয় ইত্যাদি বিষয়ে নিপুণতার সাথে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

(৫) معركة الاسلام و الراسمالية (ইসলাম ও পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব)।

(৬) و السلام العالمى و الاسلام (বিশ্বশান্তি ও ইসলাম)।

(৭) دراسات اسلامية (ইসলামী রচনাবলী)।

(৮) النقد الادبى اصوله و مناهجه (সাহিত্য সমালোচনার মূলনীতি ও পদ্ধতি)।

(৯) نقد كتاب مستقبل الثقافة ('ভবিষ্যত সংস্কৃতি' নামক পুস্তকের সমালোচনা)।

(১০) كتاب و شخصية (গ্রন্থাবলী ও ব্যক্তিত্ব)।

(১১) نحو مجتمع اسلامى (ইসলামী সমাজের চিত্র)।

(১২) امريك التى رائيت (আমি যে আমেরিকা দেখেছি)।

(১৩) الاطياف الاربع (চার ভাই বোনের চিন্তাধারা)। এতে সাইয়েদ কুতুব, মুহাম্মাদ কুতুব, আমিনা কুতুব ও হামিদা কুতুবের রচনা একত্রে সংকলিত হয়েছে।

(১৪) قافلة الرقيق (কবিতা গুচ্ছ)।

(১৫) القصص الدينية (নবীদের কাহিনী)।

(১৬) حلم الفجر (কবিতা গুচ্ছ)।

(১৭) الشاطئ المجهول (কবিতা গুচ্ছ)।

(১৮) مهمة الشاعر فى الحيات (জীবনে কবির আসল কাজ)।

(১৯) معالم فى الطريق (সমাজ বিপ্লবের ধারা)।

معالم فى الطريق পুস্তক লেখার জন্যেই মিসর সরকার সাইয়েদ কুতুবকে অভিযুক্ত করেন ও ঐ অভিযোগে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। মিসরে সামরিক বাহিনীর পত্রিকা مجلة العوات المسحه পয়ষট্টির ১লা অক্টোবরে প্রকাশিত ৪৪৬নং সংখ্যায় তাঁর বিরুদ্ধে অতীত অভিযোগের যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাতে যা বলা হয়েছে, তার সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

"লেখক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সমাজ এবং মার্কসীয় মতবাদ উভয়েরই তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তিনি দাবী করেন যে, ঐসব মতবাদের মধ্যে মানব জাতির জন্য কিছুই নেই। তাঁর মতে বর্তমান দুনিয়া জাহেলিয়াতে ডুবে গেছে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের জায়গায় অন্যায়ভাবে মানুষের সার্বভৌমত্ব কায়েম হয়ে

গেছে। লেখক কুরআনের দৃষ্টিভংগীকে পুনরুজ্জীবিত করে সে জাহেলিয়াতকে উচ্ছেদ করার উপর জোর দেন এবং এ জন্যে নিজেদের যথাসর্বস্ব কুরবানী করে দেয়ার আহবান জানান।

তিনি আল্লাহ ব্যতীত সকল শাসনকর্তাদের তাগুত আখ্যা দেন। লেখক বলেন—তাগুতের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা প্রতিটি মুসলমানের জন্যে ঈমানের শর্ত। তিনি ভাষা, গাত্রবর্ণ, বংশ, অঞ্চল ইত্যাদির ভিত্তিতে ঐক্যবোধকে ভ্রান্ত আখ্যা দিয়ে ইসলামী আকীদার ভিত্তিতে ঐক্য গড়া এবং এ মতবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করার জন্যে মুসলিমদের উস্কানী দিচ্ছেন।

লেখক তাঁর ঐ পুস্তকের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, সারা মিসরে ধ্বংসাত্মক কাজ শুরু করা ও প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা পেশ করেন।"

ভূমিকা

মানবতার দুরবস্থা

মানবজাতি আজ একটি অতলান্ত খাদের প্রান্তদেশে এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান কালের ধ্বংসলীলা তাকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিতে উদ্যত হয়েছে বলেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। বরং এ অবস্থাটা রোগের একটা লক্ষণ মাত্র। প্রকৃত রোগ এটা নয়। মানবজাতি আজ যে বিপদের সম্মুখীন তার মূল কারণ হচ্ছে এই যে, তারা নিজেদের সার্বিক উন্নয়ন ও সত্যিকার অগ্রগতির জন্য জীবনের যে মূল্যবোধ প্রয়োজন, তা হারিয়ে ফেলেছে। এমনকি পাশ্চাত্য জগতের কাছে তাদের আধ্যাত্মিক দেউলিয়াপনা সুস্পষ্ট হয়ে পড়েছে এবং তারা আজ অনুভব করছে যে, মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালনার উপযোগী জীবনের কোন মূল্যবোধ তাদের কাছে নেই। তারা জানে যে, তাদের নিজেদের বিবেককে পরিতুষ্ট করা ও তার স্বকীয়তা টিকিয়ে রাখার মত কোন মূলধনই তাদের কাছে নেই।

পাশ্চাত্য দেশে গণতন্ত্র নিষ্ফল ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে ; যার ফলে প্রাচ্যের চিন্তাধারা, মতবাদ ও জীবন বিধান গ্রহণ করতে তারা বাধ্য হচ্ছে বলে মনে হয়। তার সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে এই যে, সমাজতন্ত্রের নামে প্রাচ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তারা পাশ্চাত্যে চালু করছে। প্রাচ্যজোটেরও ঐ একই দশা। তারা সমাজ বিধান, বিশেষত মার্কসীয় মতবাদ সূচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিপুল সংখ্যক মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। কারণ এ মতবাদ একটা সুনির্দিষ্ট মৌল বিশ্বাসের ভিত্তিতে রচিত হয়।

কিন্তু চিন্তার সমতল ভূমিতে মার্কসীয় মতবাদ পরাজয় বরণ করে নিয়েছে। একথা বলা আজ মোটেই অত্যুক্তি নয় যে, বর্তমান দুনিয়ায় কোন একটি দেশও সত্যিকার মার্কসপন্থী নয়। এ মতবাদ সার্বিকভাবে মানুষের জন্মগত স্বভাব ও তার মৌলিক প্রয়োজনের পরিপন্থী। মার্কসীয় আদর্শ শুধুমাত্র অধঃপতিত অথবা দীর্ঘকাল যাবত একনায়কত্বের যাতাকলে নিষ্পিষ্ট নিষ্প্রাণ সমাজেই প্রসার লাভ করতে পারে। কিন্তু বর্তমানে ঐরূপ সমাজেও এর বস্তুবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমস্যার সমাধান দানে ব্যর্থ হচ্ছে। অথচ বস্তুবাদী অর্থনীতিই মার্কসীয় মতবাদের ভিত্তি। কম্যুনিষ্ট দেশগুলোর উস্তাদ রাশিয়াই আজ খাদ্যাভাবের সম্মুখীন। জারের শাসনামলে যে রাশিয়া উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদন করতো, সে দেশই আজ তার সংরক্ষিত স্বর্ণের বিনিময়ে বিদেশ থেকে খাদ্য

আমদানী করছে। সমবায় খামারভিত্তিক চাষাবাদই এ ব্যর্থতার কারণ। অন্য কথায় বলা যায় মানব স্বভাবের বিপরীতধর্মী ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলেই মার্কসীয় মতবাদ ব্যর্থতার সম্মুখীন।

নয়া নেতৃত্বের প্রয়োজন

মানবজাতি আজ নতুন নেতৃত্ব চায়। পাশ্চাত্যের নেতৃত্ব আজ ক্ষয়িষ্ণু। এর কারণ, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বস্তুগত দারিদ্র অথবা আর্থিক ও সামরিক শক্তির দুর্বলতা নয়। পাশ্চাত্য জগত মানবজাতির নেতৃত্বের আসন এ জন্যে ছাড়তে বাধ্য হয়েছে যে, জীবনী শক্তি সঞ্চারকারী যেসব মৌলিক গুণাবলী তাকে একদিন নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল, সেসব গুণ আজ তার কাছে নেই।

অনাগত দিনের নতুন নেতৃত্বকে ইউরোপের সৃজনশীল প্রতিভার অবদানগুলোকে সংরক্ষণ ও উন্নয়নের সাথে সাথে মানবজাতির সামনে এমন মহান আদর্শ ও মূল্যবোধ পেশ করতে হবে, যা আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে। আর ভবিষ্যতের নেতৃত্বকে মানবজাতির সামনে একটি ইতিবাচক, গঠনমূলক ও বাস্তব জীবন বিধান পেশ করতে হবে, যা মানব স্বভাবের সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যশীল।

একমাত্র ইসলামী ব্যবস্থাই উল্লিখিত মূল্যবোধ ও জীবন বিধান দান করতে সক্ষম।

বিজ্ঞানের প্রতাপও শেষ হয়ে এসেছে। ষোড়শ শতকে যে রেনেসাঁ আন্দোলন সূচিত হয়ে আঠারো ও উনিশ শতকে বিজয়ের উঁচু শিখরে পৌঁছে গিয়েছিল, তা আজ নিষ্প্রভ হয়ে পুনরুজ্জীবন শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। আধুনিক যুগে যেসব জাতীয়তাবাদী ও উগ্র স্বাদেশিকতাবাদী মতবাদ জন্ম নিয়েছে এবং এগুলোকে ভিত্তি করে যেসব আন্দোলন ও জীবনযাত্রা প্রণালী গড়ে উঠেছে, সবগুলোই আজ নির্জীব হয়ে পড়েছে। সংক্ষেপে বলতে হয়, মানুষের তৈরী সকল জীবন বিধানই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

এ নাজুক ও বিভ্রান্তিকর ক্রান্তিলগ্নে ইসলাম ও মুসলিম সমাজের নিজ দায়িত্ব পালনের সময় এসেছে। ইসলাম কখনো সৃষ্টজগতকে বস্তুসম্ভার আবিষ্কারে বাধা দেয়নি। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে মানুষকে খিলাফতের দায়িত্বসহ প্রেরণের সময়ই মানবজাতিকে সৎপথ দেখানোর দায়িত্ব দিয়েছেন। আর এ দায়িত্ব পালনকে কয়েকটি শর্তাধীনে আল্লাহর ইবাদাত বলেই ঘোষণা করেছেন। শুধু তাই নয়, এটাই মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বলেও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط

আর তোমার প্রতিপালক যে সময় ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি ধরা পৃষ্ঠে আমার খলীফা প্রেরণ করতে যাচ্ছি।—আল বাকারা ঃ ৩০

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ـ الذّٰرِيٰت : ٥٦

আর জ্বিন ও মানবজাতিকে আমি আমার বন্দেগী ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।—আয যারিয়াত ঃ ৫৬

এতো গেল খিলাফত ও বন্দেগীর কথা। কিন্তু সাথে সাথে মানবজাতির প্রতি আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহদের উপর যে দায়িত্ব পালনের ভার দিয়েছেন, তাও পূরণ করার সময় এসেছে।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط— البقرة : ١٤٣

এভাবে তোমাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি যেন তোমরা মানবজাতির প্রতি স্বাক্ষী হতে পার এবং রাসূল তোমাদের উপর স্বাক্ষী থাকতে পারেন।—আল বাকারা ঃ ১৪৩

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط— ال عمران ١١٠

তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্যেই তোমাদের উত্থান। তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেবে, অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাসী হবে।

—আলে ইমরান ঃ ১১০

ইসলামের ভূমিকা

কোন একটি সমাজ তথা জাতির বুকে বাস্তবে রূপ লাভ না করে ইসলাম তার ভূমিকা পালন করতে পারে না। বিশেষভাবে বর্তমান যুগের মানুষ নিছক প্রশংসা শুনে কোন মতবাদ গ্রহণ করতে রাযী হয় না। তারা বাস্তবে রূপায়িত ব্যবস্থাকেই সহজে বিচার করতে পারে। এ দৃষ্টিভংগী থেকে আমরা বলতে পারি যে, বিগত কয়েক শতক যাবত মুসলিম জাতি তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। আর ঐ কারণেই বর্তমানে তারা এমন একটি ভূখন্ড দেখাতে সক্ষম হবে না যেখানে ইসলাম তার পূর্ণ সত্তায় বিরাজমান। আজকের মুসলমানদেরকে দেখলে একথা বিশ্বাসই হয় না যে, তাদের নিকট অতীতের

পূর্বপুরুষেরা ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান এমন একদল লোকের নাম, যাদের চাল-চলন, ধ্যান-ধারণা, আইন-কানুন ও মূল্যবোধ সবকিছুই ইসলামী উৎস থেকে গৃহীত। যে মুহূর্তে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান পৃথিবীর উপর থেকে অপসারিত হয়েছে, সে মুহূর্ত থেকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মুসলিম দল ধরা পৃষ্ঠ থেকে বিলীন হয়ে গেছে।

ইসলামকে পুনরায় মানবজাতির নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে মুসলিম উম্মাতকে তার আসল রূপ পুনরুদ্ধার করতে হবে। মুসলিম উম্মাত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানব রচিত রীতিনীতির আবর্জনায় চাপা পড়ে রয়েছে। ইসলামী শিক্ষার সাথে যেসব ভ্রান্ত আইন-কানুন ও আচার-আচরণের দূরতম সম্পর্কও নেই, সেগুলোরই গুরুভারে আজ মুসলমান উম্মাত নিষ্পিষ্ট। তবু মুসলমানেরা নিজেদের এলাকাকে ইসলামী জগত আখ্যা দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

আমি জানি, নিজেদের পুনর্গঠন ও মানবজাতির নেতৃত্ব পুনরুদ্ধার করণ—এ দু'টো কাজের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। কারণ, দীর্ঘকাল যাবৎ মুসলমান উম্মাতের অস্তিত্ব দৃশ্যমান জগত থেকে বিলুপ্ত। এবং মানবগোষ্ঠীর নেতৃত্ব অনেক আগেই অন্যান্য আদর্শ, অনৈসলামিক ধ্যান-ধারণা, ভিন্ন ধরনের জীবন বিধান ও অমুসলিম জাতিগুলোর করায়ত্ব হয়ে রয়েছে।

আলোচ্য সময়ে ইউরোপীয় প্রতিভা বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, আইন-কানুন ও বস্তুতান্ত্রিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে চমৎকার উন্নতি সাধন করেছে এবং এরই ফলে মানব সমাজ সৃষ্টি শক্তি ও বস্তুগত সুবিধার উপকরণ নির্মাণ কৌশল অনেক উপরে উঠে গেছে। এসব চমৎকার উপকরণ আবিষ্কারের দোষক্রটির প্রতি ইশারা করা সহজ নয়। বিশেষ করে ইসলামী জগত যখন সৃজনশীল প্রতিভা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত, তখন পাশ্চাত্য দেশীয় যান্ত্রিক উপকরণ আবিষ্কারকদের সমালোচনা আরও বেশী কঠিন।

কিন্তু এসব বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও ইসলামী ইনকেলাব অত্যাবশ্যক। ইসলামী আদর্শের পুনরুজ্জীবন ও বিশ্বনেতৃত্বের আসন পুনরুদ্ধারের মধ্যে বিরাট ব্যবধান ও অশেষ বাধা-বিঘ্ন অবশ্যই আছে। তবু প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ইসলামী আদর্শের পুনরুজ্জীবন সাধনের জন্যে সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করা দরকার।

বিশ্ব নেতৃত্বের জন্যে প্রয়োজনীয় গুণাবলী

যদি জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি সহকারে আমরা কাজ করতে চাই, তাহলে মুসলিম উম্মাতের উপর আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশ্ব নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের জন্যে কোন্ কোন্

গুণাবলী অর্জন করা দরকার, তা আমাদের অবশ্যই জেনে নিতে হবে। সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজ শুরু করতে গিয়ে যেন হোঁচট খেতে না হয়, সে জন্যেই আমাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা দরকার।

আজকের মুসলিম উম্মাত মানবজাতির সামনে বস্তুতান্ত্রিক আবিষ্কারের যোগ্যতা অথবা সম্ভাবনাময় প্রতিভা প্রদর্শনে অক্ষম। বর্তমান দুনিয়ার মানবসমাজ মুসলিম উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে তাকে নেতৃত্বের আসন দান করবে, এ অক্ষমতার জন্য তার এরূপ আশা বাতুলতা মাত্র। এ ক্ষেত্রে ইউরোপের সৃজনশীল মস্তিষ্ক অনেক দূর অগ্রসর এবং পরবর্তী কয়েক শতক পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় ইউরোপকে পরাজিত করে যান্ত্রিক উন্নতির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার কল্পনাও আমরা করতে পারি না। তাই আমাদেরকে এমন সব গুণাবলী অর্জন করতে হবে যা আধুনিক সভ্যতায় বিরল।

তাই বলে বস্তুতান্ত্রিক উন্নতির বিষয়টিকে আমরা মোটেই অবহেলা করবো না। বরং আমরা পার্থিব সুখ-সুবিধার প্রতিও যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করবো। কারণ শুধু মানবজাতির নেতৃত্ব প্রদানের জন্যেই বৈষয়িক উন্নতি জরুরী নয়। উপরন্তু নিজেদের এবং ইসলামের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যেও এটা অপরিহার্য। ইসলাম মানুষকে পৃথিবীর বুকে আল্লাহর খলীফার মর্যাদা দিয়েছে এবং খলীফার দায়িত্ব পালন ও আল্লাহর বন্দেগী করাকে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেছে। তাই আল্লাহর খলীফা হিসেবে তাঁর দুনিয়ার উন্নতি সাধন আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক।

মানবজাতির নেতৃত্বদানের জন্যে আমাদের বৈষয়িক উন্নতি ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু পেশ করতে হবে। তা হচ্ছে মানব জীবন সম্পর্কে মৌলিক বিশ্বাস (ঈমান) এবং সে বিশ্বাসের ভিত্তিতে রচিত একটি জীবন বিধান। এ বিধান আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার সকল অবদান সংরক্ষণ করবে। সাথে সাথে মানবজাতির মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষের আরাম-আয়েশের যে চমৎকার উদ্যোগ আয়োজন করেছে, তার মান বজায় রাখতে সক্ষম হবে। আর এ বিশ্বাস (ঈমান) ও জীবন বিধান মানব সমাজে তথা মুসলিম সমাজে বাস্তব রূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করবে।

আধুনিক যুগের জাহেলিয়াত

আধুনিক জীবন যাত্রার উৎসমূলের দিকে লক্ষ্য করলে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, গোটা বিশ্বই আজ জাহেলিয়াতের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং সুখ-সুবিধার সকল আধুনিক উপায় উপকরণ ও চমৎকার উদ্ভাবনী প্রতিভার পাশাপাশি অজ্ঞতাও সুস্পষ্টরূপে দৃশ্যমান। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহাত্মক আচরণই জাহেলিয়াতের প্রমাণ। এর ফলে আল্লাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ সার্বভৌমত্ব মানুষের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক মানুষ মানব সমাজের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। অবশ্য এ জাহেলিয়াত প্রাচীন ও প্রাথমিক যুগের মত আল্লাহকে সরাসরি অস্বীকার করে না। বরং বাস্তবে ভাল-মন্দের মান নির্ণয়, সমষ্টিগত জীবনের জন্যে আইন প্রণয়ন, জীবন বিধান রচনা ও নির্বাচনের অধিকার দাবীর মাধ্যমে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়। কারণ আলোচ্য বিষয়গুলোতে আল্লাহ যে নির্দেশাবলী দিয়েছেন, তা প্রত্যাখ্যান করেই কোন মানুষ এ কাজগুলো করতে পারে। আল্লাহর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহের অনিবার্য পরিণতিই হচ্ছে তার সৃষ্টির উপর যুলুম ও নির্যাতন।

কম্যুনিষ্ট সমাজে মানবতার প্রতি করা হয় চরম লাঞ্ছনা এবং পুঁজিবাদী সমাজের অর্থলোভ ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের দরুন সাধারণ মানুষ ও দুর্বল জাতিগুলোর প্রতি করা হয় নির্মম শোষণ নিষ্পেষণ। আল্লাহর কর্তৃত্বের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা এবং মানুষের আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদা অস্বীকার করার এ হচ্ছে অনিবার্য পরিণতি।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, ইসলামই একমাত্র জীবন বিধান। কারণ অন্যান্য জীবন বিধানের অধীনে কোন না কোন প্রকারে মানুষ মানুষেরই দাসত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। একমাত্র ইসলামী জীবন বিধানেই মানুষ মানুষের দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে শুধু মাত্র আল্লাহরই বিধি-নিষেধ মুতাবেক শুধু তারই সমীপে নতি স্বীকার করে তাঁর বন্দেগী করতে সমর্থ হয়।

ইসলাম ও জাহেলিয়াতের পার্থক্য

এখান থেকেই ইসলামের যাত্রাপথ অন্যান্য জীবন বিধান থেকে পৃথক হয়ে যায়। জীবন সম্পর্কিত এ নতুন দৃষ্টিভংগীর ভিত্তিতে রচিত ও বাস্তব জীবনের পরিপূর্ণ উপযোগী জীবন বিধানই আমরা মানব সমাজের সামনে তুলে ধরতে পারি। বর্তমান মানব সমাজ ইসলামের এ মৌলবাণী সম্পর্কে অজ্ঞ। পাশ্চাত্যের আবিষ্কারকগণ ইউরোপীয় অথবা প্রাচ্য প্রতীচ্যের প্রতিভাধর ব্যক্তিদের চিন্তাপ্রসূত এ জীবন দর্শন নয়।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আমরা যে জীবন দর্শনে বিশ্বাসী, তা সকল দিক থেকেই পূর্ণাংগ। বিশ্ববাসীর নিকট ইসলামের এ বৈশিষ্ট্য আজও অজ্ঞাত। আর তারা এর চাইতে উত্তম বা এর সমকক্ষ কোন জীবন বিধান পেশ করতে সক্ষম নয়।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, বিশেষ এলাকায় ইসলাম বাস্তবে রূপায়িত না হলে এ ব্যবস্থার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় না। তাই এ

ব্যবস্থার অধীনে একটি সমাজ গড়ে তুলে দুনিয়ার সামনে নমুনা পেশ করা একান্ত প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই কোন একটি মুসলিম দেশে ইসলামী সমাজের পুনঃ প্রবর্তন জরুরী। অদূর অথবা সুদূর ভবিষ্যতে ইসলামী সমাজের পুনরুজ্জীবনকামী দলই বিশ্বের নেতৃত্ব লাভ করবে।

ইসলামী সমাজের পুনরুজ্জীবন

ইসলামী সমাজের পুনরুজ্জীবন কিভাবে সম্ভব ? এ জন্যে একটি অগ্রগামী দলকে নিজেদের গন্তব্যস্থল ঠিক করে নিয়ে জাহেলিয়াতের বিশ্বগ্রাসী অকূল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। চলার পথে এ দলের সৈনিকরা সর্বব্যাপী জাহেলিয়াতের ছোঁয়া থেকে নিজেদের হেফাযত করে চলবেন এবং একই সাথে তা থেকে সাহায্যও নেবেন।

এ অগ্রগামী দলকে অবশ্যই যাত্রা শুরু করা সঠিক স্থান, সার্বিক পথের দিশা, এর গলি, উপগলি, চলার পথের সকল বিপদ-আপদ এবং দীর্ঘ ও কষ্টকর সফরের উদ্দেশ্য জেনে নিতে হবে। শুধু তাই নয়, সারা দুনিয়ার জাহেলিয়াত কোথায় কি পরিমাণ শিকড় বিস্তার করেছে, কখন কার সাথে কি পরিমাণ সহযোগিতা করতে হবে এবং কোন্ সময় তাদের নিকট হতে পৃথক হতে হবে, কোন্ কোন্ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করা প্রয়োজন এবং পরিবেষ্টনকারী জাহেলিয়াতের কি কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, জাহেলিয়াতের ধারক বাহকদের সাথে কোন্ ভাষায় আলাপ করতে হবে, কোন্ কোন্ বিষয় ও সমস্যা আলোচ্য সূচীতে স্থান লাভ করবে এবং কিভাবে কোথা থেকে প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ গ্রহণ করতে হবে; এসব বিষয়েই পরিপূর্ণ ধারণা নিয়ে ময়দানে নামতে হবে।

আমাদের ঈমানের শক্তির উৎস হচ্ছে পাক কুরআনের মৌলিক শিক্ষা। যে কুরআনের শিক্ষা ও বাণী থেকে স্বর্ণ যুগে ইসলামের পতাকাবাহীগণের মনে আলোর মশাল জ্বলে উঠেছিল—তাই হবে আমাদের পাথেয়। এ পাথেয় সম্বল করেই অতীতে আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তিগণ আল্লাহরই নির্দেশে মানব ইতিহাসের গতি পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আমি এ বিপ্লবের অগ্রনায়কদের উদ্দেশ্যেই এ গ্রন্থ রচনা করেছি এবং এতে প্রয়োজনীয় বাস্তব কর্মপন্থাও পেশ করার চেষ্টা করেছি।

'ফী যিলালীল কুরআন' শীর্ষক আমার লেখা অপর একখানা গ্রন্থের চারটি অধ্যায়কে আলোচ্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যশীল করার উদ্দেশ্যে দু'চার জায়গায় সামান্য পরিবর্তন করে এ গ্রন্থের রূপ দেয়া হয়েছে।

এর ভূমিকা এবং অন্যান্য অধ্যায়গুলো আমি বিভিন্ন সময়ে লিখেছিলাম, পবিত্র কুরআনের উপস্থাপিত জীবন দর্শন সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করার সময় আমি যে সুগভীর সত্য উপলব্ধি করেছি, তাই এখানে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। আমার এ চিন্তারাশি আপাত দৃষ্টিতে এলোপাতাড়ি এবং পরস্পর যোগসূত্রবিহীন মনে হতে পারে। তবে একটি সত্য কথা এই যে, আমার চিন্তাগুলো চলার পথের পাথেয় এবং পরিত্যাজ্য পথের পরিচায়ক। আমার এ লেখাগুলো এক ধারাবাহিক রচনার প্রথম কিস্তি মাত্র। ভবিষ্যতে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্যে আমি এ বিষয়ে আরও কিছু লেখার ইচ্ছা পোষণ করি।

আর আল্লাহ্ তাআলার রহমাতই এ কাজের প্রধান সম্বল।

গ্রন্থকার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

পবিত্র কুরআনের বাণীবাহক দল

সকল যুগে ও সকল দেশেই যারা ইসলামের বাণী প্রচার করবেন তাদেরকে অবশ্যই মানব সমাজের নিকট দাওয়াত পেশ করার পদ্ধতি জেনে নিতে এবং এ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পেতে হবে। কুরআন এক সময় সৃষ্টি করেছিল একদল লোক। তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবায়ে কেরাম (রা)। শুধু ইসলামের ইতিহাসে নয়, গোটা মানবজাতির ইতিহাসে এ স্মরণীয় ব্যক্তিদের কোন তুলনা নেই। ইসলামের সে স্বর্ণযুগের পর তাঁদের মত সর্বগুণান্বিত মানুষের কোন দলই দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেননি। অবশ্য একথা সত্য যে, বিভিন্ন যুগে পৃথিবীর নানা স্থানে ঐ ধরনের দু'চারজন মনীষী জন্মেছেন কিন্তু কখনো স্বর্ণযুগের মত উল্লেখিত উচ্চমানের গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কোন সুসংগঠিত দল ইতিহাসের কোন যুগেই দেখা যায়নি।

এ এক অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক সত্য। তাই বিষয়টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে আমাদের এর রহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে।

সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর সমতুল্য লোক দেখা যায় না কেন ?

পবিত্র কুরআনের বাণী আজও আমাদের নিকট অবিকৃত অবস্থায় মওজুদ রয়েছে। তাছাড়া রাসূলে করীম (সা)-এর হাদীস, বাস্তব কর্মজীবন সম্পর্কে তাঁর নির্দেশাবলী এবং তাঁর জীবনবৃত্তান্ত সবকিছুই আমাদের নিকট সংরক্ষিত আছে। সোনালী যুগের মুসলিম উম্মাতের সামনে কুরআনের বাণী ও রাসূল (সা)-এর শিক্ষা যেভাবে ছিল, ঠিক সেভাবে আমাদের নিকটও আছে। শুধু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দৈহিক সত্তা আমাদের মধ্যে উপস্থিত নেই। এ কারণেই কি দুনিয়ার কোন দেশেই ইসলামী সমাজ পূর্ণাংগরূপে কায়েম নেই ?

আল্লাহর বিধানের বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দৈহিক উপস্থিতি অপরিহার্য হলে আল্লাহ তাআলা কখনো ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে দুনিয়ার সকল মানুষের জন্যে একমাত্র দ্বীন হিসেবে অবতীর্ণ করতেন না এবং এটাকে দুনিয়াবাসীদের জন্যে সর্বশেষ প্রত্যাদিষ্ট বাণী এবং সকল কাল ও যুগোপযোগী দ্বীন বলেও ঘোষণা করতেন না।

আল্লাহ তাআলা স্বয়ং পবিত্র কুরআন হেফাযত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কারণ, তিনি জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তেকালের পরও ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়িত হয়ে মানব জাতির কল্যাণ সাধন করতে পারবে। আল্লাহ তাআলা এ জন্যেই ২৩ বছরের নবুয়াতী জীবনের পর তাঁর প্রিয় রাসূল (সা)-কে নিজের দরবারে ডেকে নেন এবং ঘোষণা করেন যে, ইসলাম পৃথিবীর অস্তিত্বের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দৈহিক অনুপস্থিতি ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়নের পথে কোন বাধা নয়।

প্রথম কারণ ঃ এর প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে গিয়ে প্রথমেই দেখা যাবে স্বর্ণ যুগের মুসলমানগণ যে স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা থেকে তাদের পিপাসা মিটিয়ে ছিলেন, সে পানির সাথে অন্যান্য পদার্থ মিশে গেছে। সে যুগের মুসলমানরা কি প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন, তাও আমাদের খুঁজে দেখতে হবে। হয়তো বা প্রশিক্ষণ পদ্ধতিও ভেজাল মিশ্রিত হয়ে গেছে।

যে প্রস্রবণ থেকে সাহাবায়ে কেরাম আকণ্ঠ আব-ই হায়াত পান করেছিলেন তাহচ্ছে পবিত্র কুরআন। আবার বলছি, তা শুধুমাত্র কুরআন। কারণ, হাদীস ও রাসূল (সা)-এর দেয়া নির্দেশাবলী ঐ প্রস্রবণেরই স্রোতধারা মাত্র। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-কে রাসূল (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন ঃ "পবিত্র কুরআনই তাঁর চরিত্র।"

পবিত্র কুরআন থেকেই সাহাবায়ে কেরাম (রা) তাঁদের পিপাসা দূর করেছিলেন এবং একমাত্র কুরআনের ছাঁচেই তাঁরা তাদের জীবন গড়ে তুলেছিলেন। কুরআন যে তাঁদের একমাত্র পথপ্রদর্শক ছিলো, তা এ জন্যে নয় যে, সে যুগে কোন সভ্যতা, কৃষ্টি, বিজ্ঞান, সাহিত্য বা বিদ্যালয় ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন রোমীয় সভ্যতা, কৃষ্টি ও সাহিত্য এবং রোমীয় আইনশাস্ত্র আজ পর্যন্ত ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত। সে যুগে গ্রীক সভ্যতারও প্রভাব ছিল। গ্রীক তর্কশাস্ত্র, গ্রীক দর্শন, কলা, বিজ্ঞান আজও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার উৎস হিসেবে বিবেচিত। পারস্যের সভ্যতা—কলা, বিজ্ঞান, কাব্য, উপকথা, ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা শক্তিশালী ছিল। নিকট ও দূরবর্তী অন্যান্য এলাকায় অপরাপর সভ্যতাও বিরাজমান ছিল। উদাহরণ স্বরূপ ভারতীয় ও চীন সভ্যতার নাম উল্লেখ্য। আরব ভূখন্ডের উত্তর ও দক্ষিণে রোমীয় ও পারস্য সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা আরব উপদ্বীপের মধ্যস্থলে বসবাস করছিল। তাই সে যুগের মুসলমানগণ সভ্যতা ও কৃষ্টির অভাবজনিত অজ্ঞতার দরুন আল্লাহর কিতাবকে জীবনের একমাত্র

পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নেননি, বরং গভীর চিন্তা-ভাবনার পরই তাঁরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাওরাত কিতাব থেকে কিছু অংশ নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে হযরত ওমর (রা)-এর উপস্থিতির বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা) অসন্তুষ্ট হয়ে হযরত ওমর (রা)-কে বলেন, "আল্লাহর কসম ! আজ হযরত মূসা (আ) যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে তাঁর জন্যেও আমার আনুগত্য বাধ্যতামূলক হতো।"

এ ঘটনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রাথমিক অনুসারীদের জন্য প্রশিক্ষণদানের প্রারম্ভিক স্তরে শুধু আল্লাহর বাণী থেকেই জ্ঞান আহরণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। আর সে বাণী সমষ্টিই হচ্ছে আল কুরআন। তিনি ঠিক করেছিলেন যে, তাঁর সহচরগণ শুধু আল্লাহর কিতাবের জন্যেই নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দেবেন এবং একমাত্র এ কিতাবের শিক্ষা মুতাবিকই তাঁদের জীবন গড়ে তুলবেন। এ জন্যই হযরত ওমর (রা)-কে অন্য গ্রন্থের প্রতি মনোযোগী হতে দেখামাত্রই আল্লাহর রাসূল (সা) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রাসূল এমন একদল লোক তৈরী করতে চেয়েছিলেন যাদের মন-মগয ও জ্ঞান-বুদ্ধি হবে সম্পূর্ণরূপে কলুষতা ও সকল প্রকার পংকিলতা মুক্ত। পবিত্র কুরআন বিধানদাতা স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই তাঁদের প্রশিক্ষণদানের উপায় শিখিয়ে দেন।

উল্লেখিত ব্যক্তিগণ কুরআনের প্রশান্তি নির্ঝর থেকে আকণ্ঠ পান করেন এবং অতুলনীয় গুণাবলীর অধিকারী হিসেবে স্থান লাভ করলেন। পরবর্তী কালে অপরাপর উৎস থেকে কিছু ভেজাল পদার্থ এসে কুরআনের পবিত্র স্রোতধারায় মিশ্রিত হয়। পরবর্তী বংশধরগণ যেসব উৎস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেন, সেগুলো হচ্ছে গ্রীক দর্শন ও তর্কশাস্ত্র, প্রাচীন পারসী উপকথা ও ভাবধারা, ইয়াহুদীদের পুঁথিপুস্তক ও রীতিনীতি, খৃষ্টানদের পুরোহিততন্ত্র এবং এগুলোর সাথে সাথে অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতার কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত অংশ। কুরআনের তাফসীরকারগণ এ বিষয়গুলোকে তাদের পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার ভিতর শামিল করে নেন এবং এরই ফলে পবিত্র কুরআনের দেয়া মূলসূত্রের সাথে এগুলো জড়িয়ে যায়। পরবর্তী বংশধরগণ এ ভেজাল মিশ্রিত উৎস থেকেই জ্ঞান আহরণ করেন। ফলে তাঁরা কখনো প্রথম দফায় গঠিত দলের মত গুণ ও চরিত্রের অধিকারী হতে পারেনি।

আমরা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে, স্বর্ণযুগের মুসলমানদের সাথে পরবর্তীকালের মুসলমানদের যে পার্থক্য সৃষ্টি হয় তার কারণ হচ্ছে এই যে, খাঁটি ইসলামী আদর্শের সাথে অন্যান্য আদর্শের সংমিশ্রণের ফলে যে মতবাদ রচিত হয়, তা ইসলামী বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে।

দ্বিতীয় কারণ ঃ এ ব্যাপারে অন্য একটি কারণও উল্লেখ্য। স্বর্ণযুগের মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণের পদ্ধতিটিও ছিল চমৎকার। তাঁরা সংস্কৃতি, তথ্য অথবা জ্ঞান পিপাসা পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে কুরআন অধ্যয়ন করেননি। সে যুগের কোন লোকই তাঁর বিদ্যার ভান্ডার ফাঁপিয়ে তোলা, কোন বৈজ্ঞানিক বা আইন বিষয়ক সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা অথবা বুদ্ধিবৃত্তির কোন অভাব পূরণের জন্যে কুরআন অধ্যয়ন করেননি। বরং তাঁরা নিজেদের ও সমগ্র দলটির জন্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা কি কি বিধি-নিষেধ নাযিল করেছেন তা-ই অবগত হবার জন্য পবিত্র কুরআনের দিকে মনোযোগী হয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রামে লিপ্ত সৈনিক যেভাবে প্রতিদিনের সামরিক নির্দেশাবলী প্রতিপালনে তৎপর থাকে, ঠিক সেভাবেই সে যুগের মু'মিনগণ কুরআনের নির্দেশ পালন করছিলেন। তাঁরা এক সাথে কুরআনের বেশী অংশ অধ্যয়ন করেননি। কেননা, অধিক পরিমাণ বিধি-নিষেধের বোঝা বহন করা যে কঠিন তা তাঁরা ভালভাবেই উপলব্ধি করতেন। খুব বেশী হলে তাঁদের এক একজন একসাথে দশটি আয়াত পড়তেন, মুখস্ত করতেন এবং আয়াতের মর্মানুসারে চলতেন। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বর্ণিত একটি হাদীস থেকেই আমরা এসব বিষয় জানতে পারি।

"বিধি-নিষেধ মেনে চলাই আহকাম নাযিল করার উদ্দেশ্য।"এ উপলব্ধি সে যুগের লোকদের জন্য আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ও জ্ঞান সম্প্রসারণের দ্বার খুলে দিয়েছিল, তাঁরা যদি নিছক আলোচনা, বিদ্যার্জন ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কুরআন অধ্যয়ন করতেন, তাহলে তাঁদের জন্যে এ দ্বার কখনো উন্মুক্ত হতো না। তাছাড়া এ উপলব্ধির কারণেই তাঁদের জন্যে কুরআনের বিধি-নিষেধ মেনে চলা সহজ এবং দায়িত্বের বোঝা হালকা হয়ে যায়। তাঁদের উঠা-বসা ও চাল-চলনের ভিতরে কুরআনকে এমনভাবে প্রকাশ করেন যে, তাঁদের প্রত্যেকেই ঈমানের জ্বলন্ত চিত্র হিসেবে প্রতিভাত হয়ে উঠেন। এ ঈমান কোন বই বা মগযে লুকায়িত ছিল না, বরং মানব জীবনে ব্যাপক পরিবর্তনের কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসরমান একটি বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তা মূর্তিমান হয়ে উঠেছিল।

বস্তুত যারা কুরআনের বিধি-নিষেধ জেনে সে অনুসারে জীবন যাপনের ইচ্ছা রাখে না, তাদের জন্যে কুরআন কখনো তার জ্ঞানভান্ডার খুলে দেয় না। কুরআন নিছক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, সাহিত্য চর্চা, গল্প-সংকলন অথবা ইতিহাস গ্রন্থ নয়। অথচ এসব বিষয়ই এতে আলোচিত হয়েছে। কুরআন একটি জীবন বিধান নিয়ে এসেছে। এ জীবন বিধানের মূলকথা হচ্ছে, আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ। তাই মহান আল্লাহ তাআলা সমগ্র কুরআন একসাথে নাযিল করেননি। বরং কিছু সময় পর পর অল্প অল্প করে নাযিল করেছেন ঃ

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا

আমরা অল্প অল্প করে কুরআন নাযিল করেছি। যেন তুমি (হে নবী) তা কিছু সময় পরপর মানুষের নিকট আবৃত্তি করতে পার এবং এভাবেই আমরা ধীরে ধীরে ওহী নাযিল করেছি।—বনী ইসরাঈল ঃ ১০৬

সমগ্র কুরআন একসাথে নাযিল হয়নি, বরং ধীরে ধীরে বিস্তার লাভকারী ইসলামী সমাজের নতুন নতুন সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে, মানুষের মনোভাব ও চিন্তাধারার গতি প্রবাহের ধারা অনুসারে সমাজ জীবনের ক্রমোন্নতির সাথে সঙ্গতি রাখার উদ্দেশ্যে এবং মুসলিম সমাজ বাস্তব জীবনে যেসব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিল সেগুলোর জবাব দানের জন্যেই পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন অংশ নাযিল হয়েছিল। বিশেষ অবস্থা ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একক বা একাধিক আয়াত নাযিল হয়। জনগণের মনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেসব প্রশ্নের উদয় হয়েছিল, ঐ আয়াত বা আয়াতগুলো সেগুলোর জবাব দান করে একটি বিশিষ্ট ঘটনার রূপ তুলে ধরে এবং ঐ বিশেষ অবস্থায় যা যা করণীয় তা বলে দেয়। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও কার্যকলাপের যেসব ভ্রান্তি ছিল, এ আয়াতসমূহ তা অপনোদন করে মানুষকে আল্লাহর নিকটে পৌঁছে দেয় এবং আল্লাহ তাআলার গুণাবলী ও সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা দান করে। তাই তাঁরা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে এবং তাঁরা আল্লাহ তাআলার রহমাতের ছত্রছায়ায় জীবনের দিনগুলো অতিবাহিত করছেন। আল্লাহ তাআলার সাথে জীবনের এ গভীর সম্পর্ক উপলব্ধির দরুনই তারা আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান অনুসারে তাঁদের জীবন গড়ে তুলতে সতত সচেষ্ট ছিলেন।

এভাবে স্বর্ণযুগের মুসলিমগণ জীবন সম্পর্কিত সকল নির্দেশাবলীকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। পরবর্তী যুগের মুসলমানগণ জীবন বিধানকে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও উপভোগের বিষয়বস্তুতে পরিণত করে। আর নিসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, পরবর্তী যুগের মুসলমানদের মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা যায়, এটি তার অন্যতম কারণ।

তৃতীয় কারণ ঃ মুসলমানদের ইতিহাসে একটি তৃতীয় কারণেরও সন্ধান পাওয়া যায়, এটাও আমাদের জানা উচিত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে যে ব্যক্তি ঈমান আনতেন তিনি জাহেলিয়াতের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতেন। ইসলামের প্রশান্তির ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের পর তিনি এক নতুন জীবন শুরু করতেন। আল্লাহর বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতায় নিমজ্জিত আগেকার জীবন

যাত্রা থেকে নওমুসলিমগণ সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে নতুন সমাজে যোগদান করতেন। অজ্ঞতার যুগে তিনি যে ভ্রান্ত উপায়ে জীবন যাপন করেছেন সে জন্যে অনুতপ্ত হয়ে সর্বদা ভয়ে ভয়ে জীবন যাপন করতেন এবং ইসলামে প্রবেশের পর পুরাতন পদ্ধতির সাথে কোন সম্পর্ক রক্ষা করাই যে অনুচিত তা পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতেন। যদি কোন সময় মানবীয় দুর্বলতার জন্যে পুরাতন জীবনযাত্রা প্রণালী তাঁর উপর প্রভাবশীল হতো বা পুরাতন অভ্যাস তাঁকে আকর্ষণ করার দরুন তিনি ইসলামের নির্দেশ পালনে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকারে পরিণত হতেন ; তাহলে অনুতাপ ও অনুশোচনায় তিনি চঞ্চল হয়ে উঠতেন এবং তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংশোধন করার জন্যে পবিত্র কুরআনের দিকে ধাবিত হতেন।

এভাবে ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানদের জীবন আগেকার জাহেলিয়াতের জীবন-যাত্রা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে বয়ে চলতো। যেহেতু ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি পূর্বাহ্নে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করেই পদক্ষেপ নিতেন, সে জন্যেই তিনি ইসলামের বিধি-নিষেধগুলো পুরোপুরি মেনে নিয়ে জাহেলিয়াতের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতেন। অবশ্য মুশরিকদের সাথে বৈষয়িক লেন-দেন অব্যাহত রেখেই তাঁরা জাহেলিয়াতকে বর্জন করতেন। কারণ, বৈষয়িক লেন-দেন ও আদর্শের সমঝোতা দু'টো সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

জাহেলিয়াতের পরিবেশ, রীতিনীতি, চাল-চলন ও চিন্তা-ভাবনা বর্জন করার মূলে ছিল আল্লাহ ও জগত সম্পর্কে শিরকবাদী ভ্রান্তধারণার পরিবর্তে তাওহীদভিত্তিক জীবন দর্শন গ্রহণ করে—মুসলমানদের দলে যোগদান এবং এ নতুন সমাজের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন।

ইসলাম গ্রহণের অর্থই ছিল নতুন পথে জীবন যাপন। জাহেলিয়াতের সকল মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারণার প্রভাব মুক্ত এক নব জীবন। বিরোধী পক্ষের নির্যাতন ছাড়া মুসলমানেরা অন্য কোন অসুবিধার সম্মুখীন হননি। কিন্তু ইসলামের পথে পা বাড়ানোর আগেই তাঁরা তাঁদের অন্তরের অন্তস্থলে সকল অমানুষিক অত্যাচারের মুখে দৃঢ় থাকার সিদ্ধান্ত নেন। তাই অত্যাচারীদের নিষ্ঠুর নির্যাতন মুসলমানদের অটল ধৈর্যে কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারেনি।

আমাদের করণীয়

বর্তমানে আমরাও সে যুগের মতই জাহেলিয়াতের বেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি এবং বর্তমানের জাহেলিয়াত সে যুগের চাইতেও অধিক মারাত্মক। আমাদের সমগ্র পরিবেশ, জনগণের বিশ্বাস ও আকীদা, স্বভাব-

চরিত্র ও রীতিনীতি সবই জাহেলিয়াত। এমন কি আমরা যেসব বিষয়কে ইসলামী সংস্কৃতি, ইসলামী উৎস, ইসলামী দর্শন ও ইসলামী চিন্তাধারা বলে জানি, সেগুলোও জাহেলিয়াতেরই সৃষ্টি।

এ জন্যেই আমাদের অন্তরে সত্যিকার ইসলামী মূল্যবোধ স্থান লাভ করে না। এ জন্যেই আমাদের হৃদয় কখনো ইসলামী ধারণা বিশ্বাসের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে না। এবং এ জন্যেই ইসলামের স্বর্ণযুগে যেসব পথিকৃৎ জন্মেছিলেন, তাঁদের সমগুণ সম্পন্ন লোক আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় না।

তাই ইসলামী আন্দোলনের সূচনায় এবং আমাদের প্রশিক্ষণের প্রাথমিক স্তরে জাহেলিয়াতের প্রভাবাধীন বর্তমান পরিবেশ থেকে আমাদের নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে নিতে হবে। আমাদের সে নির্ভেজাল উৎস থেকেই জ্ঞান আহরণ করতে হবে, যেখান থেকে সাহাবায়ে কিরাম (রা) পথের সন্ধান লাভ করেছিলেন। আর ঐ উৎসটিকে যত্নসহকারে সর্বপ্রকার ভেজাল ও সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। এখান থেকেই সৃষ্টিজগতের গতিধারা, মানব প্রকৃতির এবং সর্বোচ্চ ও সুমহান সত্তা প্রকৃত আল্লাহ তাআলার সাথে সৃষ্টজগত ও মানব প্রকৃতির সম্পর্ক বিষয়ে জ্ঞান হাসিল করতে হবে। একই উৎসমূল থেকে আমাদের সরকার পরিচালনা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও জীবনের অন্যান্য বিভাগ সম্পর্কে মৌল ধারণা ঠিক করে নিতে হবে।

আমরা নিছক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা এবং আনন্দ উপভোগ করার জন্যে ইসলামের মৌল উৎসের দিকে ফিরে আসবো না। বরং আল্লাহর আনুগত্য করা ও ইসলামী বিধান মেনে চলার উদ্দেশ্যেই এ পথ অবলম্বন করবো। ইসলাম আমাদেরকে যে ধরনের মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে বলে, ঠিক সে ধরনেই আমরা নিজেদেরকে গড়বো। সাথে সাথে আমরা কুরআনের সহিত্যিক মান, অপরূপ বর্ণনাভংগী, কিয়ামতের চিত্রাংকন, যুক্তিবিদ্যা এবং এ জাতীয় অন্যান্য সম্পদ সম্পর্কে গবেষণা চালিয়ে যাব। এসব বিষয় থেকে আমরা অবশ্যই উপকৃত হবো, কিন্তু এগুলো কুরআন অধ্যয়নের মূল উদ্দেশ্য নয়। আমরা কুরআন থেকে জানতে চাই, কুরআন আমাদের জন্যে কোন্ ধরনের জীবন পদ্ধিত পেশ করে। সৃষ্টিজগত সম্পর্কে কুরআন আমাদের কোন্ দৃষ্টিভংগী শিক্ষা দেয়, আল্লাহ তাআলাকে কিভাবে উপস্থাপিত করে, কোন্ ধরনের নৈতিক মান ও আচার-ব্যবহার শিক্ষা দেয় এবং বিশ্বের মানব সমাজের জন্যে কোন্ ধরনের আইন ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়।

সাথে সাথে আমাদেরকে জাহেলিয়াতের সমাজ বিজ্ঞান, ধ্যান-ধারণা, আচার-ব্যবহার ও জাহেলী নেতৃত্বের কবল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে হবে।

আমরা জাহেলিয়াতের সমাজ ব্যবস্থার সাথে আপোষ করতে পারি না। ঐ ব্যবস্থা মেনে নিয়ে তার অধীনে জীবন যাপন করা আমাদের জন্য সম্ভব নয়। ঐ সমাজের সাথে সৌহার্দ স্থাপন এ জন্যে সম্ভব নয় যে, ঐ ব্যবস্থা ভ্রান্ত। তাই প্রথমে আমাদের নিজেদের জীবন পরিবর্তন করে নিয়ে ঐ সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে জাহেলী সমাজের সকল রীতিনীতির পরিবর্তন সাধন। এ পরিবর্তন আসবে সমাজের গোড়া থেকেই। কারণ, জাহেলী সমাজের ভিত্তিই স্থাপিত রয়েছে ভ্রান্ত মতবাদের উপর, এ জন্যে তা ইসলামের বিপরীত এবং এ ব্যবস্থা শুধুমাত্র পাশবিক শক্তি ও অত্যাচারের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থার সকল সুফল প্রাপ্তি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

প্রথমত আমাদের নিজেদেরকে জাহেলী মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারণার উপর রচিত জীবন বিধানের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে হবে। প্রতিষ্ঠিত ভ্রান্ত সমাজের সাথে আপোষ করার উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের মূল্যবোধ মোটেই পরিবর্তন করবো না। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ও প্রচলিত বাতিল সমাজ ব্যবস্থার যাত্রা-পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা যদি জাহেলিয়াতের পথ ধরে চলি, তাহলে গন্তব্যস্থলে কখনো পৌছতে পারবো না।

আমরা অবগত আছি যে, এ পথে পা বাড়ানোর সাথে সাথেই অনেক অসুবিধা ও বাধা-বিপত্তি আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়াবে এবং আমাদের অনেক ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করতে হবে। তবু স্বর্ণযুগের যেসব মযলুমদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর দ্বীনকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত ও জাহেলিয়াতকে পদদলিত করেছিলেন, সে মহান ব্যক্তিদের পদাংক অনুসরণ করতে হলে আমাদের এসব বাধা-বিপত্তির দরুন পিছিয়ে গেলে চলবে না।

ভবিষ্যত চলার পথ সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। কোন্ পথ ধরে আমরা রওয়ানা হবো, চলার পথে আমাদের কোন্ কোন্ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে এবং অজ্ঞতার ঘোর অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোকোজ্জল রাজপথে পৌছার আগে কোন্ কোন্ গলিপথ অতিক্রম করতে হবে এবং মহানবী (সা)-এর মহান সাহাবীগণ কিভাবে সফলতা অর্জন করেছিলেন, এসব বিষয়ে ভালো করে জেনে নিয়েই আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মক্কী যুগের মৌলিক কুরআনী শিক্ষা

পবিত্র কুরআনের যে অংশ তের বছর যাবত মক্কায় নাযিল হয়েছিল, তা শুধু একটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিল। বিষয়টির মূল বক্তব্যে কোন পরিবর্তন না করে কুরআনের নিজস্ব বর্ণনাভংগীতে তা নতুন নতুন রূপে পেশ করা হয়। ফলে, প্রতিবারেই মনে হয়েছে যেন বিষয়টি প্রথম দফা আলোচিত হচ্ছে। ঐ বিষয়টি ছিল নতুন জীবন ব্যবস্থায় প্রথম ও প্রধান মৌলিক প্রশ্ন। আর সে প্রশ্নটি ছিল সৃষ্টিকর্তা, মানবগোষ্ঠী এবং এ দু'য়ের সম্পর্ক বিষয়ক বিশ্বাস।

প্রশ্নটি তুলে ধরা হয়েছিল সমস্ত মানব জাতিরই সামনে। তারা আরব দেশীয় হোক বা অন্য যে কোন এলাকার অধিবাসী, সে যুগের অথবা পরবর্তী যে কোন যুগের হোক না কেন, সকল মানুষের জন্যে একই প্রশ্ন এবং উত্তরও অভিন্ন।

মানব মনের মৌলিক জিজ্ঞাসাগুলো কখনো পরিবর্তন হয় না। সৃষ্টিজগতের মধ্যে মানুষের অবস্থান, মানব জীবনের গন্তব্যস্থল, সৃষ্টিজগতে তার মর্যাদা ও জগতের সাথে তার সম্পর্ক এবং মানুষ ও তার সৃষ্টিকর্তার মধ্যস্থিত সম্পর্কের ধরন ইত্যাদি বিষয়গুলো সকল যুগের ও সকল অঞ্চলের লোকদের জন্যেই অভিন্ন। এ মৌলিক বিষয়গুলোকে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়—কারণ, এগুলো মানুষের অস্তিত্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

কুরআন নাযিলের মক্কী যুগে মানুষ ও তার চারিপার্শ্বের জগতে লুক্কায়িত রহস্যাবলী ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মানুষ কোথা থেকে এলো, তার কি পরিচয়, কি উদ্দেশ্যে সে দুনিয়াতে এসেছে, তার গন্তব্যস্থল কি, কে তাকে শূন্যতা থেকে অস্তিত্ব দান করলো এবং তার পরিণাম কি হবে, কুরআন নাযিলের প্রথম স্তরে এসব বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। সৃষ্টির অনেক বিষয় রয়েছে যা মানুষ দেখতে পায় ও স্পর্শ করতে পারে। আবার অনেকগুলো এমনও রয়েছে যাদের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় কিন্তু সেগুলো দেখাও যায় না, ছোঁয়াও যায় না। কুরআন এ পর্যায়ে মানুষকে এ উভয় ধরনের সৃষ্ট বিষয় ও বস্তুনিচয়ের জ্ঞান দান করেছে। এ ছাড়া কে এ মহান বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছেন, কে দিবারাত্রির আবর্তনের ব্যবস্থা করেছেন এবং কে

যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন, এসব বিষয়েও মক্কী স্তরেই আলোচিত হয়েছে। অনুরূপভাবেই কুরআন মানুষকে স্রষ্টা, বস্তুজগত ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক রাখার উপায় বলে দিয়েছে। এটাই সে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যার উপর মানুষের অস্তিত্ব নির্ভর করছে এবং সৃষ্টজগতের ক্ষয় প্রাপ্তি পর্যন্ত নির্ভর করবে।

এ জন্যেই মক্কী যুগের তের বছরের মধ্যে এ গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেহেতু, মানব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাপর প্রশ্ন এ মৌলিক সমস্যা থেকেই উদ্ভূত।

মক্কী স্তরে কুরআন মৌলিক আকীদার বিষয়টিকেই প্রধান বিষয় হিসেবে নির্ধারিত করে নেয় এবং এ বিষয়ে উদ্ভূত অন্য কোন প্রশ্ন সম্পর্কে সে যুগে কোন কিছুই বলা হয়নি। সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলা সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, একদল লোকের হৃদয়ে ঈমান পরিপূর্ণরূপে ও মযবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সামনে অন্যান্য বিধান পেশ করা হবে না। কারণ, যারা পরবর্তীকালে তাঁর দ্বীনকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করবে, তাদের অন্তরে সর্বপ্রথম মযবুত ঈমানের প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য ছিল।

আল্লাহর দ্বীনের বাণী যারা প্রচার করেন এবং এ দ্বীনের উপস্থাপিত জীবন বিধানকে রূপায়িত করতে যারা আগ্রহী তাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, তের বছর কাল পবিত্র কুরআন শুধু ঈমানের দাওয়াতই পেশ করেছে এবং ঐ ঈমানের ভিত্তিতে রচিত জীবন বিধানের বিস্তারিত আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধ প্রচার মুলতবী রেখেছে।

দাওয়াতী কাজের সূচনা

আল্লাহ তাআলার অসীম জ্ঞান-ভান্ডার থেকেই ঠিক করা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রাথমিক দাওয়াতের বিষয়বস্তু ঈমান ও আকীদা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। আল্লাহর রাসূল (সা) সর্বপ্রথম মানুষের নিকট যে বাণী পেশ করেন, তা হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মনিব ও মাবুদ না থাকার সাক্ষ্য দান করা। সাথে সাথে তিনি মানুষের নিকট তাদের সত্যিকার মাবুদের পরিচয় দান এবং একমাত্র তাঁরই বন্দেগী করার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করার কাজেও আত্মনিয়োগ করেন।

মানুষের সীমিত জ্ঞান থেকে অনুমিত হয় যে, দাওয়াতের স্বল্প সংখ্যক শব্দ সমষ্টি প্রাথমিক স্তরে আরবদের মন জয় করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে আরবগণ তাদের মাতৃভাষা ভালভাবেই বুঝতে সক্ষম ছিল এবং সে জন্যেই ইলাহ ও

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শব্দগুলোর অর্থ বুঝতে তাদের কোনই বেগ পেতে হয়নি। তারা জানতো যে, উলুহিয়াত শব্দের অর্থ হচ্ছে সার্বভৌম শক্তি এবং তারা এটাও বুঝতো যে, সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর প্রতি আরোপ করার পরিণতি স্বরূপ পুরোহিত, গোত্রীয় সরদার এবং ধনী শাসনকর্তাদের নিকট থেকে সকল কর্তৃত্ব ছিনিয়ে তা আল্লাহর নিকট অর্পণ করা হবে, আর এর বাস্তব পরিণতি হবে এই যে, মানুষের চিন্তা-ভাবনায়, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে, সম্পদ বন্টন ও বিচারানুষ্ঠানে এবং জাতীয় জীবনের অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে ; সংক্ষেপে মানুষের আত্মা ও দেহে একমাত্র আল্লাহ তাআলারই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তারা জানতো যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ না থাকার ঘোষণা সমাজে প্রতিষ্ঠিত সকল কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ বিশেষ। তৎকালে প্রচলিত সকল রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য সকল শক্তির আইন প্রণয়ন ও শাসন কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণারই নামান্তর। আরবের অধিবাসীদের মাতৃভাষায় উচ্চারিত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ঘোষণার তাৎপর্য এবং তাদের অভ্যস্ত জীবন যাত্রার উপর এর প্রতিক্রিয়া তাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। তাই তারা এ বিপ্লবী বাণীতে রাগান্বিত হয়ে উঠে এবং এ ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। একথা সকলেরই জানা রয়েছে।

দ্বীনের দাওয়াত কেন এভাবে শুরু হলো ? কেনই বা আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীনেরএ বাণীকে প্রাথমিক স্তরেই পরীক্ষায় নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন ?

জাতীয়তাবাদ ও দ্বীনি দাওয়াত

রাসূলুল্লাহ (সা) যে সময় আল্লাহর বাণী প্রচার শুরু করেন সে সময় আরবদের ভূমি ও সম্পদ তাদের নিজেদের হাতে ছিল না বরং অন্যদের কুক্ষিগত ছিল। উত্তরাঞ্চলে সিরিয়া রোমানদের দখলে ছিল। অনুরূপভাবে দক্ষিণাঞ্চলে ইয়ামন ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। স্থানীয় আরবগণ পারস্য রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করে ঐ অঞ্চল শাসন করছিল। শুধুমাত্র হিজায, তিহামা এবং নজদ এলাকায় আরবদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু ঐ এলাকাগুলো ছিল নিছক মরুভূমি। কয়েকটি মরুদ্যান ছাড়া সমগ্র এলাকাটাই ছিল পানিবিহীন বালুকাময় প্রান্তর।

এটাও সর্বজনবিদিত যে. হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে তাঁর নিকটাত্মীয় এ প্রতিবেশীগণ আল আমীন ও আস সাদিক (বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী) উপাধি দান করেছিলেন। তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির পনর বছর আগেই কুরাইশ গোত্রপতিগণ

তাঁকে কাবা ঘরের হাজরে আসওয়াদ পুনঃস্থাপন বিষয়ক বিতর্কে সালিস নির্বাচিত করে এবং তাঁর মীমাংসায় অত্যন্ত খুশী হয়। তিনি বনী হাশিম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং বনী হাশিম কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সম্ভ্রান্ত গোত্র হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সুতরাং এটা স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) আরব জাতীয়তাবাদের ধূয়া তুলে সে সমাজের লোকদের অতি সহজেই ঐক্যবদ্ধ করতে পারতেন। কুরাইশগণ খুব সহজেই আরব ঐক্যের ডাকে সাড়া দিত। কারণ গোত্রীয় যুদ্ধ বিগ্রহ ও রক্তপাতের বিরামহীন ধারা তাদের অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তিনি শতধা বিচ্ছিন্ন আরবদের ভাষাভিত্তিক ঐক্যের আহবানে একত্রিত করে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের দখলকৃত আরব ভূমি উদ্ধার করতে পারতেন এবং একটি সম্মিলিত আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা তাঁর পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন ছিল না।

রাসূলুল্লাহ (সা) তের বছর যাবৎ অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করে প্রবল বিরোধিতার মুখে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার পরিবর্তে জাতীয়তাবাদের আহবানে সহজেই জনগণের সমর্থন লাভ করতে পারতেন এবং সমগ্র আরবের উপর তাঁর নেতৃত্ব স্বীকৃতি লাভ করতো।

একথাও বলা যেতে পারে যে, এভাবে তাঁর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধীনে সমগ্র আরব ভূমিকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করে নেয়ার পর তিনি জনগণকে আল্লাহ তাআলার একত্বের প্রতি ঈমান আনয়নের জন্যে প্রস্তুত করতে পারতেন এবং তাঁর নিজের কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার পর তারা সহজেই তাঁরই উপদেশ ও শিক্ষানুসারে তাদের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলাকে মেনে নিতেও বাধ্য হতো।

কিন্তু সকল জ্ঞানের আধার ও সকল বিষয়ে বিজ্ঞ আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে ঐ পথ ধরে চলতে দেননি। বরং তাঁকে তিনি প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহ ব্যতীত অপর সকলের কর্তৃত্ব অস্বীকার করার নির্দেশ দেন এবং স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ও তাঁর স্বল্প সংখ্যক অনুচরদের ধৈর্য সহকারে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে নির্দেশ দেন।

প্রশ্ন হচ্ছে এসব কেন? রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর প্রিয় সাহাবীগণকে অযথা নির্যাতনের শিকারে পরিণত করা হয়নি। তিনি জানতেন যে, অন্য কোন উপায়ে উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। রোম ও পারস্যের নির্যাতন থেকে আরব ভূমিকে মুক্ত করে সে স্থলে আরবী নির্যাতনই প্রবর্তন করা এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল না। দেশী বা বিদেশী সকল নির্যাতনই এক ও অভিন্ন।

পৃথিবী আল্লাহর এবং সেটাকে আল্লাহরই কর্তৃত্বের জন্যে পাক-পবিত্র রাখা প্রয়োজন এবং কালেমায়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বাণী ব্যতীত দুনিয়ার বুক

পবিত্র হতে পারে না। মানুষ একমাত্র আল্লাহরই দাস এবং একমাত্র কালেমায়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র প্রভাবেই সে আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে জীবন যাপন করতে পারে। আরবী ছিল তাদের মাতৃভাষা। তাই তারা পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে, এ বাণীর অর্থ হচ্ছে 'আল্লাহ ছাড়া কোন সার্বভৌম শক্তি নেই, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আইন রচনা করার অধিকার নেই এবং মানুষের উপর মানুষের কোন কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব থাকতে পারে না।' কেননা, সকল কর্তৃত্বের একমাত্র মালিক হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। ইসলাম ঘোষণা করেছে যে, মানুষের ঐক্যের ভিত্তি হবে ঈমান। আর ঈমানের মাপকাঠিতে আরব, রোমক ও পারসীয়ান সকলেই সমান। এ জন্যেই কালেমার বাণীকে ভিত্তি করে দ্বীনের দাওয়াত শুরু করা হয়েছিল।

অর্থনৈতিক বিপ্লব ও দ্বীনের বাণী

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় আরব দেশে সুষম সম্পদ বন্টনের কোন উপায় ছিল না। তাই সে দেশে সুবিচারও ছিল অনুপস্থিত। স্বল্প সংখ্যক লোক সকল সম্পদ ও ব্যবসা বাণিজ্য কুক্ষিগত করে সুদী কারবারের মাধ্যমে তা বাড়িয়ে চলছিল। বিপুল সংখ্যক দেশবাসী দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত ছিল।

ধনী ব্যক্তিদেরকেই সম্ভ্রান্ত ও শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করা হতো এবং সাধারণ মানুষ শুধু ধন-সম্পদ থেকেই বঞ্চিত ছিল না, উপরন্তু তাদের মানবীয় মর্যাদাই সে সমাজে স্বীকৃত ছিল না।

এটাও বলা যেতে পারে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) সমাজের সম্পদশালী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে একটি সামাজিক বিপ্লবের আন্দোলন পরিচালনা করে ধনীদের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারতেন।

এটাও সকলেই স্বীকার করবেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এ জাতীয় আন্দোলন শুরু করলে আরব সমাজ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যেতো এবং বিপুল সংখ্যক দরিদ্র জনগণ ঐ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতো। কারণ, তারা গুটিকয়েক ধনবান, সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী ব্যক্তির অত্যাচারে জর্জরিত ছিল। পক্ষান্তরে তাওহীদের বাণী প্রচারের ফলে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পদে পদে বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় এবং এরই ফলে সমাজের খুব কম সংখ্যক মহৎ হৃদয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউই এ আহবানে সাড়া দেয়নি।

এটাও স্বীকার করতে হয় যে, সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের স্বমতে আনার পর তাদের নেতা হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ (সা) মুষ্টিমেয় ধনীদের

বিপুল সম্পদ হস্তগত করে নিতে পারতেন এবং নিজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি খাটিয়ে তিনি নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে সমাজের লোকদের তাওহীদের প্রতিও বিশ্বাসী করে তুলতে পারতেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার পর তাঁরই আদেশ-উপদেশ মুতাবিক আল্লাহ তাআলার একত্ব স্বীকার করে নিতে তারা কোনই আপত্তি উথাপন করতো না।

কিন্তু সর্বজ্ঞ ও নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ তাআলা তাঁরই প্রিয় নবীকে এ পথেও পরিচালিত করেননি।

আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন যে, এটা সঠিক পথ নয়। তিনি জানেন যে, একমাত্র আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই সত্যিকার সামাজিক সুবিচার আসতে পারে। গোটা সমাজকে আল্লাহ প্রদত্ত ইনসাফপূর্ণ বন্টননীতি মেনে নেয়ার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। সমাজের ছোট-বড়, দাতা-গ্রহীতা সকলকেই নিসন্দেহে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহর বিধান মেনে নিয়ে তারা শুধু পৃথিবীতেই কল্যাণ লাভ করবে না, উপরন্তু আখেরাতেও পুরস্কৃত হবে। সমাজের কিছু লোক সম্পদের লোভে উন্মাদ হয়ে উঠা এবং বিপুল জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে জীবন যাপন করতে বাধ্য হওয়া কখনো বাঞ্ছনীয় নয়। আল্লাহর কর্তৃত্ব অস্বীকার করে যে সমাজ স্থাপিত হয় তাতে প্রতিটি বিষয়ে অস্ত্রের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভয় ও সন্ত্রাস যে সমাজের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, সে সমাজের অধিকাংশ জনগণ ভগ্নহৃদয় ও উৎসাহ উদ্দীপনাহীন হয়ে মরার মত জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।

নৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলনের সূচনা

রাসূলুল্লাহ (সা) যে যুগে তাঁর দাওয়াতী কাজ শুরু করেন, সে যুগে আরব দেশ নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নতম স্তরে পৌছে গিয়েছিল। প্রাচীন যুগের কতিপয় গোত্রীয় প্রথা ব্যতীত সে সমাজে আর কোন নৈতিক বিধানই ছিল না।

অত্যাচার নির্যাতন ছিল ঐ সমাজের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বিখ্যাত কবি জুহাইর ইবনে আবী সালমা বর্ণনা করেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি সশস্ত্র হয়ে আত্মরক্ষা করবে না, মৃত্যুই তার অনিবার্য পরিণতি।"

"আর যে ব্যক্তি অত্যাচার করবে না, সে অবশ্যই অত্যাচারিত হবে।"

অজ্ঞতার যুগের অপর একটি প্রবাদ বাক্য নিম্নরূপ ঃ

"অত্যাচারী হোক কিংবা অত্যাচারিত—সকল অবস্থাতেই তোমার ভাইয়ের সাহায্য কর।"

মদপান ও জুয়া সামাজিক প্রথার মধ্যে শামিল ছিল এবং এসব অভ্যাস নিয়ে মানুষ গর্ব করতো। সে যুগের সকল কবিতাই মদ ও জুয়াকেই কেন্দ্র করে রচিত হতো।

সে সমাজের সকল জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ব্যভিচার প্রচলিত ছিল এবং প্রাচীন ও সমসাময়িক উভয় ধরনের অজ্ঞতায় নিমগ্ন লোকদের নিয়ম মুতাবেক তৎকালীন সমাজের ব্যভিচারী লোকেরাও এ জঘন্য কাজে লিপ্ত থাকার জন্যে গর্ববোধ করতো। হযরত আয়েশা (রা) নিম্নোক্ত ভাষায় তৎকালীন সমাজের বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"জাহেলিয়াতের যুগে চার ধরনের বিয়ে প্রচলিত ছিল। এক ধরনের বিয়ে ছিল আজকের প্রচলিত বিয়ের মতই। অর্থাৎ বিবাহেচ্ছুক ব্যক্তি পাত্রীর পিতা বা তার অভিভাবকের নিকট বিয়ের প্রস্তাব পেশ করতো এবং তাকে এ উপলক্ষে কিছু উপহার প্রদান করতো। দ্বিতীয় একটি পদ্ধতি এরূপ ছিল যে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলতো, সে যেন দু'টি মাসিক ঋতুর মধ্যবর্তী সময় নির্দিষ্ট একজন পর পুরুষের সাথে সহবাসের মাধ্যমে গর্ভ ধারণ করে। সে সময় স্বামী তার স্ত্রীকে ছোঁয়া থেকে বিরত থাকতো এবং স্ত্রীর গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ হবার আগে সে স্ত্রীর সাথে কোন যৌনসম্পর্ক স্থাপন করতো না। গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ হবার পর স্বামী নিজের ইচ্ছানুসারে স্ত্রী সহবাস করতো। এ পদ্ধতি গ্রহণ করার উদ্দেশ্য ছিল উচ্চবংশ থেকে সন্তান সংগ্রহ করা। তৃতীয় পদ্ধতিটি ছিল বহু স্বামী প্রথা (Polyandry) অর্থাৎ অনধিক দশ ব্যক্তির একটি দল একজন স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস করতো। স্ত্রীলোকটি গর্ভসঞ্চার ও সন্তান জন্মানোর কয়েকদিন পর সে সহবাসকারী ব্যক্তিদের ডেকে জড়ো করতো। এ আহবান প্রত্যাখ্যান করার কারো অধিকার ছিল না। সকলে সমবেত হলে স্ত্রী লোকটি বলতো—তোমরা তো ফলাফল জানতেই পেরেছ। আমি একটি সন্তান প্রসব করেছি। তারপর সে উপস্থিত লোকদের মধ্যে থেকে একজনকে চিহ্নিত করে ঘোষণা করতো এ ব্যক্তি-ই এ সন্তানের পিতা। তারপর চিহ্নিত ব্যক্তির নামানুসারে শিশুটির নামকরণ করা হতো এবং ঐ শিশু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বলেই পরিগণিত হতো। শিশুটির দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করার কোন অধিকার সে ব্যক্তির থাকতো না।"

চতুর্থ পদ্ধতিটি ছিল এরূপ যে, "অনেক লোক একই স্ত্রীলোকের নিকট যেতো এবং স্ত্রীলোকটি সবাইকেই গ্রহণ করতো। প্রকৃতপক্ষে এরা ছিল বেশ্যা। এদের ঘরের দরজায় একটি বিশেষ ধরনের পতাকা থাকতো। যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই ওদের সাথে সহবাস করতে পারতো। ঐ জাতীয়

স্ত্রীলোক গর্ভবতী হবার পর যখন সন্তান জন্ম দিত, তখন বহুলোক সমবেত হয়ে বিশেষজ্ঞ মারফত সন্তানের আকার আকৃতি থেকে শিশুর পিতৃত্ব নিরূপণ করতো। সমবেত লোকেরা যাকে এ সন্তানের পিতা বলে ঘোষণা করতো সে-ই ঐ সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হতো। এ দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না।" (বুখারী বিবাহ অধ্যায়)

হযরত মুহাম্মাদ (সা) চারিত্রিক মানোন্নয়ন, সমাজ শুদ্ধিকরণ ও আত্মশুদ্ধির কর্মসূচী নিয়ে নৈতিক সংস্কারের একটি আন্দোলনও শুরু করতে পারতেন। প্রত্যেক সমাজ সংস্কারকের মত তাঁর ঐ সমাজের সংশোধনকামী কতিপয় সাহসী ও কর্মতৎপর ব্যক্তির সহযোগিতা লাভ করা অসম্ভব ছিল না।

সহজেই বলা যেতে পারে, এ ধরনের আন্দোলন শুরু করলে আল্লাহর রাসূল (সা) বেশ কিছু লোক জমাতে পারতেন। এ লোকগুলো উন্নত নৈতিক মানের দরূন সহজেই তাওহীদের বাণী গ্রহণ ও পরবর্তী দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রস্তুত হতো এবং এ উপায়ে কাজ করলে কালেমায়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বাণী ততটা তীব্র বিরোধিতার মুকাবিলা করতো না।

কিন্তু সর্বজ্ঞ আল্লাহ ভালভাবেই জানতেন যে, এটা সঠিক পথ নয়। তিনি জানতেন যে, একমাত্র ঈমানের ভিত্তিতেই নৈতিকতা গঠিত হয়। ঈমানই ভালমন্দের মানদন্ড ও নৈতিক মূল্যবোধ নির্ধারণ করে এবং এ মানদন্ডের উৎসমূল স্বরূপ এক উচ্চতম কর্তৃত্বের সন্ধান বাতলে দেয়। ঐ কর্তৃত্ব এ মূল্যবোধ গ্রহণ করার পুরস্কার ও বর্জন করার শাস্তি নিরূপণ করেন। এ কর্তৃত্বের সন্ধান জানা না থাকলে সব মূল্যবোধ এবং নৈতিক মানদন্ডই অস্থায়ী প্রমাণিত হয়—কোন কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহির অনুভূতি অথবা ভাল কাজের পুরস্কার প্রাপ্তির আশা এ দু'টির কোন কিছুই থাকে না।

সর্বাত্মক বিপ্লব

কঠোর পরিশ্রমের পর ঈমান যখন সুদৃঢ় হলো, যে মনিবের প্রতি ঈমান আনা হয়েছিলো, বাস্তব কার্যকলাপের ভিতর দিয়ে যখন তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ পেল ; মানুষ যখন তাদের সত্যিকার স্রষ্টা—মনিব ও প্রতি পালককে চিনতে পেরে একমাত্র তাঁরই স্তবস্তুতি করতে শুরু করলো, যখন তারা সকল বিষয়ে অন্যের এমন কি নিজের কামনা-বাসনার প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ করল ; আর যখন কালেমায়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তাদের অন্তরে খোদিত হয়ে গেল, তখনই আল্লাহ তাআলা তাদের সকল বিষয়ে সাহায্য দান করলেন। আল্লাহর যমীন রোম ও পারস্যের অধীনতা থেকে মুক্ত হলো কিন্তু এ

মুক্তি অনারবদের প্রভুত্বের স্থলে আরবদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে নয়, বরং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে। রোমান, পারসীয়ান, আরব ইত্যাদি সকল আল্লাহদ্রোহী শক্তির উচ্ছেদ সাধনই ছিল এ বিপ্লবের লক্ষ্য।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে সকল প্রকার যুলুম-নির্যাতনের অবসান ঘটে। আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত মানদন্ডে ওযন করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহর নামেই ন্যায় বিচারের ঝান্ডা উঁচু করা হয়। সে ঝান্ডাটিই ইসলাম নামে পরিচিত। এ ঝান্ডায় "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ব্যতীত আর কোন কিছুই লেখা হয়নি।

চরিত্র উন্নত হলো, হৃদয় ও মন বিশুদ্ধ হলো এবং এর ফলে কিছুসংখ্যক ঘটনা বাদে কোথাও আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত চরম দন্ড দানের প্রয়োজন দেখা দিল না। কারণ, ঐ সময়ে মানুষের বিবেক নিজে নিজেই আইন মেনে চলতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। পুলিশ ও আদালতের পরিবর্তে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার প্রাপ্তির আশা এবং তাঁর ক্রোধভাজন হওয়ার ভীতি মানুষের অন্তরে স্থান লাভ করে।

মানব গোষ্ঠী এক কলুষ মুক্ত সমাজ ব্যবস্থার নৈতিক মান ও জীবনের অন্যান্য মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সমুচ্চ দিগন্তে উন্নত হয়।

ইতিপূর্বে মানবগোষ্ঠী কখনোও এত উচ্চ পর্যায়ের জীবনযাত্রা লাভ করেনি এবং পরবর্তীকালে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ঐ পর্যায়ের উন্নতি সম্ভব হয়নি।

বিপ্লব কি করে এল ?

এটা এ জন্যে সম্ভব হয়েছিল যে, যারা ইসলামকে একটা জীবন বিধান, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং আইন কানুনের একটি ধারা হিসেবে প্রবর্তন করেছিলেন তাঁরা সর্বপ্রথমে ঈমান, চরিত্র, ইবাদাত এবং পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার রীতি পদ্ধতির ভিতর দিয়ে এ ব্যবস্থাকে নিজেদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন। এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে যারা সংগ্রাম করেছিলেন তাদের সাথে যুদ্ধ জয়, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অথবা তাদেরই হাতে দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কোন পার্থিব সুবিধারই ওয়াদা করা হয়নি। তাদের মাত্র একটি পুরস্কারেরই নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল। আর সে পুরস্কারটি হচ্ছে জান্নাত। 'আল্লাহ ছাড়া কোন মনিব নেই'—এ বাণীর বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠা কায়েমী স্বার্থবাদী জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারীগণের প্রবল বিরোধিতার মুখে ঈমানদারগণ যে অটল ধৈর্য ও অসীম সহিষ্ণুতার সাথে সংগ্রাম জারী রেখেছিলেন, তার বিনিময়ে তাদের প্রতি মাত্র ঐ একটি পুরস্কারেরই ওয়াদা করা হয়েছিল।

আল্লাহ তাদের পরীক্ষায় ছেড়ে দেন। তাঁরা দৃঢ়তার প্রমাণ পেশ করেন এবং ব্যক্তিগত সুখ-সম্ভোগ ভুলে যান। আল্লাহ দেখতে পেলেন যে, তাঁরা পার্থিব সুযোগ-সুবিধার জন্যে লালায়িত নন। তাঁরা নিজেদের জীবদ্দশায় এ বাণীর বিজয় ও প্রতিষ্ঠা দেখার সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছেন না। তাঁদের অন্তর বংশগত কৌলিণ্য, জাতীয়তা, দেশ ও গোত্রীয় অহংকার থেকে যখন মুক্ত হলো এবং আল্লাহ তাআলার বিচারে তারা পবিত্র হৃদয় বলে বিবেচিত হলেন, তখনই তিনি তাদের হাতে এক অতি পবিত্র আমানত অর্থাৎ খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। তাঁরা ছিলেন স্বচ্ছ (খালেস) ঈমানের অধিকারী। আর খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রাথমিক প্রয়োজন ছিল এ বস্তুটির। কারণ, আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে অন্তর ও বিবেক এবং নৈতিক চাল-চলন, লেন-দেন ও উঠা-বসার জন্যে গৃহীত কর্মপন্থায়। আল্লাহ তাআলা নিশ্চিত হলেন যে, আল্লাহর আইন-কানুন ও রীতিনীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পর তাঁরা ঠিকঠিক ভাবে এ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তিনি প্রমাণ পেলেন যে, তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতাকে নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, গোত্রীয় অথবা জাতীয় স্বার্থে ব্যবহার করবে না, বরং আল্লাহর কাছ থেকে আমানত স্বরূপ পাওয়া এ ব্যবস্থাকে তারা আল্লাহরই সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁরই কর্তৃত্বের অধীনে ঠিক ঠিকভাবে প্রয়োগ করবেন। সত্যিকার অর্থে তাঁরা নিজেদেরকে সত্যের পতাকাবাহী হিসেবে তৈরী করে নিয়েছিলেন।

যদি তাওহীদের বাণী থেকে ইসলামী দাওয়াতের সূচনা না হতো এবং যদি আপাত দৃষ্টিতে কষ্টকর ও বিপদাপদপূর্ণ পথ ধরে আন্দোলনের কাফেলা অগ্রসর না হতো, তাহলে এ মহান জীবনাদর্শ কখনো বাস্তব জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতো না। জাতীয় স্বার্থ, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন অথবা সমাজ সংস্কারের নামে আন্দোলনের সূচনা হলে এবং কালেমা লাইলাহা ইল্লাল্লাহর সাথে অন্য কোন শ্লোগান মিশ্রিত হলে, এ বাঞ্ছিত জীবন বিধান কখনো বাস্তবে রূপ লাভ করতে পারতো না।

পবিত্র কুরআনের মক্কী স্তর এ গৌরবময় কাজ সম্পাদন করেছে যে, মানুষের মন-মগযে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মনিব না থাকার বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দিয়েছে এবং মুসলমানদের এমন পথ ধরে দৃঢ় পদে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করেছে যা বাহ্যত অত্যন্ত কঠিন বলে মনে হয়।

সে যুগে কুরআনের যে অংশ অবতীর্ণ হয়েছে সে অংশে শুধুমাত্র ঈমান মযবুত করার প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ঈমানের ভিত্তিতে যে জীবন

বিধান রচিত হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া তখন মুলতবী রাখা হয়। দ্বীনের দাওয়াতী কাজ করতে যারা ইচ্ছুক, তাদের এ বিষয় লক্ষ্য রাখা খুবই প্রয়োজন। বস্তুত, ইসলামী জীবন বিধান এ পদ্ধতিই দাবী করে। কেননা, এ দ্বীন সম্পূর্ণরূপেই তাওহীদের প্রতি গভীর বিশ্বাসের ভিত্তিতে রচিত এবং জীবন যাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল বিধান ও আইন-কানুন সে মহান বিশ্বাস থেকেই গৃহীত হয়। এ দ্বীনকে একটি বিশাল বৃক্ষের সাথে তুলনা করা যায়। একটি বিরাট সুউচ্চ বৃক্ষ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে এবং তার মাথা আকাশের দিকে উন্নত থাকে। এত বড় বৃক্ষ স্বাভাবিকভাবেই মাটির গভীরে তার শিকড় প্রোথিত করবে এবং তার আকৃতি অনুসারে চারিদিকে বিস্তীর্ণ এলাকায় ঐ শিকড় ছড়িয়ে দেবে। এ দ্বীনের অবস্থাও হুবহু তাই। এ জীবন বিধান মানব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছোট বড় সকল বিষয়েই তার অনুশাসন রয়েছে। এ ব্যবস্থা শুধু ইহকালের বিধান দান করে না বরং পরকালের জন্যেও বিধান দিয়ে থাকে। দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয় জগতের রহস্যই উদঘাটন করে দেয়। এটা শুধু বস্তুজগত নিয়েই পরিতৃপ্ত থাকে না বরং চিন্তা ভাবনারও সংশোধন করে। এভাবেই এটা একটা দীর্ঘ, সুদৃঢ় ও বিশাল বৃক্ষের ন্যায় এবং এর শিকড়গুলো বৃক্ষের আকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই মাটির গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

ইসলামী জীবন বিধানের এ বিশেষ অংশটি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করার ভিতর দিয়েই আদর্শের আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর। সঠিক উন্নয়নের জন্যে এ পন্থা অত্যন্ত জরুরী। কেননা, এরই মাধ্যমে সুউচ্চ আকাশ বিস্তৃত ইসলামী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার সাথে মাটির গভীর অভ্যন্তরে ইতস্তত ছড়ানো শিকড়গুলোর যোগসূত্র রক্ষা করা সম্ভব।

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"র প্রতি বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা বিস্তার লাভ করে এবং এটাই হয়ে দাঁড়ায় কালেমার বাস্তব ব্যাখ্যা। এভাবে মু'মীনগণ আইন প্রবর্তনের আগেই ইসলামী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে মনের দিক থেকে প্রস্তুত থাকে এবং আইন প্রবর্তনের সাথে সাথেই তার সকল বিধি-নিষেধ অন্তরের সঙ্গে মেনে নেয়। আত্মসমর্পণের মনোভাবই ঈমানের প্রথম দাবী এবং এ মনোভাবের দরুনই বিশ্বাসীগণ আগ্রহ ও আনন্দ সহকারে ইসলামের সকল আইন-কানুন মেনে নেয়।

তাই আদেশ জারি হবার সাথে সাথে তার শির অবনত করে দেয়। আইন বাস্তবায়নের জন্যে তাদের শুধু আদেশ শোনাই যথেষ্ট। এ পথেই জাহেলী যুগের সকল অভ্যাস ও স্বভাব পরিত্যাগ করেন। কুরআনের কয়েকটি আয়াত অথবা আল্লাহর নবীর মুখনিসৃত কয়েকটি বাক্যই সে বিপুল পরিবর্তন সম্পন্ন

করতে সক্ষম হয়। বর্তমান যুগের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোর আইন প্রবর্তন পদ্ধতির সাথে ইসলামের উল্লিখিত পদ্ধতির তুলনা করে দেখুন। প্রাতটি স্তরেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোকে আইন পরিষদ, শাসনতন্ত্র, পুলিশ, সামরিক শক্তি, প্রচারযন্ত্র ও প্রেসের উপর নির্ভর করতে হয়। তবু তারা শুধু প্রকাশ্যে আইন লংঘনের ব্যাপারটিকে আংশিকভাবে দমন করতে সক্ষম হয়। ফলে, বেআইনী ও নিষিদ্ধ কার্যকলাপে সমাজ পরিপূর্ণই থেকে যায়।

বাস্তবধর্মী জীবন বিধান

এ জীবন বিধানের অপর একটি দিকও লক্ষণীয়। বরং তা হচ্ছে একটি বাস্তবমুখী জীবন বিধান। ইসলাম একটি বাস্তবধর্মী জীবন বিধান। মানব জীবনের বাস্তব বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণই এর উদ্দেশ্য। তাই মানব সমাজের প্রচলিত বিষয়াদি পর্যালোচনা করে সেগুলো বহাল রাখা, সংশোধন অথবা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করা সম্পর্কে সে রায় প্রদান করে। তাই যে সমাজ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়েছে সে সমাজে ঐ সময়ে বিরাজমান পরিস্থিতি বিবেচনার পরই ইসলাম আইন প্রণয়ন করে।

ইসলাম নিছক ধ্যান-ধারণা ভিত্তিক কতগুলো সূত্র সমষ্টিই নয়। তাই এ জীবন বিধান প্রবর্তনের আগে একটি মুসলিম সমাজ গড়ে উঠা অপরিহার্য। এ সমাজ বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ ছাড়া সার্বভৌম প্রভুত্বের অধিকারী অন্য কোন শক্তি নেই এবং সে জন্যে আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য করা যেতে পারে না। এরূপ ঈমান-আকীদার অধিকারী সমাজ আল্লাহ ব্যতীত অপর সকলের কর্তৃত্ব ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অস্বীকার করতে বাধ্য।

এ ধরনের একটি সমাজ জন্ম নেয়ার পর যখন বাস্তব কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং আইন ও বিধান প্রণয়নের জন্যে একটি বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, তখনই ইসলাম সংবিধান রচনা, আইন-কানুন প্রণয়ন ও রীতিনীতি প্রবর্তন করে। ইসলামী বিধান শুধু সে সমাজেরই উপর প্রযোজ্য যারা নীতিগতভাবে এ আইনের কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছে এবং অনৈসলামিক আইন-কানুনকে বাতিল ঘোষণা করেছে।

আদর্শ বাস্তবায়নে ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা

এ মতবাদে যারা বিশ্বাসী তাদের নিজেদের সমাজে ইসলামী জীবন বিধান প্রবর্তন ও ইসলামী আইন জারি করার ক্ষমতা থাকা দরকার। দৈনন্দিন জীবনে যেসব নিত্য-নৈমিত্তিক সমস্যাদি দেখা দেয় সেগুলোর সমাধান কল্পেও তাদের আইন রচনা করার ক্ষমতা থাকা অত্যন্ত জরুরী।

মক্কায় মুসলমানগণ নিজেদের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রাপ্ত ছিলেন না। ঐ সমাজে তাদের কোন প্রভাবও ছিল না। আল্লাহর আইন মুতাবিক জীবন-যাপন করার উপযোগী কোন স্থায়ী সংগঠনের আকারে তখনও তারা নিজেদের গড়ে তুলতে পারেনি। সে জন্যে মক্কী জীবনে মুসলমানদের উপর আল্লাহ তাআলা তাদের সমষ্টিগত জীবনের উপযোগী কোন বিধান নাযিল করেননি। সে স্তরে তাদের শুধু ঈমান ও ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট নৈতিক মূল-সূত্রগুলো শেখানো হয়েছিল। পরবর্তীকালে মদীনায় একটি স্বায়ত্বশাসিত রাষ্ট্র স্থাপিত হবার পর মুসলমান সমাজের প্রয়োজন পূরণ করার উপযোগী একটি পরিবেশ গড়ে ওঠে এবং আইন-কানুন প্রবর্তনের ক্ষমতা হস্তগত হয়। এ অবস্থা সৃষ্টি হবার পরই মুসলমানদের উপর সাধারণ আইন-কানুন নাযিল হতে শুরু করে।

মক্কীস্তরে আল্লাহ তাআলা সকল আইন-কানুন নাযিল করে মদীনায় স্থানান্তরের পর বাস্তবায়নযোগ্য পূর্ণাঙ্গ একটি জীবন বিধান দান করেননি। কারণ, তা ইসলামী আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ইসলাম আরও অধিক বাস্তবধর্মী এবং অনেক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। এ আদর্শ কাল্পনিক সমস্যার সমাধানে এগিয়ে যায় না। সে প্রথমে সমাজের বিরাজমান অবস্থা পর্যালোচনা করে এবং যদি তার মানদণ্ড মুতাবিক সমাজের অবস্থা পর্যালোচনা করে এবং যদি তার মানদন্ড মুতাবিক সমাজের অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতা একটি মুসলমান সমাজের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও আল্লাহর বিধানের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পিত হয়, তাহলে ইসলামী জীবনাদর্শ ঐ সমাজের চাহিদা ও অবস্থার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করে।

বর্তমানে দুনিয়ার কোন একটি সমাজেও মানব রচিত বিধানের পরিবর্তে আল্লাহর শরীয়াত প্রতিষ্ঠিত দেখা যায় না এবং এ জাতীয় দায়িত্ব পালনের উপযোগী কোন রাজনৈতিক শক্তিও নেই। এ অবস্থা স্বচক্ষে দেখার পরও যারা ইসলামী আদর্শের বাস্তবরূপ ও উক্ত আদর্শ মুতাবিক একটি পূর্ণাঙ্গ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও আইন রচনার দাবী জানায় তারা ইসলামী জীবনাদর্শের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অজ্ঞ। আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে তাঁর দ্বীন নাযিল করেছেন, সে উদ্দেশ্যটিও তারা উপলব্ধি করতে অক্ষম। তারা ইসলামী আদর্শের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি ও ঐতিহ্য পরিবর্তন করে মানব রচিত আইন-বিধানের পর্যায়ে ইসলামকে টেনে নামানোর দাবীই উত্থাপন করে। মানব রচিত অপূর্ণ জীবন বিধানের সংঘর্ষে তাদের মনে যে পরাজয়ের মনোবৃত্তি জন্মেছে, তারই প্রভাবে তারা সংক্ষিপ্ত পথে লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। তারা ইসলামী জীবন বিধানকেও কতগুলো অবাস্তব নীতি ও নাম স্বর্বস্ব গুণাবলীর সমষ্টি হিসেবে দেখতে চায়। কিন্তু অতীতে যে পদ্ধতি অবলম্বন করে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো

আল্লাহ তাআলা ঠিক সে পদ্ধতিতেই এর পুনঃ প্রতিষ্ঠা চান। প্রথমত একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি অটল ঈমান মানুষের মন-মগযে গভীরভাবে বদ্ধমূল হতে হবে। আর ঈমানের বিষয়টি হচ্ছে এই যে, মানুষ আল্লাহ ছাড়া আর কোন শক্তির নিকট মাথা নত করবে না এবং অন্য কোন কর্তৃপক্ষের আইন-বিধান গ্রহণ করতে রাযী হবে না। এ আকীদা-বিশ্বাস মুতাবিক গড়ে উঠা মন-মগযের অধিকারী একদল লোক যখন পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে কোন সমাজের বাস্তব নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করে, তখনই শুধু ঐ সমাজের প্রয়োজন অনুসারে মূল আকীদা-বিশ্বাস বহাল রেখে আইন প্রণয়ন সম্ভবপর হবে। আল্লাহ তাআলা ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়নের জন্যে এ পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। আর তিনি যা নির্ধারণ করেছেন তা লংঘন করে অন্য কোন পদ্ধতিই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সঠিক উপায়

ইসলামী জীবন বিধানের প্রতি আহবানকারীদের জেনে রাখা উচিত যে, তারা মানুষকে সর্বপ্রথম ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনয়নের জন্যে আমন্ত্রণ জানাবেন। যদিও তারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করেন এবং যদিও সরকারী রেকর্ড পত্রে তাদের মুসলমান বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তবু ইসলামী বিধানের আহবায়কগণ প্রথমে মানুষকে বুঝিয়ে দেবেন যে, ইসলামের অর্থ হচ্ছে কালেমায়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে তার সঠিক তাৎপর্যসহ গ্রহণ করা। কালেমার সঠিক তাৎপর্য হচ্ছে নিজের জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়া এবং যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিপরীত নিজেদের সার্বভৌমত্ব দাবী করে তাদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করা। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের উপরোক্ত তাৎপর্য গ্রহণ করার পর নিজেদের মন-মস্তিষ্ক, জীবনযাত্রা এবং চাল-চলনে এ বিশ্বাসের প্রতিফলন অপরিহার্য।

ইসলামী জীবন বিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন যারাই শুরু করুক না কেন তাদের এ বিষয়টিকে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। ইসলামের সর্বপ্রথম আন্দোলন এভাবেই শুরু করা হয়েছিল। কুরআন নাযিলের মক্কী স্তরে তের বছরকাল যাবত এ বিষয়টিকে দৃঢ়মূল করার কাজেই ব্যয়িত হয়েছিল। যারা ইসলামী আন্দোলনের উপরোক্ত তাৎপর্য উপলব্ধি করার পর আন্দোলনে যোগদান করে শুধু তাদের সমষ্টিকেই সত্যিকার ইসলামী সংগঠন বা ইসলামী সমাজ আখ্যা দেয়া যেতে পারে এবং একমাত্র ঐ জামায়াত বা সমাজই সমষ্টিগত জীবনে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়িত করার যোগ্য। কারণ, তারা স্বেচ্ছায় তাদের পরিপূর্ণ জীবনের উপর ইসলামী আদর্শকে রূপায়িত

করার এবং এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো সার্বভৌমত্ব গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এভাবে যখন উপরোক্ত ধরনের একটি সমাজ জন্ম লাভ করবে এবং ইসলামী শিক্ষাই সে সমাজের ভিত্তি হিসেবে গৃহীত হবে, তখনই সে সমাজ তার পারিপার্শ্বিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী বিধান প্রণয়ন করতে অগ্রসর হবে। ইসলামী জীবনাদর্শ প্রবর্তনের এটাই হচ্ছে বাস্তবধর্মী এবং বিজ্ঞজনোচিত কর্মপন্থা।

ইসলামী জীবনাদর্শের বৈশিষ্ট্য যারা উপলব্ধি করতে পারেননি, সেরূপ এক শ্রেণীর নিষ্ঠাবান লোক এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেন। তারা বুঝেন না যে, সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ তাআলা দ্বীন প্রতিষ্ঠার যে পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন. তার মধ্যে প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাঁরা মনে করেন যে, ইসলামী আদর্শের মৌলিক নীতি ও আইন-বিধান সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার সাথে সাথেই তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে অগ্রসর হবেন। প্রকৃতপক্ষে এটা হচ্ছে তাড়াহুড়া করে কিছু করে ফেলার মনোভাব সম্পন্ন লোকদের কাল্পনিক ধারণা।

এ ধরনের ধারণা যদি রাসূলে করীম (সা)-কে দেয়া হতো এবং তিনি যদি ভৌগলিক জাতীয়তা, অর্থনৈতিক বিপ্লব অথবা সংস্কারবাদী আন্দোলনের প্রতি জনগণকে আহবান করতেন তাহলে তাঁর কাজ অনেক সহজ হয়ে যেতো। কিন্তু তিনি সে পথ গ্রহণ করেননি। ইসলামী জীবনাদর্শের বিস্তারিত আইন-কানুন সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করে তাদেরকে এ দিকে আকৃষ্ট করার আগে তাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি গভীর ঈমান আনয়ন ও অপরাপর সকল বিধান বাতিল করে দিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা অত্যন্ত জরুরী। আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ও অন্যান্য মানবীয় দাসত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতির ফল স্বরূপই আল্লাহর শরীয়াতের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হবে, অন্যান্য বিধানের তুলনায় আল্লাহর বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচনা করে নয়। অবশ্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ প্রদত্ত বিধান মানব রচিত বিধানের তুলনায় সর্বোতোভাবে শ্রেষ্ঠ। কারণ, এ বিধান স্বয়ং স্রষ্টার রচিত এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির রচিত বিধান কখনও সমপর্যায়ে আসতেই পারে না। কিন্তু বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব ইসলামী আন্দোলনের ভিত্তি হতে পারে না। এর ভিত্তি হচ্ছে বিনা দ্বিধায় শরীয়াতে ইলাহীকে গ্রহণ ও শরীয়াত বহির্ভূত সকল ধরনের বিধানকে সরাসরি বর্জন। এটাই ইসলামের তাৎপর্য এবং এ ছাড়া অন্য কিছুই ইসলাম নয়। ইসলামের মূল ভিত্তির প্রতি যে আকৃষ্ট হবে তাকে একটি একটি করে ইসলাম

ও অন্যান্য বিধানের বিস্তারিত পার্থক্য বুঝানোর কোন প্রয়োজনই হবে না। ঈমানের মূলকথা এটাই।

জাহেলিয়াতের মুকাবিলায় ইসলাম

তের বছরের মক্কী জীবনে কুরআন কিভাবে ঈমান-আকীদা গড়ে তুলেছিল এবার সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক। ঈমান-আকীদার বিষয়টিকে কুরআন একটি নিছক তত্ত্ব বা আধ্যাত্মিক ধারণা হিসেবে উপস্থাপন করেনি কিংবা বিদ্বান ও পন্ডিত ব্যক্তিদের গ্রন্থ রচনার কৌশলও অবলম্বন করেনি। কুরআন সর্বদা মানুষের প্রকৃতির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং তার নিজের সত্তা ও চারিপার্শ্বে ছড়ানো স্রষ্টার অসংখ্য নিদর্শনাবলীর প্রতি লক্ষ্য করার জন্যে উৎসাহ প্রদান করেছে। কুরআন মানুষের চিন্তাশক্তিকে কুসংস্কার ও গোঁড়ামী থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং তার সুপ্ত বুদ্ধিমত্তাকে শাণিত করে তুলেছে। আর এভাবে মানুষের মরচে ধরা বোধশক্তিকে সৃষ্টি রহস্যের সূক্ষ্ম কৌশলগুলো উপলব্ধি করার যোগ্যতা দান করেছে। এটা ছিল কুরআনী শিক্ষার একটি সাধারণ দিক। তার শিক্ষার বৈপ্লবিক দিক হচ্ছে তাওহীদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজের অভ্যন্তরে যাবতীয় জাহেলিয়াত ও নির্যাতনমূলক মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করা। ভ্রান্ত মতাদর্শের জগদ্দল পাথর যে সময় মানব সমাজকে পিষ্ট করছিল সে সময় নিছক নীতিকথা প্রচার ছিল অর্থহীন। তাই কুরআন দৃঢ়তার সাথে ভ্রান্ত মতাদর্শের পর্দা ছিড়ে ফেলে মিথ্যার প্রাচীর ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়ার উদ্দেশ্যে এক আপোষহীন লড়াই শুরু করে দেয়। পরবর্তীকালে যেসব জ্ঞানগর্ব তত্ত্ব, তর্কবিদ্যা ও যুক্তিশাস্ত্রের অবতারণা করা হয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমেও কুরআনী শিক্ষা প্রচারিত হয়নি। কুরআন মানব রচিত গোটা সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম শুরু করেছিল। দুর্নীতি ও অন্যায়-অত্যাচারে জর্জরিত মানবতাকে লক্ষ্য করেই কুরআন নিজের বক্তব্য পেশ করে। নিছক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রচার করে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করার উপায় ছিল না। কারণ, ইসলাম মূলত ঈমানভিত্তিক জীবনাদর্শ হলেও বাস্তব জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করাই তার লক্ষ্য। নিছক নীতিগত আলোচনা ও আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকার জন্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়নি।

কুরআন একদিকে ইসলামী জামায়াতের সদস্যবৃন্দের অন্তরে ঈমানের বীজ বপন ও তার ক্রমোন্নয়নে যত্ন নেয় এবং অপর দিকে ঐ সদস্যবৃন্দের দ্বারাই জাহেলিয়াতের দুর্গে আক্রমণ চালায় এবং মুসলমানদের নিজেদের চিন্তা ও চাল-চলন থেকে জাহেলিয়াতের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে দেয়ার অভিযান পরিচালনা করে। এক চতুর্মুখী রণ বিক্ষুব্ধ সমাজে ঝড়-তুফানের ভিতর দিয়েই

ঈমান শক্তি সঞ্চয় করে। পান্ডিত্যপূর্ণ তত্ত্বমূলক আলোচনায় ঐরূপ শক্তি সঞ্চয় হতে পারে না। ইসলাম একটি সদা-সক্রিয়, সুসংগঠিত ও জীবন্ত আন্দোলন এবং মুসলিম সমাজ ঐ আন্দোলনের মূর্ত প্রতীক। আর ইসলামী জামায়াতের চিন্তাধারা, নৈতিক মানদন্ড ও শিক্ষা-দীক্ষা ঈমানী ভাবধারার সাথে সংগতিশীল হয়ে গড়ে উঠে। ইসলামী আন্দোলনের ক্রমবিকাশ ঈমানের ক্রমোন্নয়নেরই বাস্তবরূপ এবং ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের এটাই হল সঠিক পদ্ধতি অর্থাৎ ঈমানী শক্তির মান ও স্তরের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করেই ইসলামী আন্দোলন প্রসার ও বিস্তার লাভ করবে।

ইসলাম নিছক মতবাদ নয়

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের উপরে বর্ণিত বৈপ্লবিক পদ্ধতিটি স্মরণ রাখতে হবে। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে যে, মক্কী স্তরের দীর্ঘ সময়ে উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে ঈমান মযবুত করার ও ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একটি সংগঠন তৈরী করার কাজ পৃথকভাবে করা হয়নি। বরং একই সাথে ও একই সময়ে ঈমানের বীজ বপন ও ইসলামী শিক্ষার ভিত্তিতে সংগঠন কায়েম করার সূত্রপাত হয়। তাই ভবিষ্যতে যখনই ইসলামী জীবনাদর্শের পুনর্জাগরণের চেষ্টা চালানো হবে তখনই ঐ ব্যাপক পদ্ধতি অবলম্বন ব্যতীত উদ্দেশ্য সিদ্ধি সম্ভবপর হবে না।

ঈমান আকীদা মযবুত করার জন্যে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন এবং এ জন্যেই তা ক্রমে ক্রমে বাঞ্ছিত লক্ষ্যের দিকে ধীর গতিতে এগিয়ে যায়। এর প্রতিটি পদক্ষেপই দৃঢ় ও সঠিক হবে। নিছক নৈতিকতা ও তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় এ স্তরে মোটেই কালক্ষেপ করা চলবে না। বরং ঈমানের বিষয়বস্তুকে কর্মজীবনে বাস্তব নমুনা হিসেবে ফুটিয়ে তুলতে হবে। প্রথমত মানুষের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করবে এবং তা এমন একটি সদা সক্রিয় জামায়াতের জন্ম দেবে যার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল দিক ও বিভাগ 'ঈমানে'র বাস্তবরূপ ধারণ করে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। এ বিপ্লবী জামায়াত কথায় ও কাজে জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে প্রাকাশ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে। আর এভাবেই চারপাশের জাহেলী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার ভিতর দিয়েই 'ঈমানে'র জলন্ত রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

যারা মনে করেন, নিছক ইসলামী আদর্শের প্রশংসা কীর্তন ও ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানগর্ব তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমেই ইসলামী আদর্শ বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, তারা মারাত্মক ভুলে নিমজ্জিত। এ জাতীয় ভ্রান্ত ধারণার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন।

কুরআন একদিনে নাযিল হয়নি। বরং ঈমানের বীজ বপন, ঈমানের কাঠামো রচনা ও ঈমানের শক্তি বৃদ্ধির জন্যে তেরটি বছরের প্রয়োজন হয়েছিল। আল্লাহ তাআলার মরজী হলে তিনি পূর্ণ কুরআন একদিনেই নাযিল করতেন। অতপর ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও ঐ মতবাদকে ভাল করে উপলব্ধি করার জন্য তের বছর সময় দান করতে পারতেন।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ পদ্ধতি গ্রহণ করেননি। কারণ তার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। তিনি পৃথিবীর বুকে একটি নজিরবিহীন জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন একই সাথে ঐ জীবন বিধানের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস গড়তে, আদর্শের ধারক ও বাহক একটি আন্দোলন সংগঠিত করতে এবং বাঞ্ছিত জীবনাদর্শের প্রতিচ্ছবি স্বরূপ একটি সমাজ কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করতে। তিনি আকীদা-বিশ্বাসের শক্তিপুষ্ট জামায়াত ও আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং ঐ একই সাথে চেয়েছিলেন জামায়াত ও আন্দোলনের কর্মতৎপরতার ভিতর দিয়ে ঈমানকে ক্রমশ শক্তিশালী করে তুলতে। জামায়াত ও আন্দোলনের অগ্রগতির সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি এবং জামায়াত ও আন্দোলনের প্রকাশ্য তৎপরতায় ঈমানের প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুট হয়ে উঠাই আল্লাহ তাআলার নিকট পসন্দনীয় ছিল। মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাআলা ভালভাবেই জানতেন যে, মানুষের সংশোধন ও সুষ্ঠু সমাজ গঠনের কাজ রাতারাতি সম্পন্ন হয় না। কারণ, আকীদা-বিশ্বাস গড়ে তোলার জন্যে ততটুকু সময় প্রয়োজন, যতটুকু কোন মানুষের একটি সুসংগঠিত জামায়াত গঠনের জন্যে প্রয়োজন।

এটাই ইসলামী জীবন বিধানের বৈশিষ্ট্য। কুরআন নাযিলের মক্কীস্তর এ বৈশিষ্ট্যেরই প্রমাণ পেশ করে। আমাদের অবশ্যই দ্বীনের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং মানব রচিত অর্থহীন আদর্শগুলোর অন্তসারশূন্য চাকচিক্য দর্শনে অভিভূত হয়ে দ্বীনের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকতে হবে। ইসলাম তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রভাবেই প্রাচীনকালে মুসলিম উম্মাত নামে একটি বিরাট ও মহান উম্মাত গঠন করেছিল এবং ভবিষ্যতে ধরাপৃষ্ঠে যখনই মুসলিম উম্মাতের পুনর্গঠন জরুরী বিবেচিত হবে, তখন দ্বীনের বৈশিষ্ট্য ও নিজস্ব কর্মপদ্ধতির মাধ্যমেই তা করা সম্ভবপর হবে।

মানব দেহের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার মত ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস সমাজের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হবে এবং সক্রিয় ইসলামী সংগঠনের দেহ-কাঠামোর অভ্যন্তরে জ্বলন্ত মশালের ন্যায় দীপ্তিমান থাকবে।

ইসলামী জীবন বিধানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও গতিধারা পরিবর্তন করে যারা তাত্ত্বিক আলোচনা ও জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে বাতিল জীবনাদর্শগুলোর তুলনায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে তারা শুধু মারাত্মক ভুলই করে না, উপরন্তু তারা এক বিপজ্জনক পথে অগ্রসর হতে চায়।

ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের দাবী হচ্ছে এই যে, এ বিশ্বাস জীবন্ত মানুষ সক্রিয় ও কর্মতৎপর সংগঠন ও সম্ভাবনাময় সমাজের অন্তস্থলে স্থান দখল করবে এবং জাহেলী পারিপার্শ্বিকতার বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করে দেবে। প্রতিষ্ঠিত সমাজকে জাহেলিয়াতের প্রভাব থেকে মুক্ত করার সংগ্রাম পরিচালনার সাথে সাথে ঈমানী শক্তি ইসলাম গ্রহণকারীদের মন, মগয ও চরিত্র থেকে জাহেলী সমাজের যাবতীয় কলংক মিটিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে লড়াই চালিয়ে যাবে। কেননা, ইসলামী আন্দোলনের ধারক-বাহকগণ বাতিল ও জাহেলিয়াত প্রভাবিত সমাজেই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার পরেও তাদের জীবনে জাহেলিয়াতের কিছু প্রভাব থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়।

ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস তার উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের দরুন মানুষের মন-মগযে বিরাট ও ব্যাপক স্থান অধিকার করে বসে। নিছক তাত্ত্বিক আলোচনা ও ইসলামের গুণ-কীর্তনের প্রচেষ্টা এত সুদূরপ্রসারী হয় না। কারণ ইসলাম শুধু মাত্র মগযের উপর প্রভাব বিস্তার করেই ক্ষান্ত থাকে না বরং মানুষের বাস্তব কর্মজীবন এবং চরিত্রও তার বেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

স্রষ্টা, সৃষ্টি, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে ইসলাম প্রদত্ত ব্যাখ্যা শুধু ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গই নয়, অধিকন্তু তা বাস্তবমুখী ও ইতিবাচক। স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির চাহিদা মুতাবিক ইসলাম নিছক বুদ্ধিগ্রাহ্য ও জ্ঞানচর্চার বিষয়বস্তুতে সীমিত হয়ে থাকা পসন্দ করে না। এটা তার প্রকৃতি ও চরম উদ্দেশ্যের বিপরীত। ইসলাম সচল মানুষের জীবনযাত্রা, সক্রিয় সংগঠন ও বাস্তবধর্মী আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। সে বিপ্লবী মানুষের কর্মতৎপরতা, বিপ্লবী আন্দোলন ও সদা চঞ্চল সংগঠনের ভিতর দিয়ে এমনভাবে প্রসার লাভ করে যেন তার প্রদত্ত চিন্তাধারা বাস্তব কর্মজীবনের সাথে সঙ্গতিশীল হয়। এটা কখনো একটি গুণবাচক বিশেষ্য হিসেবে থাকা পসন্দ করে না বরং নীতি ও বাস্তব কর্মসূচীর মধ্যে সর্বদাই সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, নীতিগতভাবে প্রথম স্তরে ইসলামের পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করে পরবর্তী স্তরে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ রূপায়ণের ধারণা শুধু ভ্রান্তই নয় বরং অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এটা ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا -

"লোকদেরকে ধীরে ধীরে শোনানোর সুবিধার্থে আমি অল্প অল্প করে কুরআন নাযিল করেছি এবং (বিশেষ বিশেষ সময়ে) ক্রমশ কুরআন অবতীর্ণ করেছি।"—বনী ইসরাঈল ঃ ১০৬

উপরোক্ত আল্লাহর বাণী অনুসারে একই সময়ে দু'টো বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রথমত অল্প অল্প করে কুরআন নাযিল করা এবং দ্বিতীয়ত, লোকদের ধীরে ধীরে কুরআন শুনানো। এ ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমানের ভিত্তিতে একটি জীবন্ত ও সক্রিয় সংগঠন গড়ে তোলা এবং ঐ সংগঠনকে ক্রমশ পূর্ণত্বের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া। কারণ, এ জীবন বিধান বাস্তবায়িত হবার জন্যে এসেছে। নিছক উত্তম মতবাদ হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্যে নয়।

আল্লাহ প্রদত্ত আদর্শ বাস্তবায়নে আল্লাহ প্রদত্ত কর্মসূচী

দ্বীনের বাণীবাহকদের একথা ভালোভাবেই বুঝে নিতে হবে যে, ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান এবং এ আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিও ঐশী বাণীর মারফত স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাই সে পদ্ধতি অবলম্বন ব্যতীত দ্বীনের প্রতিষ্ঠা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাদের আরও বুঝতে হবে যে, এ দ্বীন শুধু আকীদা-বিশ্বাস ও জীবন যাত্রা প্রণালী পরিবর্তন করার জন্যে নাযিল হয়নি বরং সে পরিবর্তনের পদ্ধতি পরিবর্তনও তার লক্ষ্য। এ দ্বীন বিশেষ ধরনের আকীদা-বিশ্বাস গড়ে তোলে, একটি বৈশিষ্ট্যময় উম্মাত তৈরী করে এবং সাথে সাথে এক বিশেষ ধরনের চিন্তা-কর্মধারাকে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে পূর্ণত্ব দান করে। এ দ্বীন আকীদা-বিশ্বাস ও জীবনে যখন যে পরিমাণ পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়, ঠিক সে পরিমাণেই তার প্রতিষ্ঠার জন্যে শক্তি নিয়োগ করে। তাই বাঞ্ছিত চিন্তাধারার প্রবর্তন নির্দিষ্ট আকীদা-বিশ্বাস গড়ে তোলা এবং বিশেষ ধরনের জীবনযাত্রা বাস্তবায়নের কাজ পৃথক পৃথক ভাবে নয়, বরং পাশাপাশি একই সাথে সম্পন্ন হয়। বরং বলা যায় এগুলো একই ফুলের পাপড়ি বিশেষ।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানলাম যে, দ্বীনের নিজস্ব কর্মপদ্ধতি সুনির্দিষ্ট। সাথে সাথে এটাও জানা গেল যে, কর্মপদ্ধতি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও

চিরস্থায়ী। এ পদ্ধতি ইসলামী দাওয়াতের বিশেষ স্তর, বিশেষ অবস্থা বা বিশেষ পরিবেশের জন্যে তৈরী হয়নি। অথবা এটা শুধুমাত্র সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর জন্যেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য ছিল না। বরং এ পদ্ধতি যুগ ও কালের বন্ধনমুক্ত। যখনই দুনিয়াতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হবে, তখনই এ পদ্ধতিতেই আন্দোলন চালাতে হবে এবং অন্য কোন উপায়-পদ্ধতি অবলম্বন করে এ দ্বীনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

ইসলাম মানুষের আকীদা-বিশ্বাস এবং ব্যবহারিক জীবনের যাবতীয় কাজকর্মের পরিবর্তন সাধনের সাথে সাথে দৃষ্টিভংগী এবং চিন্তাধারাও পরিবর্তন করে দেয়। তার পরিবর্তন পদ্ধতিও মানব রচিত পরিবর্তন পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ শেষোক্ত পদ্ধতি অর্থহীন ও সংকীর্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন।

আমরা আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত পদ্ধতি গ্রহণ না করে কিছুতেই ঐশীবাণী থেকে উপকৃত হতে পারব না এবং মানবজাতির চিন্তাধারা ও অভ্যাস পরিবর্তন করতেও সক্ষম হবো না।

আমরা যখন ইসলামকে নিছক একটি মতবাদ হিসেবে অধ্যয়ন করার অথবা জ্ঞান চর্চার মজলিসে মুখরোচক আলোচ্য বিষয়ে পরিণত করার চেষ্টা করি, তখন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ প্রদত্ত বিপ্লবী পদ্ধতি ও চিন্তাধারা থেকে তাকে পৃথক করে নেই। আর এভাবে এ আল্লাহর জীবনাদর্শকে মানব রচিত জীবন বিধানের পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে আসি। আমাদের এ জাতীয় কর্মকান্ডের মাধ্যমে বাস্তব ক্ষেত্রে মানব রচিত পদ্ধতিগুলোকে আল্লাহ প্রদত্ত সংস্কার পদ্ধতির উর্ধে স্থান দেই এবং আমরা যেন আল্লাহর পদ্ধতিকে সংশোধন করে মানব রচিত পদ্ধতির সমমর্যাদায় উন্নীত করতে চেষ্টা করি। এ ধরনের দৃষ্টিভংগী অত্যন্ত মারাত্মক এবং পরাজিত মনোবৃত্তিরই পরিণতি।

মহাসত্যের বাণী ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণকে চিন্তা-ভাবনার একটি বিশেষ মানদন্ড প্রদান করে। দুনিয়ায় প্রচলিত জাহেলিয়াতের প্রভাবে আমাদের মন-মস্তিষ্কে যেসব ভ্রান্ত চিন্তা প্রবেশ করে আমাদের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত ও শিক্ষা সংস্কৃতিকে বিষাক্ত করে তুলেছে, সেগুলোর প্রভাব থেকে এ মানদন্ডের সাহায্যেই তারা পরিশুদ্ধ হতে পারে। যদি আমরা আমাদের দ্বীনকে তার প্রকৃতির বিপরীত বিরাজমান জাহেলিয়াতের দৃষ্টিভংগী অনুসারে পরিবর্তন করতে উদ্যত হই, তাহলে এ দ্বীন মানব সমাজের জন্যে কল্যাণহীন হয়ে পড়বে এবং মানব সমাজ আসল দ্বীনের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে। শুধু তাই নয়, আমাদের নিজেদের পক্ষেও জাহেলী মতবাদের অনিষ্টকারিতা থেকে দূরে থাকা সম্ভব হবে না। বিষয়টি এদিক দিয়েও চরম ক্ষতিকারক।

ইসলামী আদর্শকে মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা-চরিত্র ইসলামী আকীদা ও জীবন বিধানের প্রতি ঈমান আনয়নের চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং তা পৃথকও নয়।

ইসলামী মতবাদ প্রচার এবং ইসলামী জীবন বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যে মৌলিক ও লেখনীর সাহায্যে চেষ্টা-তদবীর করা আমাদের নিকট খুবই উত্তম ও আনন্দদায়ক বিবেচিত হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, নিছক প্রচার ও গুণ-কীর্তনের দ্বারা ইসলাম কখনো পৃথিবীতে বাস্তব সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। আমাদের বুঝতে হবে যে, উপরোক্ত পন্থা থেকে শুধুমাত্র ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরাই উপকৃত হতে পারে এবং তাও শুধু আন্দোলনের যতটুকু অগ্রগতি হয় ততটুকুই। তাই আমি আবার বলি, ইসলামের প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথেই এ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে আন্দোলন শুরু করতে হবে এবং আন্দোলন সত্যিকার ও নিখুঁতভাবে ইসলামের প্রতিচ্ছবি রূপে আত্মপ্রকাশ করবে।

আমি একথারও পুনরুক্তি করতে চাই যে, ইসলামী আন্দোলন পরিচালনা পদ্ধতিও ঐশীবাণী দ্বারাই নির্ধারিত এবং এ পদ্ধতি নিখুঁত স্থায়ী এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী। অন্য সকল পদ্ধতি অপেক্ষা এ পদ্ধতি মানব প্রকৃতির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এ কারণেই বাস্তব আন্দোলনে অবতীর্ণ হওয়া এবং এ সম্পর্কে মানুষের অন্তরে জীবন্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়া এবং এ পদ্ধতি ধাপে ধাপে অনুসরণের পূর্বে ইসলাম এটাকে একটি নির্দিষ্ট ও পরিপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে মানুষের কাছে পেশ করেছে।

ইসলামী আকীদার মূলসূত্র সম্পর্কে যদি উপরোক্ত কথা সত্য হয়, তাহলে ইসলামী সমাজের সাংগঠনিক কাঠামো এবং বিস্তারিত আইন প্রণয়ন সম্পর্কেও ঐ একই সত্য প্রযোজ্য। আমাদের চারিদিকে সুপ্রতিষ্ঠিত জাহেলিয়াত ইসলামের কোন কোন নিঃস্বার্থ কর্মীদের মনে এতটুকু প্রভাব বিস্তার করেছে যে, তারা ইসলামী বিপ্লবের স্বাভাবিক অগ্রগতির স্তরগুলো অতিদ্রুত অতিক্রম করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে নিম্নের প্রশ্নগুলো উত্থাপন করেছেন। আমরা যে আদর্শের বাণী প্রচার করছি তার বিস্তারিত বিধানগুলো কি? এগুলো প্রতিষ্ঠার জন্যে আমরা কি পরিমাণ গবেষণা করেছি? এ পর্যন্ত আমরা কতগুলো বিষয় সুবিন্যস্ত করতে ও কতগুলো প্রবন্ধ রচনা করতে সক্ষম হয়েছি? নতুবা আদর্শের যুগোপযোগী ব্যবস্থাশাস্ত্র (ফিকাহ) রচিত হয়েছে কি? তাদের প্রশ্ন শুনে মনে হয়, ইসলামী আইন প্রণয়নের জন্যে গবেষণা ও বিস্তারিত ব্যবস্থাশাস্ত্র (ফিকাহ) রচনা ছাড়া আর সকল কাজই সম্পন্ন হয়ে গেছে। মনে হয়,

সমাজের সকলেই যেন আল্লাহর বিধান মেনে নিয়ে তদনুযায়ী জীবনযাপন করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে এবং শুধুমাত্র আধুনিক যুগোপযোগী ব্যবস্থাশাস্ত্র রচনার জন্যে একদল মুজতাহিদেরই অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটা ইসলামের প্রতি এক জঘন্য বিদ্রূপ। ইসলামে বিশ্বাসী প্রতিটি ব্যক্তিরই এ জাতীয় বিদ্রূপাত্মক আচরণ সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার।

উপরোক্ত পন্থা অবলম্বন করে জাহেলিয়াত শরীয়াতে ইলাহীর বাস্তবায়ন প্রতিরোধ করে মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাকারী ব্যবস্থাকে বহাল রাখার জন্যে বাহানা তালাশ করছে মাত্র। সে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ঈমানী শক্তিকে বিপ্লবী আন্দোলন থেকে বিরত রেখে শুধুমাত্র আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে পরিতৃপ্ত থাকতে বলে। জাহেলিয়াত ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়ন প্রচেষ্টার সঠিক পথ থেকে ইসলামের নামোচ্চারণকারীদের হটিয়ে দিতে চায়। আন্দোলন ও সংগ্রামের যে পথে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস পরিপক্কতা লাভ করে, যে সংগ্রাম ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে ইসলামী ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করে এবং যে আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে বাস্তব সমস্যা ও অসুবিধাদি দূর করার জন্যে সময়োপযোগী ইসলামী আইন প্রণীত হয়, সে আন্দোলন ও সংগ্রাম থেকে ঈমানদারদেরকে দূরে সরিয়ে রাখাই বাতিল মতাদর্শের লক্ষ্য।

ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠাকারীদের এসব অপকৌশল নস্যাত করে দিয়ে বাতিলকে ধূলিস্মাৎ করে দিতে হবে এবং যে সমাজ আজও মানব রচিত বিধান বাতিল করে আল্লাহর বিধান গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হয়নি, সে সমাজে ইসলামী ব্যবস্থা শাস্ত্রের আধুনিকীকরণের হাস্যকর প্রচেষ্টা প্রত্যাখান করতে হবে। মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণের সময় ও শ্রম শূন্যে প্রাসাদ নির্মাণের প্রচেষ্টায় অপচয় করানোর উদ্দেশ্যেই এসব উক্তি করা হয়। তাদেরকে অবশ্যই এসব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে হবে।

এ দ্বীন নিজের প্রতিষ্ঠার জন্যে যে কর্মপদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, শুধু সেই পদ্ধতির মাধ্যমেই আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে। এ কর্মপদ্ধতির ভিতরই দ্বীনি শক্তির রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠাকারীদের বিজয় ও সাফল্য এ পদ্ধতিরই অনিবার্য ফলশ্রুতি।

ইসলামী জীবনাদর্শ ও ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। বাহ্যত যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, অন্য কোন উপায়-পদ্ধতিতেই ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। অন্যান্য পদ্ধতি মানব রচিত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে পারে কিন্তু

আমাদের আদর্শের বেলায় এসব পদ্ধতি একেবারেই অর্থহীন। তাই ইসলামী বিপ্লবের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব পদ্ধতি মেনে চলা দ্বীনের মৌলিক আকীদা ও জীবন ব্যবস্থা মেনে চলার মতই গুরুত্বপূর্ণ।

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ -

"এ কুরআন একেবারে সরল ও সুস্পষ্ট পথের দিকেই হিদায়াত প্রদান করে।" —বনী ইসরাঈল ঃ ৯

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য ও সমাজ গঠনের উপায়

নবীগণের মূল দাওয়াত

হযরত মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর যে বাণী নিয়ে দুনিয়ায় এসেছিলেন তা ছিল সৃষ্টির আদিকাল থেকে আল্লাহর নবীগণ কর্তৃক প্রচারিত বাণী পরম্পরারই সর্বশেষ ধাপ। মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস জুড়ে এ বাণী এক ও অভিন্নরূপে বিরাজমান। আর তা হচ্ছে, এক ও অদ্বিতীয় প্রভু এবং প্রতিপালককে স্বীকার করে নিয়ে তার সমীপে আত্মসমর্পণ ও মানুষের উপর মানুষের সকল প্রকার প্রভুত্বের অবসান ঘোষণা। মানবজাতির ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু'একজন লোক ছাড়া মানব সমাজ সামগ্রিকভাবে কখনো আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব কিংবা বিশ্ব-জগতের উপর তার সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করেননি। বরং তারা সময়ান্তরে আল্লাহ তাআলার গুণাবলী সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করেছে অথবা তার সাহায্যকারী হিসেবে আরও অনেক খোদার কল্পনা করেছে। তারা আকীদা-বিশ্বাস এবং পূজা-উপাসনার ক্ষেত্রে অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন শক্তির সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতির মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্যকারী বা অংশীদার নিরূপণ করেছে। এ উভয়বিধ পন্থাই শির্ক।* কারণ এগুলো মানুষকে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের প্রতি অবতীর্ণ দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। প্রত্যেক নবীর তিরোধানের পর তাঁর অনুসারীগণ কিছুকাল সঠিকভাবে দ্বীনের নির্দেশ মুতাবিক জীবন যাপন করেন। কিন্তু দীর্ঘকাল পর ক্রমে ক্রমে তারা ভ্রান্তির পথে অগ্রসর হয়। এমন কি তারা পুনরায় জাহেলিয়াতের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে শির্কের জীবন যাপন শুরু করে। কোন কোন সময় ঈমান-আকীদা ও পূজা-উপাসনায় শির্ক করে। কোন কোন সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য শক্তির সার্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার করে, আবার কোন সময় উভয় প্রকারের শির্কেই তারা লিপ্ত হয়।

সৃষ্টি জগতে মানুষের মর্যাদা

ইতিহাসের সকল স্তরেই আল্লাহর দ্বীন একই ধরনের বাণী পেশ করছে। এ দ্বীনের লক্ষ্য হচ্ছে ইসলাম। ইসলামের অর্থ মানুষকে আল্লাহর অনুগত ও

---

* শির্ক–আরবী শব্দ। আল্লাহর গুণাবলী কর্তৃত্ব আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে অন্যের প্রতি আরোপ কিংবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পূজা-উপাসনা করাকেই ইসলামী পরিভাষায় শির্ক বলে।

ফরমাবরদার করা এবং মানুষের দাসত্ব থেকে তাদেরকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বে নিয়োজিত করা; মানুষের সার্বভৌমত্ব থেকে মানব রচিত জীবন বিধান ও মূল্যবোধের অক্টোপাশ থেকে মানব সমাজকে উদ্ধার করে জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্ব, কর্তৃত্ব ও আইন-বিধান প্রবর্তন করা। হযরত মুহাম্মাদ (সা) এ উদ্দেশ্য নিয়েই দুনিয়ায় এসেছিলেন এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণেরও ঐ একই দায়িত্ব ছিল। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি আল্লাহ তাআলার আইন-শাসন মেনে চলছে এবং মানুষ বিশ্বপ্রকৃতিরই একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ হিসেবে প্রাকৃতিক আইন মেনে চলতে বাধ্য। মানব দেহের অংগ-প্রত্যংগ যে আইন মেনে চলছে তার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে ব্যবহারিক জীবনেও বিধানদাতা আল্লাহর আইন-শাসন মেনে চলা অপরিহার্য। মানুষ কখনো এ আইনের শাসন প্রত্যাখ্যান করে নিজের জন্যে একটি পৃথক ব্যবস্থা বা জীবন যাপনের ভিন্ন পন্থা আবিষ্কার করতে পারে না। মানুষের দেহে পুষ্টি সাধন, তার রোগ ও সুস্থতা, জীবন ও মরণ সবকিছুই আল্লাহ তাআলার প্রাকৃতিক আইনের অধীন। এমন কি মানুষ স্বেচ্ছায় যেসব কাজকর্মে লিপ্ত হয় তার সুফল বা কুফল প্রাপ্তির ব্যাপারেও সে আল্লাহর আইনের নিকটে সম্পূর্ণ অসহায়। বিশ্ব-জগতে বিরাজমান আল্লাহর বিধান পরিবর্তনের কোন শক্তিই মানুষের নেই। তাই জীবনের যে অংশে মানুষকে আল্লাহ তাআলার বিধান মানা বা না মানার অধিকার দান করা হয়েছে, সে অংশেও আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে জীবনে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন দরকার।

জাহেলিয়াতের অক্টোপাশ থেকে মুক্তির উপায়

জাহেলিয়াত প্রকৃতপক্ষে মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্বেরই অপর নাম। তাই এটা প্রাকৃতিক জগতে প্রচলিত আইনের পরিপন্থী। জাহেলিয়াতের আদর্শ গ্রহণের ফলে মানুষ জীবনের যে অংশ প্রাকৃতিক বিধান মেনে চলতে বাধ্য সে অংশের সাথে ব্যবহারিক জীবনে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর পূর্ববর্তী সকল নবীগণ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়ার বাণী প্রচার করে উপরোক্ত জাহেলিয়াতের উপরই আঘাত হেনেছিলেন। জাহেলিয়াত একটি মতবাদ মাত্র নয়। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তার কোন মতবাদই নেই। জাহেলিয়াত সর্বত্রই একটি প্রতিষ্ঠিত সমাজের রূপধারণ করে এবং একটি সক্রিয় আন্দোলন সর্বদাই তার পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। এ সমাজ তার নিজস্ব নেতৃত্ব, ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ, রীতিনীতি, স্বভাব-প্রকৃতি ও চিন্তা-ভাবনা প্রবর্তন করে।

জাহেলিয়াত সুসংগঠিত। এ সমাজের লোকেরা পারস্পরিক যোগাযোগ, সহযোগিতা, সংগঠন ও শৃংখলার মাধ্যমে এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ হয় যে, সমগ্র সমাজ নিজেদের জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে ঐ সমাজ ব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্যে সমভাবে তৎপর থাকে ; তার অস্তিত্বের জন্যে যারা অনিষ্টকারী বিবেচিত হয় তাদেরকে সে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সরিয়ে দেয়।

জাহেলিয়াত যখন একটি মতবাদ মাত্র না হয়ে একটি সক্রিয় আন্দোলনের রূপ ধারণ করে তখন তাকে উৎখাত করে মানব সমাজকে পুনরায় আল্লাহ তাআলার বন্দেগীর অধীনে আনয়নের জন্যে ইসলামী আদর্শকে নিছক একটি মতবাদ হিসেবে পেশ করে কখনো সফলতা অর্জন করা যাবে না। জাহেলিয়াত বস্তুজগতকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং একটি সক্রিয় সংগঠন তার পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বদা সক্রিয় রয়েছে। এমতাবস্থায় শুধু মতবাদের সাহায্যে তার বিরুদ্ধে শক্তিশালী লড়াই করা তো দূরের কথা তার সামনে দাঁড়ানোও সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় যে, প্রতিষ্ঠিত জাহেলিয়াতের আদর্শকে উৎখাত করে সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও রীতিনীতি বিশিষ্ট আদর্শ প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামের লক্ষ্য এবং জাহেলিয়াত একটি সুসংগঠিত সমাজ ও সংগঠন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে তাকে উৎখাত করার অভিযানও একটি সুসংগঠিত আন্দোলনের রূপ ধারণ করেই রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে। আর এ নতুন আন্দোলন জাহেলিয়াতের তুলনায় অধিকতর সংগঠিত এবং আন্দোলনকারীদের পারস্পরিক সম্পর্ক অধিকতর দৃঢ় ও শক্তিশালী হতে হবে।

ইসলামী সমাজের আদর্শিক ভিত্তি

ইসলাম ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে যে আদর্শিক বুনিয়াদের উপর তার নিজস্ব সমাজ রচনা করেছে তা হচ্ছে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমার সাক্ষ্য দান। এ কালেমার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ-ই প্রভু, তিনিই বিশ্ব-জগতের ব্যবস্থাপক, তিনিই প্রকৃত শাসক এবং সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। মন-মস্তিষ্ক তাঁরই একত্বের নূরে উদ্ভাসিত হতে হবে। ইবাদাত-বন্দেগীতে তাঁর একত্বের প্রমাণ পেশ করতে হবে। ব্যবহারিক জীবনের রীতিনীতি ও আইন-কানুনে তাঁর একত্বের পরিস্ফূরণ হতে হবে। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য এরূপ পরিপূর্ণ সার্বিক পন্থা ব্যতীত বাস্তব ক্ষেত্রে অন্য কোন প্রকারে দেয়া যেতে পারবে না। শরীয়াতের দিক দিয়েও এ ধরনের সাক্ষ্যই হবে নির্ভরযোগ্য।

এ পূর্ণাঙ্গ সার্বিক পন্থা মৌখিক সাক্ষ্যকে এমন এক কার্যকর ব্যবস্থার রূপদান করে যার ভিত্তিতে এ সাক্ষ্যদানকারীকে মুসলিম এবং এর প্রত্যাখ্যানকারীকে অমুসলিম বলা যেতে পারে। আদর্শের দিক দিয়ে এ ভিত্তি স্থাপনের অর্থ এই যে, মানব জীবনকে পুরোপুরি আল্লাহর আনুগত্যের অধীন

করে দিতে হবে। জীবনের কোন ক্ষেত্রেও মানুষ নিজে নিজেই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। বরং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাঁরই আনুগত্য করবে। আল্লাহর নির্দেশ জানবার একটি মাত্র উপায় আছে এবং তাহলো আল্লাহর রাসূল। কালেমায়ে শাহাদাতের দ্বিতীয় অংশে এ উপায়কে ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ বলা হয়েছে। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল।

এ হলো সেই আদর্শিক বুনিয়াদ যার উপরে ইসলামী প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এটাই হলো ইসলামের প্রকৃত প্রাণবস্তু। এ ভিত্তি মানব জীবনের পূর্ণাংগ জীবন বিধান রচনা করে যা জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করতে হবে। এ জীবন বিধান প্রতিটি সমস্যার সমাধান করে। সে সমস্যা দারুল ইসলামে উদ্ভূত হোক অথবা তার বাইরে। মুসলিম সমাজের সাথে সম্পৃক্ত সম্পর্ক সম্বন্ধের বেলায় হোক অথবা মুসলিম সমাজ ও অমুসলিম সমাজের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের বেলায়।

জাহেলী সমাজের মুসলমান অধিবাসী

উপরের বর্ণনা অনুযায়ী ইসলাম এমন কোন স্থবির ও অর্থহীন মতবাদ নয় যে, ইচ্ছা করলে কেউ তাকে একটি আকীদা-বিশ্বাস হিসেবে গ্রহণ করবে এবং পূজা পাঠ করেই তার কাজ শেষ করবে। অতপর বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও সক্রিয় জাহেলী সমাজের অনুসারী হয়ে চলবে। ইসলাম গ্রহণকারীদের অবস্থা এমন হলে বাস্তবে ইসলামের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় ; তারা সংখ্যায় যত বেশীই হোক না কেন। কারণ, যেসব তথাকথিত মুসলমান জাহেলী সমাজের অংগ-প্রত্যংগ হয়ে পড়ে, তারা অবশ্যম্ভাবীরূপে সে সমাজেরই সাংগঠনিক চাহিদা পূরণ করতে বাধ্য থাকবে। অতপর ঐসব মৌলিক প্রয়োজন যা সমাজ জীবনের প্রাণ-চাঞ্চল্য ও অস্তিত্বের জন্যে অনিবার্য, তা পূর্ণ করার জন্যে জ্ঞাতে হোক অজ্ঞাতে হোক তৎপর হয়ে পড়বে। অধিকন্তু এ সমাজের রক্ষক হিসেবে দন্ডায়মান হবে এবং যেসব উপায়-উপাদান তার অস্তিত্ব ও ব্যবস্থাপনার জন্যে বিপ জনক মনে হবে তার উচ্ছেদ সাধন করবে। কারণ, গোটা সমাজ যখন এ সমুদয় কর্তব্য সম্পাদন করবে, তখন তার অনিবার্য অংশরূপে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সেসব কর্তব্য সম্পাদনের জন্যে গোটা সমাজের সাথেই চলতে হবে।

জাহেলী পরিবেশে ইসলামী পুনর্জাগরণের পন্থা

যে মুহূর্তে এক ব্যক্তির মুখ থেকে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' উচ্চারিত হয় ঠিক সে মুহূর্ত থেকেই বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণের

সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এ বিপ্লবী পদক্ষেপ ব্যতীত মুসলিম সমাজ বাস্তবে রূপ লাভ করতে পারে না। দুনিয়ার মৌলিক ইসলাম বিশ্বাসী ও ইসলাম দরদীর সংখ্যা যত বেশীই হোক না কেন, তারা যতদিন পর্যন্ত না পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং একটি জীবন্ত মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত যতদিন না বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সংগঠিত হয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করবে এবং আক্রমণকারী শক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যে জাহেলিয়াতের সমাজ থেকে সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত নেতৃত্বের অধীনে যে পর্যন্ত সংঘবদ্ধ আন্দোলন শুরু না করবে, সে পর্যন্ত ইসলামী সমাজ কায়েম হতে পারবে না। এ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে উল্লেখিত নেতৃত্ব একমুখী উদ্যম-প্রচেষ্টা, সাংগঠনিক কর্মতৎপরতার সামঞ্জস্য বিধান, ইসলামী চরিত্র গঠন ও তার বিকাশ সাধন এবং বাতিল সমাজের সকল প্রভাব পরিশুদ্ধি করণের মাধ্যমে আন্দোলনকে গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ইসলাম এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একটা সংক্ষিপ্ত আকীদা-বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে ইসলাম সমগ্র জীবনকেই পরিবেষ্টিত করে নেয়। এ জীবন বিধানের প্রতি ঈমান আনয়নের সাথে সাথেই একটি বলিষ্ঠ ও সক্রিয় আন্দোলন জন্ম নিয়েছিল। এ আন্দোলন শুধু জাহেলিয়াত থেকে নিজকে পৃথক করে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, উপরন্তু প্রতিষ্ঠিত বাতিল সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। বাস্তবে অস্তিত্বহীন একটি কাল্পনিক মতবাদ হিসেবে ইসলাম দুনিয়ায় আসেনি। আর ভবিষ্যতেও তার অস্তিত্ব একটি বাস্তব ব্যবস্থার মাধ্যমেই প্রকাশ লাভ করতে পারে। জাহেলি সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিদ্যমান অন্ধকারে যদি নতুন করে ইসলামের আলোকবর্তিকা প্রজ্জলিত করা যায়, তাহলে যে কোন যুগ ও দেশের জন্যে এ ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না যে, প্রথমে ইসলামের এ মেজাজ-প্রকৃতি অনিবার্যরূপে বুঝে নিতে হবে। আর তা হচ্ছে এই যে, তার পরিস্ফুরণ ও উন্নতি একটি আন্দোলন এবং আংগিক ব্যবস্থা ব্যতিরেকে কিছুতেই সম্ভব নয়।

মানবতার উন্নয়ন

উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে ইসলাম যখন তাওহীদের ভিত্তিতে একটি মুসলিম উম্মাতের ভিত্তি রচনা করে এবং অতপর এ উম্মাত যখন সক্রিয় হয়ে একমাত্র তাওহীদী বিশ্বাসই পারস্পরিক সম্পর্কের যোগসূত্র নির্ধারণ করে, তখন তার প্রধান লক্ষ্য হয় মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগ্রত ও উন্নত করা, তাকে বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী করে তোলা এবং মনুষ্যত্বকে মানুষের অন্যান্য বৃত্তিনিচয়ের উপর প্রাধান্য বিস্তারের যোগ্য করে দেয়া। ইসলাম তার উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে চায়। কোন কোন দিক থেকে পশুর সাথে এমনকি জড় পদার্থের

সাথেও মানুষের সাদৃশ্য আছে। তাই জাহেলিয়াতের বৈজ্ঞানিকগণ মানুষকে জন্তু বা কোন কোন ক্ষেত্রে জড় পদার্থ বিবেচনা করার ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জন্তু-জানোয়ার ও জড় পদার্থের সাথে মানুষের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও তার এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলোর কারণে মানুষ সৃষ্টির সেরা হিসেবে গণ্য। জাহেলী বিজ্ঞানের ধারক-বাহকগণও নিরুপায় হয়ে এ বাস্তব সত্যটিকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। তবে তাদের এ স্বীকৃতি আন্তরিকও নয় এবং সুস্পষ্টও নয়।*

ইসলামী জীবন পদ্ধতির কল্যাণকারিতা অত্যন্ত বাস্তব ও অতুলনীয়। বর্ণ, ভাষা, দেশ, বৈষয়িক স্বার্থ, ভৌগলিক সীমারেখা ইত্যাদির দুর্বল বন্ধনকে ছিন্ন করে ইসলাম শুধু ঈমানকেই সমাজ ও পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি নির্ধারণ করেছে। মানুষ ও পশুর সদৃশ বিষয়গুলোর পরিবর্তে এ সমাজ শুধু মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ সাধন করে। সেগুলোকে মানব সমাজে প্রাধান্য দান করে। সমগ্র বিশ্বব্যাপী এ মহান কাজের সুফল প্রত্যক্ষ করছে। ইসলামী সমাজ একটি উন্মুক্ত ও উদার সমাজে পরিণত হয়। সকল বর্ণ, ভাষা ও অঞ্চলের লোকদের পক্ষেই এ সমাজের দ্বার চিরতরে উন্মুক্ত হয়ে যায়। ইসলামী সমাজের এ মহাসমুদ্রে বিভিন্ন ধরনের প্রতিভা ও গুণাবলীর নদ-নদীগুলো মিশে একাকার হয়ে যায়। এ মহামিলনের ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্বের বিস্ময় সৃষ্টিকারী এক সভ্যতা সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। সেকালে যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল থাকা সত্ত্বেও মানব সমাজের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা চিন্তা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান এ সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল।

ইসলামী সমাজের মহাসাগরে আরব, পারস্য, সিরিয়া, মিসর, মরক্কো, তুর্কী, চীন, ভারত, রোম, গ্রীস, ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের সকল জাতি ও গোত্রের লোকেরা সমবেত হয়েছিল। তাদের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য একসূত্রে গ্রথিত হয়ে যায় এবং তারা পারস্পরিক সহযোগিতা ও মেলামেশার মাধ্যমে ইসলামী উম্মাত ও ইসলামী সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজে অংশ গ্রহণ করে। এ মহিমাময় সভ্যতা একদিনের জন্যেও আরব সভ্যতা ছিল না বরং তা ছিল নির্ভেজাল ইসলামী সভ্যতা। আর ইসলামী সভ্যতা কখনও কোন জাতি সৃষ্টি করেনি বরং ঈমানের ভিত্তিতে একটি উম্মাত গঠন করেছিল।

প্রত্যেক দেশের সকল ভাষাভাষী লোক এ সভ্যতা গড়ে তোলার কাজে সমান অংশীদার ছিল। ভালবাসা ও নৈতিকতার বন্ধনে তারা পরস্পরের সাথে

* আধুনিক ডারউইনবাদের প্রবর্তক জুলিয়ান হাক্সলী এ সত্য স্বীকারকারীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাঁরা সকলে একই পথের পথিক ছিলেন। তাই বাঞ্ছিত সমাজ গড়ে তোলার জন্যে তাঁরা তাদের সকল যোগ্যতা নিয়োগ করেছিলেন। তাদের গোত্রীয় বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিগত ও জাতীয় গুণাবলী উজাড় করে দিয়ে তারা এ সমাজকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। কারণ, তারা ইসলামী সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেই সমান দায়িত্বশীল ছিলেন। তাদের সম্পর্কের ভিত্তি ছিল আল্লাহর সাথে গভীর ভালবাসা। আর তাই এ সমাজে বিনা বাধায় সকলের ব্যক্তিত্ব বিকাশ লাভ করে। সে যুগের লোকদের মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে, মানব জাতির ইতিহাসে তার কোন নযীর পাওয়া যায় না।

প্রাচীন ইতিহাসে রোমান সমাজই উত্তম সমাজ হিসেবে পরিচিত। এ সমাজেও বিভিন্ন গোত্র, ভাষা, বর্ণ ও স্বভাবের লোক একত্রিত হয়েছিল। কিন্তু মানবীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে তাদের ঐক্য সংগঠিত হয়নি। কোন উচ্চতর আদর্শ তাদের মধ্যে ঐক্যসূত্র রচনা করেনি। বরং শ্রেণীগত বিভাগই ছিল তাদের একতার ভিত্তি। সমগ্র সাম্রাজ্যটিতে একদিকে ছিল সম্ভ্রান্ত শ্রেণী ও অপরদিকে বিপুল সংখ্যক দাস। এ দু' শ্রেণীই সাম্রাজ্যটিকে দু'টো শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিল। তাছাড়া গোত্রীয় বৈশিষ্ট্যও বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিল। রোমীয় গোত্রের লোকেরা সর্বত্র নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং অন্যান্য গোত্রের সকল লোকই ছিল তাদের দাস। তাই এ সমাজ কখনো ইসলামী সমাজের মত উন্নত মর্যাদায় পৌছতে পারেনি এবং ইসলামী সমাজ মানবতাকে যেসব কল্যাণ দান করেছে তা দেয়ার সাধ্য এ সমাজের কোন দিনই হয়নি।

আধুনিককালেও বিভিন্ন সমাজ জন্ম লাভ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বৃটিশ সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এটা রোমান সাম্রাজ্যেরই উত্তরাধিকারী। জাতীয় স্বার্থের লোভই এ সাম্রাজ্যের ভিত্তি এবং বৃটিশ জাতি এর নেতা। সাম্রাজ্যের সকল উপনিবেশগুলোকে শোষণ করাই এদের লক্ষ্য। অন্যান্য ইউরোপীয় সাম্রাজ্যগুলোর বেলায়ও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। অতীতের স্পেনীয় ও পর্তুগীজ সাম্রাজ্য এবং বর্তমানের ফ্রান্স শোষণ ও নির্যাতনের ক্ষেত্রে একই পথ অবলম্বন করেছে।

কম্যুনিজম বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও ভৌগলিক জাতীয়তার প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে একটি নতুন সমাজ গঠন করার দাবী নিয়ে ময়দানে আসে। কিন্তু সে সমাজও মানবতার সম্পর্ক বাদ দিয়ে শ্রেণী বিভাগকে সমাজের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে। এদিক দিয়ে কমুনিষ্ট সমাজ প্রাচীন রোমান সমাজেরই অপর দিক। রোমান সমাজে সম্ভ্রান্তদের প্রাধান্য ছিল। কমুনিষ্ট সমাজে প্রলেটারিয়েটদের

প্রাধান্য। অপর শ্রেণীর প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করাই এ সমাজের মূলমন্ত্র। এ জাতীয় স্বার্থপর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ সমাজ মানুষের পশু প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। পশু প্রবৃত্তিকে উৎক্ষিপ্ত করে অধিকতর শক্তিশালী করাই এর কর্মসূচী। কম্যুনিজমের দৃষ্টিতে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পশুরই মত যথা—খাদ্য, বাসস্থান এবং যৌন ক্ষুধার পরিতৃপ্তি। তাই তাদের দৃষ্টিতে মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস খাদ্য সংগ্রহের ইতিহাস ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ইসলাম-ই একমাত্র আল্লাহর জীবন বিধান যা মানুষের মহান গুণাবলী ও সুকুমার বৃত্তিনিচয়কে জাগ্রত করে বিকাশ সাধনের মাধ্যমে একটি উচ্চমানের মানব সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। আজ পর্যন্ত ইসলামের এ বৈশিষ্ট্য একক ও নযীর বিহীন। যারা এ ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে জাতীয়তাবাদ, স্বদেশবাদ, বর্ণ, গোত্র, ভাষা বা শ্রেণীর ভিত্তিতে সমাজ গড়ার প্রয়াস পায় তারা প্রকৃতপক্ষে মানবতার দুশমন। তারা মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত গুণাবলীতে বিভূষিত করতে প্রস্তুত নয়। আর তারা এটাও চায় না যে, মানব সমাজ সকল বংশ ও গোত্রের সামগ্রিক গুণাবলী ও যোগ্যতা থেকে উপকৃত হোক এবং একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সম্মিলিত সমাজ গড়ে তুলে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করুক। এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً ط اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ○ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ○ ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا ○

"হে নবী ! আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেব না কোন্ কোন্ লোক নিজেদের আমলের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ? এরা হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক যারা ইহকালের জীবনে ভ্রান্ত পথে চলে এবং মনে করে যে, তারা ঠিক পথ ধরেই চলেছে। তারা তাদেরই রবের আয়াতগুলোকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর দরবারে প্রত্যাবর্তনের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করে। এ জন্যে তাদের সকল আমল নষ্ট হয়ে গেছে এবং কেয়ামতের দিন তাদের কোনই গুরুত্ব থাকবে না। তারা যে কুফুরী করেছিল আর আমার আয়াত ও রাসূলগণের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তার প্রতিদানে তারা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।"—আল কাহাফ ঃ ১০৩—১০৬

চতুর্থ অধ্যায়

আল্লাহর পথে জিহাদ

জিহাদের বিভিন্ন স্তর

ইমাম ইবনে কাইয়েম তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ জাদুল মায়াদে "নবুয়াতের সূচনা থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাফের ও মুনাফিকদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যবহার" শীর্ষক একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। ঐ অধ্যায়ে বিজ্ঞ লেখক জিহাদের প্রকৃতি সম্পর্কে লিখেছেন ঃ সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি যে ওহী নাযিল হয়েছিল তা ছিল—

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ

(পড়, তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে ----ইত্যাদি)।

এ ছিল নবুয়াতের সূচনা। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে নিজে নিজে উপরোক্ত আয়াতগুলো পড়ার হুকুম দিয়েছিলেন। কিন্তু তখনো ঐশীবাণী অপরের নিকট প্রচার করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ○ قُمْ فَاَنْذِرْ○

(হে কম্বলাবৃত ! উঠ এবং জনগণকে সতর্ক কর)।

এভাবে 'ইক্‌রা' আদেশের মাধ্যমে নবুয়াত ও "ইয়া আইউহাল মুদ্দাচ্ছির" সম্বোধনের দ্বারা রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তারপর তাঁকে নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করে দিতে বলা হয়। হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই সর্বপ্রথম নিজের নিকটাত্মীয়দের নিকট আল্লাহর বাণী পৌছান। তারপর তিনি প্রতিবেশীদের, আরও পরে সমগ্র আরববাসীদের এবং অবশেষে বিশ্বের মানব সমাজকে লক্ষ্য করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। এভাবে প্রায় তের বছর কাল পর্যন্ত তিনি তাবলীগের মাধ্যমে মানুষের মনে আল্লাহভীতি সৃষ্টির প্রায়াস পান। এ সময়ে তিনি কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেননি এবং কারো নিকট জিযিয়াও দাবী করেননি। বরং ঐ সময় হাত গুটিয়ে রাখা, ধৈর্য ধারণ করা এবং সহনশীলতার পথ অবলম্বন করার জন্যেই তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়। তারপর তিনি হিজরাতের আদেশ লাভ করেন। হিজরাতের পর সশস্ত্র সংগ্রামের অনুমতি দেয়া হয়। তারপর যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার এবং যারা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে তাদের উপর হস্তক্ষেপ না করার আদেশ অবতীর্ণ হয়। পরবর্তীকালে আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার আদেশ দেয়া হয়। ঐ সময় কাফেরদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। প্রথম শ্রেণীতে চুক্তিবদ্ধ দল, দ্বিতীয় শ্রেণীতে যুদ্ধরত দল এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল যিম্মিগণ।

যাদের সাথে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্বেই শান্তি-চুক্তি করেছিলেন, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত চুক্তি অনুযায়ী আচরণ করে ততক্ষণ মুসলমানদেরও চুক্তি পালন করতে বলা হয়। যদি কোন পক্ষ কর্তৃক চুক্তি লংঘনের সন্দেহ হয়, তাহলে আল্লাহর নবীকে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে চুক্তি বাতিল করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত অপর পক্ষকে চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা না জানানো হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে নিষেধ করা হয়। এতদসঙ্গে চুক্তি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যেও আদেশ নাযিল হয়।

সূরায়ে তাওবা-তে এ তিন ধরনের নির্দেশই দেয়া হয়েছিল। ঐ নির্দেশে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছিল যে, আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুশমনী করছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা যিজিয়া কর প্রদান করে অথবা ইসলামের জীবন বিধান কবুল করে নেয়। ঐ সূরাতেই কাফের ও মুনাফিকদের সাথে কঠোর জিহাদ করার আদেশ দেয়া হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুক্তি-প্রমাণ পেশ ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংগ্রাম করেন। ঐ সূরাতেই কাফেরদের সাথে পূর্ব সম্পাদিত সকল চুক্তি বাতিল ঘোষণা করার আদেশ দেয়া হয় এবং চুক্তিগুলোকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। প্রথম শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হয়। এ শ্রেণীর লোকেরা নিজেরাই চুক্তি ভংগ করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়ী হন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের সাথে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে তিনি শান্তি চুক্তিসম্পাদন করেন। তারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি এবং ইসলামের কোন দুশমনকে কোন প্রকারের সাহায্য দানও করেনি। আল্লাহ তাআলা এসব লোকদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বহাল রাখার হুকুম দেন। তৃতীয় শ্রেণীর লোকদের সাথে কোন চুক্তি করা হয়নি কিন্তু তারা কখনো আল্লাহর রাসূলের প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ করেনি। এছাড়া যাদের সাথে অনির্দিষ্টকালের জন্যে শান্তি চুক্তি করা হয়েছিল তাদেরও

ঐ শ্রেণীতে শামিল করা হয়। এ শ্রেণীর লোকদেরকে চার মাসের সময় দান করার এবং ঐ সময়ান্তে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ জারী করা হয়।

আল্লাহর নবী তাই চুক্তি ভঙ্গকারীদেরকে হত্যা করেন এবং যারা চুক্তি লংঘন করে নাই অথবা যাদের সাথে অনির্দিষ্টকালের জন্যে চুক্তি করা হয়েছিল তাদের চার মাস সময় দান করেন। আর চুক্তি পালনকারীদের সাথে নির্দিষ্ট সময় পূরণ না হওয়া পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক ব্যবহার করেন। ফলে সকল লোকই ইসলাম কবুল করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তারা কুফরী পরিত্যাগ করে। অমুসলিম বাসিন্দাগণ জিযিয়া কর প্রদান করে রাষ্ট্রের অনুগত হয়ে যায়। এভাবে সুরায়ে তাওবা নাযিল হবার পর কাফেরদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হতে দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীতে ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত শত্রুগণ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে চুক্তিবদ্ধ দল এবং তৃতীয় শ্রেণীতে যিম্মীগণ। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা অবশেষে ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে মাত্র দু'টো শ্রেণীই অবশিষ্ট রইল। তারা হলো যুদ্ধরত বিরোধী দল ও যিম্মি। বিরোধী মহল সর্বদা আল্লাহর নবীকে ভয় করতো। এখন সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। প্রথম শ্রেণীতে নবীর প্রতি ঈমান আনয়নকারী মুসলিমগণ দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত যিম্মীগণ এবং তৃতীয় শ্রেণীতে যুদ্ধরত কাফেরগণ। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবীকে মুনাফিকদের বাহ্যিক আনুগত্য মেনে নিয়ে তাদের অন্তরের কপটতাকে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেয়ার এবং যুক্তি ও আলোচনার মাধ্যমে তাদের সংশোধন প্রচেষ্টা জারী রাখার নির্দেশ প্রদান করেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে মুনাফিকদের জানাযার সালাত আদায় করতে, তাদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করতে অথবা তাদের অপরাধ ক্ষমা করার জন্যে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করতে নিষেধ করেন। বরং আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন যে, নবী মুনাফিকদের জন্যে ক্ষমার সুপারিশ করলেও তারা ক্ষমা লাভ করবে না। কাফের ও মুনাফিক দুশমনদের সম্পর্কে এটাই ছিল আল্লাহর নবীর গৃহীত নীতি।

উল্লেখিত আলোচনায় অত্যন্ত সংক্ষেপে ইসলামী জিহাদের সকল স্তর উত্তমরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। এ আলোচনায় দ্বীনি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ও সুদূর প্রসারী ফলাফলের আভাস পাওয়া যায়। বিষয়টি গভীর মনোযোগ সহকারে পর্যালোচনার দাবী রাখে। এখানে আমরা কয়েকটি বিষয়ে ইঙ্গিত করছি মাত্র।

জিহাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য ঃ দ্বীনে হকের প্রথম বৈশিষ্ট্যময় সৌন্দর্য এই যে, এ একটি বাস্তবমুখী জীবন বিধান। এ দ্বীনের আন্দোলন মানুষকে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থায়ই নিজের দিকে টেনে নেয় এবং অবস্থার সাথে যেসব

উপায়-উপকরণ সামঞ্জস্যশীল তাই আন্দোলনের কাজে ব্যবহার করে। ইসলামী আন্দোলনের সূচনাতেই বাতিল সমাজের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রচলিত সমাজের চিন্তাধারা ও আকীদা-বিশ্বাস জাহেলিয়াতেরই প্রভাবাধীন থাকে। জাহেলিয়াতের ভিত্তিতেই ঐ সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো গড়ে উঠে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতায় জাহেলিয়াত সমাজের উপর সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। কাজেই ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার জন্যে জাহেলিয়াতের প্রতিষ্ঠিত শক্তির তুলনায় সমপরিমাণ উপায়-উপকরণ অপরিহার্য। তাই ইসলাম তাবলীগ ও প্রচারের মাধ্যমে চিন্তাধারা ও আকীদা-বিশ্বাসের সংশোধন করে। প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্যে পার্থিব শক্তি ব্যবহার করার মাধ্যমে জিহাদ পরিচালনা করে। কারণ, ঐ জাহেলিয়াত পরিচালিত সমাজ আকীদা ও চিন্তার বিশুদ্ধকরণ কাজে বাধা প্রদান করে। পার্থিব উপকরণ ও বিভ্রান্তিকর কর্মসূচী অবলম্বন করে মানুষকে জাহিলী সমাজের প্রতি অনুগত থাকার জন্যে বাধ্য করে। আর এর ফলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর পরিবর্তে মানুষেরই নিকট মাথা নত করে বাস করা ছাড়া সমাজের আর কোনই উপায় থাকে না। তাই ইসলামী আন্দোলন পার্থিব শক্তিপুষ্ট জাহেলিয়াতের মূলোচ্ছেদ করার অভিযানে শুধুমাত্র দাওয়াত ও তাবলীগকেই যথেষ্ট বিবেচনা করতে পারে না। আবার জোর জবরদস্তি করে মানুষের আকীদা-বিশ্বাস পরিবর্তন করা ইসলামী আদর্শের নীতি নয়। এ দ্বীনের আন্দোলন পরিচালনায় উপরোক্ত উভয় পদ্ধতিই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং উভয় পন্থাই সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। কারণ, মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর বন্দেগীতে নিয়োগ করাই আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

জিহাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ঃ ইসলামের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এটা একটা বাস্তবমুখী আন্দোলন। এ আন্দোলন ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় এবং প্রত্যেকটি ধাপে তার চাহিদা মুতাবিক উপকরণ সংগ্রহ করে নেয় ও পরবর্তী ধাপের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। বাস্তব সমস্যাবলীকে নিছক উত্তম নীতিমালার সাহায্যে প্রতিরোধ করার কোন অবাস্তব ব্যবস্থা এ দ্বীনে নেই এবং এ আদর্শ আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধানের কিছু অপরিবর্তনীয় ছককাটা পন্থার উপরও নির্ভর করে না। যারা ইসলামী জিহাদের আলোচনা করেন এবং জিহাদের সমর্থনে কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে থাকেন, তারা এ বিষয়টির প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন না। বরং তাঁরা ইসলামী আন্দোলনকে যেসব স্তর অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হয়, সে স্তরগুলোও বুঝে উঠতে পারেন না। অতি স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলনের কোন্ স্তরে কোন্ কুরআনী আয়াত কি তাৎপর্য নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল, তা-ও উপলব্ধি করতে পারেন না। তাই তারা

অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে জিহাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরগুলোর জগাখিচুড়ি বানিয়ে জিহাদের আসল রূপটিকে বিকৃত করে ফেলেন এবং বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতগুলো থেকে কতক সাধারণ নীতিমালা আবিষ্কার করেন। অথচ ঐ আয়াতগুলোতে নিজেদের খাহেশ মুতাবিক নীতিমালা আবিষ্কারের কোনই অবকাশ নেই। তাঁরা কুরআনের প্রতিটি আয়াতকেই দ্বীনের শেষ সীমা বিবেচনা করেন। এ শ্রেণীর চিন্তা যারা করেন তারা বর্তমানে নাম সর্বস্ব মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ করে নৈরাশ্যব্যঞ্জক পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পরাজিত মনোভাবেরই ফলশ্রুতি স্বরূপ উল্লেখিত ভূমিকা গ্রহণ করেন। ।

পরাজিত মনোবৃত্তির বশবর্তী হয়েই তারা বলেন—"ইসলাম শুধু আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দান করে।" চরম দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁরা জিহাদের উপরোক্ত ব্যাখ্যা দিয়ে দ্বীনের মহাকল্যাণ সাধন করেছেন বলে বিশ্বাস করেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, জিহাদের অপব্যাখ্যা করে তাঁরা দ্বীনের বৈশিষ্ট্যই পরিত্যাগ করছেন। দ্বীনকে তার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করাই এ ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য। এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করার পর ইসলাম তাগুতী শক্তির ক্ষমতা মিটিয়ে দিয়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা এবং মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে লা-শরীক আল্লাহর বন্দেগীতে নিয়োজিত করার লক্ষ্য হারিয়ে ফেলে। অবশ্য ইসলাম জোর-জবরদস্তি করে আকীদা-বিশ্বাস পরিবর্তন করতে বলে না। বরং সে মানুষকে স্বাধীনভাবে জীবন-পথ নির্বাচনের সুযোগ দান করে। এবং প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শক্তির অত্যাচার থেকে জনগণকে মুক্ত করার জন্যে ঐ শাসন ক্ষমতার উচ্ছেদ সাধন করে। তারপরও তাকে জিযিয়া কর দান করে ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত বাসিন্দা হয়ে বাস করার সুযোগ দান করে। এর ফলে স্বাধীনভাবে ইসলামী মতবাদ গ্রহণের পথে বলপূর্বক বাধাদানকারী সকল শক্তি অপসারিত হয়। এবং জনগণ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করা বা না করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ লাভ করে।

জিহাদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ঃ এ দ্বীনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে ক্রম অগ্রসরমান দ্বীনি আন্দোলন কোন অবস্থায়ই তার মূল লক্ষ্য থেকে চুল পরিমাণও বিচ্যুত হয় না। আল্লাহর নবী (সা) আন্দোলনের প্রথম দিন থেকেই যখন যে স্তরে আত্মীয়-স্বজন, কুরাইশ বংশ অথবা সারা বিশ্ববাসীকে সম্বোধন করে আহবান করেছেন তখন মূল লক্ষ্যের দিকেই তাদেরকে ডেকেছেন। সকল অবস্থায় তিনি একই বাণী প্রচার করেছেন। অর্থাৎ তিনি সকলকেই এক আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার ও প্রভুত্বের অপরাপর মিথ্যা দাবীদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার আহবান জানান। এ

বিষয়ে কোন আপোষ বা নমনীয়তার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে একটি পরিকল্পনা মুতাবিক আন্দোলন অগ্রসর হয় এবং তা বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে এগিয়ে যায়। প্রতিটি স্তরেই প্রয়োজন মুতাবিক উপায়-উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। একথা আমরা উপরেই উল্লেখ করেছি।

জিহাদের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য ঃ চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, ইসলাম মুসলিম উম্মাতের সাথে অন্যান্য অমুসলিমদের সম্পর্ক রক্ষার বিষয়ে স্থায়ী বিধান দান করেছে।

উপরের জাদুল মায়াদ গ্রন্থের উদ্ধৃতি থেকেই তা জানা গেছে। এ বিধানের মূলকথা হলো এই যে, ইসলাম (আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য মেনে নেয়া) একটি সার্বিক মহাসত্য এবং তা গ্রহণ করা অপরিহার্য ও সমগ্র মানব সমাজের জন্যে বাধ্যতামূলক। যারা ইসলাম গ্রহণে অপারগ বা অনিচ্ছুক তাদের কর্তব্য হচ্ছে ইসলামের সাথে আপোষমূলক মনোভাব গ্রহণ করা এবং ইসলামের বাণী প্রচার ও তার সম্প্রসারণের পথে রাজনৈতিক বা অন্য কোন শক্তির সাহায্য নিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা। প্রতিটি মানুষের জন্যে চাপমুক্ত পরিবেশে ইসলাম গ্রহণ করা বা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুকূল পরিবেশ দরকার। যদি ইসলাম গ্রহণ করতে কেহ আগ্রহান্বিত হয় তাহলে ইসলাম বিরোধী মহল সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ অথবা তাকে ইসলাম গ্রহণে কোন প্রকার বাধা প্রদান করবে না। যদি কেহ বাধা প্রদান করে তাহলে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা ইসলামের কর্তব্য এবং বাধা প্রদানকারীর মৃত্যুবরণ অথবা বশ্যতা স্বীকার না করা পর্যন্ত এ লড়াই বিরামহীন গতিতে চলবে।

দুর্বল ও পরাজিত মনোভাবাপন্ন লেখকগণ ইসলামী জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে যখন তাদের দৃষ্টিভংগী অনুসারে ইসলামের দেহ থেকে জিহাদের 'কলঙ্ক' মোচনের প্রয়াস পান, তখন তারা দু'টো বিষয়কে অযথা মিশ্রিত করে ফেলেন। প্রথম বিষয়টি হচ্ছে জোরজবরদস্তি ইসলাম গ্রহণ করতে কোন মানুষকে বাধ্য না করা। পবিত্র কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা, لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ (দ্বীন গ্রহণে কোন জবরদস্তি নেই) ঘোষণার ভিতর দিয়ে স্পষ্ট ভাষায়ই এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ইসলাম ঐ সকল রাজনৈতিক ও পার্থিব শক্তির মূলোচ্ছেদ করার নির্দেশ দেয়, যেসব শক্তি মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায় এবং আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণে মানুষকে বাধা প্রদান করে নিজেদের গোলাম বানিয়ে নেয়। এ দু'টো মূলনীতি সম্পূর্ণ পৃথক।

তাদের মধ্যে কোথাও গোঁজামিল নেই অথবা একে অপরের বিরোধীও নয়। কিন্তু দুর্বল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ পরাজয় বরণকারী পরাভূত চিন্তাধারার দরুন এ উভয় বিষয়কে মিশ্রিত করে ইসলামী জিহাদকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করতে চায়। অথচ ইসলামী জিহাদ হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লড়াই। আধুনিক যুগে প্রচলিত যুদ্ধ-বিগ্রহের সাথে তার কোন সামঞ্জস্য নেই। যুদ্ধের শর্তাবলী অথবা বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতি কোন ক্ষেত্রেই ইসলামী জিহাদের সাথে বর্তমানকালের যুদ্ধের তুলনাই হতে পারে না। ইসলামী জীবন বিধানের প্রকৃতি, দুনিয়ায় তার ভূমিকা, আল্লাহ তাআলা এ দ্বীনের যেসব মহান লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন এবং যে লক্ষ্য অর্জনের জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করে তাঁকে সকল রাসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন ; সেগুলোর ভিতরই ইসলামী জিহাদের শর্তাবলী খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী ঘোষণা

দীনে হক একটি বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী ঘোষণা। মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে এমনকি নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকেও মুক্তি দানই এ ঘোষণার সারকথা। আল্লাহ তাআলার একক সার্বভৌমত্ব ঘোষণার অনিবার্য পরিণতিই হচ্ছে এই যে, সকল মানুষই তাঁর করুণা লাভ করার সমান অংশীদার। তাই মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব যে আকার ও যে ধরনেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ বিদ্রোহ ঘোষণারই নাম ইসলাম। মানুষের উপর মানুষের শাসন ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর শক্তিরই দাবী। অর্থাৎ যে সমাজ ব্যবস্থায় সকল বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসাকারী কর্তৃত্ব মানুষেরই হাতে, যেখানে মানুষই মানুষের জন্যে চূড়ান্তভাবে আদেশ-নিষেধ জারি করার ক্ষমতা ভোগ করবে, সে সমাজে কিছু সংখ্যক লোক অবৈধভাবে আল্লাহর ক্ষমতাই দাবী করে থাকে। যারা তাদের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয় তারা কুরআনের পরিভাষায় اربابا من دون الله। (আল্লাহ ছাড়া অপরাপর রব) গ্রহণ করে থাকে। তাহলে একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব ঘোষণার অর্থ দাঁড়ায়, যারা অবৈধভাবে আল্লাহর শক্তি ভোগ করছে তাদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে পুনরায় আল্লাহরই হাতে অর্পণ করা এবং যারা মনগড়া আইন-বিধান রচনা করে মানুষের উপর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে তাদের উচ্ছেদ সাধন। কারণ তারা নিজেদেরকে খোদার আসনে বসিয়ে মানব সমাজকে তাদের দাসে পরিণত করেছিল। মোদ্দাকথা আল্লাহ তাআলার প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করার অর্থই হচ্ছে মানুষের উপর মানুষের সকল

প্রকার শাসনাধিকার ও শাসন ক্ষমতার অবসান ঘটিয়ে সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক প্রভুর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّ فِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ ط

"তিনি আসমানেও ইলাহ এবং যমীনেও ইলাহ।"—যুখরুফ ঃ ৮৪

اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ ط اَمَرَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلاَّ اِيَّاهُ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ

"হুকুম ও শাসন করার অধিকার শুধু তাঁরই। তার নির্দেশ এই যে, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কারো দাসত্ব করা চলবে না। এটাই হচ্ছে মযবুত জীবন বিধান।"—ইউসুফ ঃ ৪০

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

"(হে নবী) আপনি বলুন, হে আহলে কিতাবগণ ! এস আমরা এবং তোমরা একটি সাধারণ নীতিতে একমত হই। তাহলো এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো দাসত্ব করবো না। তাঁর সাথে কোন অংশীদার থাকার কথা বিশ্বাস করবো না এবং আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে আমরা অন্য কোন শক্তিকেই রব হিসেবে গ্রহণ করবো না। যারা একথা মেনে নিতে অস্বীকার করে তাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করুন, সাক্ষী থাক আমরা আল্লাহতে আত্মসমর্পণ করেছি।"—আলে ইমরান ঃ ৬৪

আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠার উপায়

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার অর্থ গীর্জার শাসন ব্যবস্থার মত কিছু সংখ্যক স্বনির্বাচিত 'পবিত্র' ব্যক্তিদের শাসন অথবা পৌরহিত্যবাদের মত আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধিত্বের দাবিদার মুষ্টিমেয় লোকের মনগড়া শাসন ব্যবস্থা নয়। আল্লাহ তাআলার শাসন প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহর আইনের প্রাধান্য স্বীকৃতি লাভ করবে এবং সকল বিষয়ের চূড়ান্ত ফায়সালার জন্যে আল্লাহর দেয়া বিধানকেই চূড়ান্ত বিবেচনা করতে হবে। একথা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, মানুষের বাদশাহী উচ্ছেদ করা, যালেমদের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহর হাতে

অর্পণ এবং মানব রচিত আইন বাতিল করে আল্লাহ প্রদত্ত আইন প্রবর্তন নিছক তাবলীগ ও প্রচারের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে না। যারা মানুষের উপর খোদায়ী কর্তৃত্ব কায়েম করে রেখেছে তারা নিছক প্রচার ও তাবলীগে অভিভূত হয়ে ক্ষমতা পরিত্যাগ করবে না। যদি তা-ই হতো, তাহলে তো আল্লাহর নবীগণের জন্যে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ খুবই সহজ হতো। কিন্তু নবীগণের কাহিনী ও বহু শতাব্দী ব্যাপী দ্বীনে হকের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, কোন নবীর পক্ষেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ সহজসাধ্য হয়নি।

বিশ্ব-জগতের মালিক আল্লাহ তাআলাই সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী, এ বিপ্লবী বাণী প্রচারের সাথে সাথে আল্লাহ ছাড়া প্রভুত্বের অপরাপর দাবীদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা নিছক একটি মতবাদ, দার্শনিক তত্ত্ব বা নেতিবাচক একটি বাক্য উচ্চারণ মাত্র নয়। বরং ঐরূপ ঘোষণার লক্ষ্য হচ্ছে, মানুষের উপর শরীয়াতে এলাহীর শাসন প্রবর্তন এবং শক্তি প্রয়োগ করে মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে উদ্ধার করে লা-শারীক আল্লাহর দাসত্ব গন্ডীর ভিতরে আনয়ন। সহজেই বুঝা যাবে যে, এত বড় বিপ্লবী পরিবর্তনের জন্যে দাওয়াত ও তাবলীগের সাথে সাথে আন্দোলন শুরু করা এবং অগ্রসরমান আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে বাধা প্রদানকারী বাতিল শক্তির মুকাবিলা করা অত্যন্ত জরুরী।

ইসলাম আল্লাহ ছাড়া অপর সকল শক্তির অধীনতা থেকে মানুষের মুক্তি ঘোষণা করে। তাই মানব ইতিহাসের প্রতিটি স্তরেই ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও মতবাদ, পাশবিক শক্তি, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও গোত্রীয় ব্যবস্থা তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। অতীতে এরূপ হয়েছে। বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে না। এছাড়া ভ্রান্ত আকীদা মিশ্রিত ঈমান ও কুসংস্কারাদি মানুষের অন্তরে আসন প্রতিষ্ঠা লাভ করার ফলেও উপরোক্ত প্রতিবন্ধকগুলো আরও শক্তিশালী হয়।

তাব্লীগ ও প্রচার মানুষের চিন্তা ও আকীদা-বিশ্বাসের পরিশুদ্ধি করে থাকে এবং আন্দোলন পার্থিব প্রতিবন্ধকগুলোকে অপসারণ করে। এসব পার্থিব প্রতিবন্ধকতার শীর্ষে রয়েছে রাজনৈতিক শক্তি। এ শক্তি আকীদা-বিশ্বাস, বংশ ও শ্রেণীবিভেদ, সমষ্টিগত ও অর্থনৈতিক রীতিনীতির সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। এভাবে তাবলীগ ও আন্দোলন মিলিতভাবে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার উপরে চারদিক থেকে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং নতুন জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহায্য করে। ধরাপৃষ্ঠে বসবাসকারী মানব সমাজকে সত্যিকার স্বাধীন জীবনযাপন করতে হলে এ উভয় পন্থাই গ্রহণ করতে হবে, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বন্দেগীর তাৎপর্য

ইসলাম শুধু আরবের জন্যেই মুক্তির পয়গাম নিয়ে আসেনি। এ দ্বীনের লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র মানবগোষ্ঠী এবং তার কর্মক্ষেত্র হচ্ছে সমগ্র দুনিয়া। আল্লাহ শুধু আরবদের অথবা ইসলামে বিশ্বাসকারীদেরই প্রতিপালক নন। বরং তিনি সমগ্র বিশ্বেরই প্রতিপালক ও সংরক্ষক। তিনি সারা জগতকে সকল প্রকারের মানবীয় দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে তার সংরক্ষণ গন্ডীর আওতায় ফিরিয়ে আনতে চান। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব রচিত আইন-বিধান নিজেদের উপর চাপিয়ে নেয়াই প্রকৃতপক্ষে দাসত্ব বা ইবাদাত। ইসলাম তাই ঘোষণা করে যে, ইবাদাত বা দাসত্ব শুধু আল্লাহরই জন্যে নির্দিষ্ট। যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত বা দাসত্ব স্বীকার করে নেয়—সে নিজেকে যতই ধার্মিক বিবেচনা করুক না কেন প্রকৃতপক্ষে সে দ্বীনের সীমারেখার বাইরে অবস্থান করছে। আল্লাহর রাসূল (সা) পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, প্রচলিত আইন-কানুন ও শাসন ব্যবস্থার আনুগত্য ইবাদাতেরই অপর নাম। ইবাদাতের এ অর্থ থেকে যখন ইয়াহুদী ও খৃস্টানগণ নিজেদের দূরে সরিয়ে নেয় তখন থেকেই তাদেরকে মুশরিক হিসেবে গণ্য করা হয়।

ইমাম তিরমিযী আদী বিন হাতেম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর নিকট (আদী বিন হাতেম) রাসূল (সা)-এর বাণী পৌঁছার পর তিনি সিরিয়ায় পালিয়ে যান। কারণ জাহেলিয়াতের যুগেই তিনি খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ভগ্নী এবং ঐ বংশের আরও কতিপয় ব্যক্তি গ্রেফতার হন। নবী তাঁর ভগ্নীর প্রতি সদয় ব্যবহার করেন, বিনা মুক্তিপণেই ছেড়ে দেন এবং কিছু উপঢৌকনসহ স্বগোত্রীয়দের নিকট যাবার অনুমতি দেন। ঐ মহিলা তাঁর ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে উৎসাহিত করে আল্লাহর নবীর সাথে সাক্ষাত করার পরামর্শ দেন। আদী এ প্রস্তাবে সম্মত হন এবং মদীনাবাসী তাঁর প্রত্যাবর্তনের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। তিনি যখন নবীর সাথে সাক্ষাত করতে আসেন তখন তাঁর গলায় রৌপ্য নির্মিত ক্রুশ ঝুলছিল। নবী তখন নিম্নের আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন ঃ

اتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -التوبة :٣١

"তারা তাদের পীর-পুরোহিত ও ধর্মীয় নেতাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে 'রব' বানিয়ে নিয়েছে।"—তাওবা ঃ ৩১

আদী বলেন, "আমি নবী (সা)-এর খেদমতে আরয করলাম, তারা ধর্ম নেতাদের ইবাদাত করে না।" হুজুর জবাবে বললেন, "ধর্ম নেতাগণ যে বিষয়কে হালাল ঘোষণা করেছে, তারা সেগুলোকে হালাল মেনে নিয়েছে।

অনুরূপভাবে ধর্ম নেতাগণ যেসব বিষয়কে হারাম সাব্যস্ত করেছে, সেগুলো তারা হারাম ধরে নিয়েছে। এভাবেই তারা নিজেদের ধর্মীয় নেতাদের ইবাদাত করে থাকে।"

উপরোদ্ধৃত কুরআনী আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে রাসূলুল্লাহ (সা) যা যা বললেন তা শরীয়াতের সুস্পষ্ট ও অলংঘনীয় রূপ। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো আইন-কানুন মেনে নেয়া এক প্রকার ইবাদাত। আর এরূপ ইবাদাতে যে ব্যক্তি লিপ্ত হয় সে ইসলাম থেকে বহির্গত হয়ে যায়। এ হাদীস থেকে একথাও জানা গেল যে, কিছু সংখ্যক মানুষ অপর এক বা একাধিক মানুষের 'খোদার পরিবর্তে রব' বানিয়ে নিলে সেটাও ইবাদাত হিসেবেই গণ্য হয়। এ জাতীয় অবৈধ দাসত্ব ও আনুগত্য মিটিয়ে দেয়ার জন্যেই দ্বীনে হক নাযিল হয়েছে। আর এই দ্বীনই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহর যমীনে বসবাসকারী মানুষকে আল্লাহ ব্যতীত অপরের দাসত্ব থেকে মুক্ত জীবন যাপন করতে হবে।

যদি মানুষের ব্যবহারিক জীবনে উপরোক্ত ঘোষণার বিপরীত অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়, তাহলে প্রচার ও আন্দোলন উভয় অস্ত্র হাতে নিয়ে ইসলামী আদর্শ কার্যক্ষেত্রে নেমে আসতে বাধ্য।

মানুষের উপর অন্যায় প্রভুত্ব স্থাপনাভিলাষী ও আল্লাহর শরীয়াত থেকে সম্পূর্ণ বেপরোয়া হয়ে শাসন প্রবর্তনকারী রাজনৈতিক শক্তির উপরে আঘাত হানাই হবে ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য। কারণ এ রাজনৈতিক শক্তি মানুষের নিকট ইসলামের বাণী পৌঁছানোর কাজে বাধা সৃষ্টি করে। সমাজের যেসব লোক ইসলামী আদর্শ মুতাবিক জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক তারা রাজনৈতিক শক্তির বাধা সৃষ্টির ফলে মতামত পোষণের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই ইসলাম তাবলীগ ও আন্দোলনের মাধ্যমে প্রভুত্ব স্থাপনাভিলাষী শক্তির উচ্ছেদ সাধন করে। সে শক্তি রাজনৈতিক হোক অথবা বংশ, গোত্র ও শ্রেণী বৈষম্যের ধ্বজাধারী হোক, তার উচ্ছেদ সাধন ব্যতীত মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জিত হতে পারে না। ইসলাম তাই ঐ বাতিল শক্তির মূলোৎপাটনের পর এক নয়া সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে মানব সমাজের সত্যিকার স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করে এবং স্বাধীন জীবন যাত্রার ক্রমোন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে দেয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের স্বাধীনতা

বলপূর্বক মানুষের মন-মগযে আকীদা-বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেয়া ইসলামের লক্ষ্য নয়। কিন্তু এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে, একটি বিশেষ ধরনের নিছক

আকীদা-বিশ্বাসই ইসলাম নয়। একথা আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি যে, মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার বিপ্লবী ঘোষণাই ইসলাম। ইসলামের বাণী প্রচারের সূচনাতেই একথা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হয় যে, ইসলাম মানুষের উপর প্রভুত্ব স্থাপনকারী সকল সরকার ও প্রতিষ্ঠানের মূলোৎপাটন করতে ইচ্ছুক। রাজনৈতিক গোলামী থেকে মানব সমাজকে উদ্ধার করার পর ইসলাম মানুষের মন ও মগযকে বাতিল শক্তির কলুষিত প্রভাব থেকে বিশুদ্ধিকরণের প্রচেষ্টা চালায়। এ কাজ সম্পন্ন হলে তার মুক্ত জ্ঞান বিবেককে ইসলাম গ্রহণ করা বা না করার পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে। কিন্তু এ স্বাধীনতার অর্থ এটাও নয় যে, মানুষ নিজেই তার স্বার্থপর মনোবৃত্তির অথবা অন্য কোন মানুষের দাসত্ব স্বীকার করে নেবে কিংবা মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব স্থাপনকারী ব্যবস্থা বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

পৃথিবীর যেখানে যখন কোন শাসন ব্যবস্থা কায়েম হবে, তখনই তাকে আল্লাহ তাআলার দাসত্ব স্বীকার করে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এবং আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্বই জীবন বিধানের উৎস হিসেবে স্বীকৃত হতে হবে। এ আদর্শভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার অধীনেই মানুষের ব্যক্তিগত আকীদা-বিশ্বাসের স্বধীনতা থাকবে। দ্বীন, বন্দেগী ও আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করার এটাই একমাত্র পথ। দ্বীন শব্দের অর্থ আকীদা-বিশ্বাসের চাইতে অনেক বেশী ব্যাপক। মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে একটি বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে সোপর্দ করার নামই দ্বীন এবং ইসলামী দ্বীন ঈমান বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে রচিত। কিন্তু দ্বীনের পরিসীমা আকীদা-বিশ্বাসের চাইতেও অধিক সম্প্রসারিত। তাই ইসলামী শাসন ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার পর ব্যক্তি জীবনে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ না করেও ঐ সমাজে বসবাস করার সুযোগ রয়েছে।

নিছক আত্মরক্ষার নাম জিহাদ নয়

উপরে আমরা দ্বীনের লক্ষ্য সম্পর্কে যা অবগত হয়েছি তা থেকে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় যে, ইসলামী জিহাদ উভয় প্রকারেই শুরু হওয়া অপরিহার্য। অর্থাৎ জিহাদ বিস সাইফ (অস্ত্রের জিহাদ) ও জিহাদ বিল কওল (প্রচারের জিহাদ)। উভয় ধরনের জিহাদ ব্যতীত দ্বীনের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। আমরা একথাও বুঝতে পেরেছি যে, বর্তমান যুগের সীমিত পরিভাষায় আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ বলতে যা বুঝায়, ইসলামী জিহাদ ঠিক তা নয়। অবস্থার চাপে এবং পাশ্চাত্য লেখকগণের চাতুরিপূর্ণ আক্রমণের যথাযোগ্য উত্তর দানে অক্ষম এক শ্রেণীর দুর্বল মনা লোকই ইসলামী জিহাদকে ঐ সংকীর্ণ গন্ডিতে

আবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। ইসলাম একটি প্রাণবন্ত বিপ্লব। মানুষকে সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ্ করানোই এর লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইসলাম মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে সংস্কার-অভিযান পরিচালনা করে এবং সমাজে বিদ্যমান সকল উপায় উপকরণ নিয়োগ করে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকে। আর প্রতিটি ধাপে প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ব্যবহার করে পরবর্তী স্তরে পৌছুবার পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

যদি ইসলামী জিহাদকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অর্থে ব্যবহার করা হয়, তাহলে আত্মরক্ষার প্রচলিত অর্থ পরিবর্তন করতে হবে এবং জিহাদ শব্দ দ্বারা স্বধীনতা হরণকারী শক্তির যুলুম থেকে মানবতার আত্মরক্ষা বুঝতে হবে। এসব যালিম শক্তি ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস এবং অর্থনৈতিক, গোত্রীয় ও শ্রেণী বৈষম্যের রূপ ধারণ করে মানব সামাজের স্বাধীনতা হরণের প্রয়াস পায়। দুনিয়াতে ইসলামী আদর্শের আগমনের সময় ঐসব ভ্রান্ত পথগামীদের প্রাধান্য ছিল এবং আধুনিক যুগের জাহেলিয়াতও ঐ ধরনের ভ্রান্ত মত ও পথ সৃষ্টি করে রেখেছে।

আত্মরক্ষার এ ব্যাপক অর্থ গ্রহণের পর আমরা ইসলামের সঠিক রূপ অনুধাবন করতে সক্ষম হই। ইসলামী জিহাদ বা আত্মরক্ষার মোটামুটি অর্থ দাঁড়ায় নিম্নরূপ ঃ

"মানুষের গোলামী থেকে মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা। সমগ্র বিশ্বে আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, স্বার্থপর ও অত্যাচারী মানুষের কর্তৃত্ব উচ্ছেদ এবং মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহর বিধান প্রবর্তন।"

একদল লোক ইসলামী জিহাদকে নিছক আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ প্রমাণ করার জন্য নানাবিধ যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে এবং তারা তাদের যুক্তির স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করার উদ্দেশ্যে রাতদিন গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা খুঁজে খুঁজে এমন সব ঐতিহাসিক ঘটনা ও বিবরণ বের করে, যাতে করে তার দ্বারা ইসলামী জিহাদকে 'ইসলামী দেশ রক্ষা'র সংগ্রাম প্রমাণ করা যায়। এ শ্রেণীর লোকদের কেহ কেহ আবার শুধু আরব উপদ্বীপকেই ইসলামী দেশ বিবেচনা করে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শত্রুদল কর্তৃক আরব ভূমি আক্রান্ত হবার দরুনই সেকালে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল বলে তারা দাবী করে।

ইসলামের প্রতি অনুগ্রহভাজন এসব ব্যক্তিগণ হয় বিশ্বসমস্যার সমাধানে ইসলামের ভূমিকা বুঝতেই পারেননি অথবা তারা প্রতিকূল পরিবেশ ও পাশ্চাত্য লেখকদের চাতুরীপূর্ণ আক্রমণের প্রভাবে দুর্বল ভূমিকা গ্রহণ করেছেন মাত্র।

একথা কে দাবী করে বলতে পারে যে, হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা) রোম ও পারস্য থেকে আক্রান্ত না হওয়ার নিশ্চয়তা লাভ করলে ইসলামী আন্দোলনের বিস্তার রোধ করে দিতেন ? এ প্রশ্নের জবাবে শুধু 'না'-ই বলতে হবে, কেননা জিহাদ ব্যতিরেকে ইসলামের প্রসার কিছুতেই সম্ভব ছিল না। বহু ধরনের বাধা-বিপত্তি এ আন্দোলনের পথে প্রাচীরস্বরূপ দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে রাজনৈতিক শক্তি, বংশ ও শ্রেণীগত বৈষম্য। এ বৈষম্যের দৃষ্টিভংগী থেকে রচিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং এসবের পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ইত্যাদি সবকিছুই ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী ছিল।

একটি বিপ্লবী বাণী উচ্চারণ করে সমগ্র বিশ্বের মানবজাতিকে স্বাধীনতা দানের ঘোষণা করার পর উপরোক্ত বাধা-প্রতিবন্ধকতার মুখে নিছক মৌখিক প্রচারের মাধ্যমে এগিয়ে যাবার ধারণা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নয়। অবশ্য ইসলামী আন্দোলন মৌখিক প্রচারের সাহায্যও নিয়ে থাকে। কিন্তু কখন ? যখন মানুষ কোন মতবাদ গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। মানুষকে সকল প্রকার চাপ ও বন্ধন থেকে মুক্ত করার পরই ইসলাম 'ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি নেই' নীতি মুতাবিক নিছক প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে প্রসার লাভ করে।

ইসলামী জীবন বিধানের আহবান মানব জাতির পূর্ণ স্বাধীনতার বিপ্লবী ঘোষণা। স্বাভাবিকভাবেই এ ঘোষণার পর শুধু দার্শনিক আলোচনা ও দ্বীনের সৌন্দর্য বর্ণনা দ্বারা বাঞ্ছিত স্বাধীনতা অর্জিত হবে না। বরং বিরুদ্ধ পরিবেশের সাথে কার্যত সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হবে এবং ক্রম অগ্রসরমান আন্দোলন প্রতিটি স্তরে যেসব বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয় সেগুলো দূর করার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল উপায়-উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। এ ধরনের আন্দোলনই হচ্ছে জিহাদ। ইসলামী জীবন বিধানের আবাস ভূমিকে ইসলামী পরিভাষায় দারুল ইসলাম বলা হয়। এ দারুল ইসলাম শান্তিপূর্ণ অবস্থায় থাকুক অথবা প্রতিবেশী শত্রুদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় থাকুক, এতে জিহাদের দায়িত্ব হ্রাস-বৃদ্ধি পায় না। শান্তি স্থাপনই ইসলামের লক্ষ্য কিন্তু শুধু দারুল ইসলামের সীমিত ভূখন্ডে শান্তি-শৃঙ্খলা বহাল করে পরিতৃপ্ত থাকা এবং এ আংশিক শান্তি স্থাপন ইসলামের কাম্য নয়। ইসলাম যে শান্তি চায় তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহর যমীনে সর্বত্র আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, সকল মানুষ একমাত্র আল্লাহ তাআলারই দাসত্ব করবে এবং মানুষের উপর থেকে মানুষের সকল প্রকার কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব সম্পূর্ণরূপে মিটে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরবর্তী যুগে জিহাদের এ সর্বশেষ স্তরটিকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে হবে।

প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী স্তরগুলো প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন হবে না। কারণ ঐ স্তরগুলো উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ইমাম ইবনে কাইয়েম বলেন ঃ সূরায়ে তাওবা নাযিলের পর নবী করীম (সা) কাফেরদের সাথে তিন ধরনের ব্যবহার করেছেন। ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত কাফেরগণ ছিল প্রকাশ্য দুশমন। দ্বিতীয় দলে ছিল চুক্তিবদ্ধ কাফের গোষ্ঠী। আর তৃতীয় দলে ছিল জিম্মিগণ। চুক্তিবদ্ধ কাফেরগণ ইসলাম গ্রহণের পর শুধু যুদ্ধরত ও জিম্মি এ দু'দল কাফেরই ছিল। যুদ্ধরত কাফেরগণ সর্বদা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ভয় করতো এ জন্যে তারা সর্বদাই শত্রুতা করে যাচ্ছিল। এভাবে সমগ্র দুনিয়ার লোক রাসূল (সা)-এর দৃষ্টিতে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রথম ভাগে ছিলেন ঈমানদার মুসলিমগণ। দ্বিতীয় ভাগে ছিল শান্তি চুক্তির অধীন ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী জিম্মিগণ এবং তৃতীয় দলে ছিল যুদ্ধরত কাফেরগণ। ইসলামী আদর্শের প্রকৃতিই এরূপ যে, তার আন্দোলন শুরু হতেই মানুষ ঐসব ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু দুর্বল মনোভাবাপন্ন ও পাশ্চাত্য লেখকদের আক্রমণের মুখে পরাজয় স্বীকারকারী মহল জিহাদের যে ব্যাখ্যা দান করে, তা ইসলামী জিহাদের বৈশিষ্ট্য থেকে বহু দূরে।

মুসলমানগণ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করার পর প্রথম দিকে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে নিম্নের আয়াত নাযিল করেন ঃ

كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ج

"হাত গুটিয়ে রাখ, সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও।"—নিসা ঃ ৭৭

কিছুকাল পর নিম্ন বর্ণিত কুরআনের ভাষায় শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেন–

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ط وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۝ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ط وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ط وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝ الَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ

وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ○

"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরও (যুদ্ধের) অনুমতি দেয়া হচ্ছে। কারণ তারা অত্যাচারিত। আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাদের সাহায্য করতে সমর্থ। তারা ঐসব লোক যাদেরকে অন্যায়ভাবে নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। তাদের 'অপরাধ' শুধু এটুকু যে, তারা আল্লাহকেই তাদের একমাত্র 'রব' বলে ঘোষণা করেছে। যদি আল্লাহ তাআলা একদল মানুষ দিয়ে অপর দলকে দমন না করতেন তাহলে তারা সকল খানকাহ, গীর্জা, উপাসনালয় ও মসজিদগুলো ধ্বংস করে দিত। অথচ ঐ ঘরগুলোতে আল্লাহরই যিক্র হয়। যারা আল্লাহর সাহায্য করেন, আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন—আল্লাহ অত্যন্ত পরাক্রান্ত (আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্তির যোগ্য তারা) যাদের আমরা কোন ভূখণ্ডের শাসন ক্ষমতা দান করার পর তারা সেখানে সালাত কায়েম করে, যাকাত ব্যবস্থা প্রচলিত করে, সৎকাজের আদেশ বা আইন জারি করে এবং অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম ফল আল্লাহ তাআলারই হাতে।"—আল হজ্জ ঃ ৩৯—৪১

এ স্তর অতিক্রম করার পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে যারাই তরবারি ধারণ করে তাদের বিরুদ্ধেই জিহাদ করার আদেশ দান করা হয়—

وَقَاتِلُوْا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ

"তোমাদের বিরুদ্ধে যারা অস্ত্র ধারণ করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরাও অস্ত্র ধারণ কর।"—আল বাকারা ঃ ১৯০

আর অবশেষে সকল মুশরিকদের বিরুদ্ধেই জিহাদ করার জন্যে আল্লাহ তাআলা আদেশ দেন—

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً ط

"আর তোমরা সকলে মিলে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যেভাবে তারা সম্মিলিতভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।"—তাওবা ঃ ৩৬

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُوْنَ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَلاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ○

"আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়ন করে না, আল্লাহ ও রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম বিবেচনা করে না, এবং সত্য দ্বীনকে নিজের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে দাও যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে জিযিয়া কর দিয়ে (ইসলামী রাষ্ট্রের) অধীনতা স্বীকার করে নেয়।"—তাওবা ঃ ২৯

কুরআনের উপরোক্ত আয়াতগুলো, জিহাদে উৎসাহ দানকারী অসংখ্য হাদীস, নবী করীম (সা)-এর সামরিক অভিযান তথা ইসলামের পরিপূর্ণ ইতিহাসই জিহাদের ঘটনাবলীতে ভরপুর। এসব সুষ্ঠু প্রমাণ থাকার কারণে মুসলিম জনসাধারণ পাশ্চাত্য মনোভাবাপন্ন লেখকদের জিহাদ সম্পর্কিত নতুন ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। কারণ ঐসব লেখন প্রতিকূল পরিবেশ ও পাশ্চাত্য দেশীয় চালবাজ গ্রন্থকারদের উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

যারা আল্লাহ তাআলার স্পষ্ট নির্দেশাবলী পাঠ করেন, নবী (সা)-এর হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং বিজয় কাহিনীতে ভরপুর ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করেন, তাঁরা কখনো এ মেনে নিতে পারেন না যে, জিহাদ একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা ছিল, তৎকালীন পরিবর্তনশীল সমাজের জন্যেই এর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং শুধু সীমান্ত রক্ষার জন্যে লড়াই করাই ছিল স্থায়ী জিহাদের আসল উদ্দেশ্য।

জিহাদের অনুমতি দানকালে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের একথা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, বিশ্ব-পরিচালনায় আল্লাহ তাআলার স্থায়ী বিধান হচ্ছে এই যে, তিনি মানব সমাজকে পংকিলতা মুক্ত রাখার জন্যে একদল লোকের সাহায্যে অপর দলকে দমন করে থাকেন। যথা—

"وَلَوْ لاَ دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ
وَّصَلَوٰتٌ وَّ مَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ط— الحج : ٤٠

"যদি আল্লাহ তাআলা একদলের সাহায্যে অপর দলকে দমন না করতেন তাহলে খানকাহ, গীর্জা, উপাসনালয় এবং যেসব সমজিদে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় সেগুলো তারা ধ্বংস করে দিতো।"—হজ্জ ঃ ৪০

বুঝা গেল এ সংগ্রাম অস্থায়ী নয় বরং এটা একটি চিরস্থায়ী ব্যবস্থা। কারণ পৃথিবীতে সত্য ও মিথ্যার সহ অবস্থান হতে পারে না। ইসলাম যখনই আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করে মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়ার সংকল্প ঘোষণা করেছে, তখনই অত্যাচারী প্রভুত্বের দাবীদারগণ এ

ঘোষণার বিরুদ্ধে উন্মুক্ত তরবারি হাতে দাঁড়িয়েছে এবং এ আন্দোলনকে কিছুতেই বরদাশত করতে রাযী হয়নি। ইসলাম এ আল্লাহদ্রোহীদের উচ্ছেদ সাধন এবং সমগ্র দুনিয়ার মানুষকে এ যালিমদের নির্যাতনমূলক শাসন ব্যবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্যে আপোষহীন সংগ্রামের প্রেরণা যুগিয়েছে। তাই মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের এ সংগ্রাম অবিরাম গতিতে এগিয়ে চলবে যতদিন পর্যন্ত না দ্বীন শুধু আল্লাহরই জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

মক্কীস্তরে সশস্ত্র জিহাদ নিষিদ্ধ থাকার কারণ

মক্কীস্তরে যুদ্ধ পরিহার করে দাওয়াত সম্প্রসারণের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তা ছিল একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার অস্থায়ী কার্যক্রম। হিজরাতের পরও কিছুকাল যাবত ঐ নীতি বহাল ছিল। কিন্তু প্রাথমিক স্তরের শেষে যখন মুসলমানগণ জিহাদের জন্যে বদ্ধপরিকর হয়, তখন সেটা শুধু মদীনা শহরের প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ ছিল না। মদীনার নিরাপত্তার প্রশ্নও অবশ্যই ছিল। কিন্তু ওটা ছিল একটা লক্ষ্যে পৌছার উপলক্ষ মাত্র। আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলকে শত্রুদের আক্রমণ থেকে মুক্ত রেখে মানুষকে সত্যিকারভাবে স্বাধীন ও মুক্ত করার সংগ্রাম অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যাওয়া এবং সকল বাধা-প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ করার জন্যে মদীনার প্রতিরক্ষা প্রয়োজনীয় ছিল।

মক্কায় অবস্থানকালে যুদ্ধ করার অনুমতি না দেয়ার যৌক্তিকতা সহজেই অনুমেয়। আল্লাহর নবী বনী হাশেমের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছিলেন। তাই তিনি প্রকাশ্য ঘোষণা মারফত দ্বীনের বাণী প্রচার করতে পারতেন। ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার ও ছোট ছোট আলোচনা বৈঠকের মাধ্যমে তিনি জনগণের মন-মগযে প্রভাব বিস্তার করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন। তাছাড়া মক্কায় কোন সুসংগঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা তাঁর প্রচারে অথবা জনগণের সাড়া প্রদানে বাধা সৃষ্টি করছিল না। তাই ঐ স্তরে শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। এ ছাড়া আরও কতিপয় কারণে মক্কায় সে সময় যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়াই সঙ্গত ছিল। আমার প্রণীত "ফী যিলালিল কুরআন" নামক তাফসীর গ্রন্থে নিম্নলিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমি ঐসব কারণ উল্লেখ করেছি—

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ - النساء : ٧٧

"তুমি কি তাদেরকে দেখেছ, যাদের হাত নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ?"—আন নিসা ঃ ৭৭

আন্দোলনের মক্কীস্তরে যুদ্ধে লিপ্ত হতে নিষেধ করার দ্বিতীয় কারণ মূলত এই যে, ঐ সময়ে ইসলামী আন্দোলন এক বিশেষ পরিবেশে, বিশেষ উদ্দেশ্য

সিদ্ধির জন্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মী বাহিনী তৈরী করছিল। কারণ তৎকালীন পরিবেশে যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করছিলেন, তাঁদের বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দান খুবই জরুরী ছিল। যেমন—আরবগণ যেসব বিষয়ে অভ্যস্ত ছিল না সে ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তাদের তা সহ্য করার মত মনোবল দান করা ছিল একেবারেই অপরিহার্য। নিজের বা আত্মীয়-স্বজনের উপর যুলুম-নির্যাতন হলে ধৈর্য ধারণ করা, আত্ম-অহংকার ও আত্মমর্যদাবোধকে নিয়ন্ত্রিত করা, ব্যক্তিগত আক্রোশ মিটানো অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের আকাংখা দমন করা, আত্মপূজা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে নিবৃত্ত হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৎকালীন আরবে ইসলাম গ্রহণকারীদের জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কিত ধারণা পরিবর্তন করা দরকার ছিল। কারণ জাহেলিয়াতের যুগে তাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল নিজের ও স্বজনদের নিরাপত্তা বিধান। ইসলাম গ্রহণের পর তাদের জীবনের লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন করার জন্যে তাদের তৈরী করে তোলা ছিল খুবই জরুরী। তারা যেন উত্তেজনার বশে রাগান্বিত হয়ে দিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে না ফেলে। বরং অত্যন্ত ধীরে ও স্থির মস্তিষ্কে ভারসাম্যমূলক ও শালীনতাপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। একজন মহান নেতার আদেশে একটি সুশৃঙ্খল সংগঠনের সদস্য হিসেবে কাজ করা এবং প্রতিটি বিষয়ে নেতার মতামত জেনে নিয়ে তদনুসারে কাজ করার জন্যেও তাদের ট্রেনিং দেয়া জরুরী ছিল। নেতার আদেশ ব্যক্তি বিশেষের পসন্দ না হলেও শৃংখলা রক্ষার্থে তা মেনে চলার জন্যে তাদের মনোভাব পরিবর্তন করা হচ্ছিল। আরবদের জীবন গড়ে তোলার জন্যে এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণদান ছিল খুবই জরুরী। কারণ একটি সুশৃঙ্খল, উন্নত স্বভাব, সুসভ্য ও পশু-প্রবৃত্তিমুক্ত এবং গোত্রীয় বিবাদ-বিসম্বাদ বর্জিত সমাজ গড়ে তোলাই ছিল ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য।

মক্কী স্তরে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দানের পেছনে অপর একটি কারণ এ-ও হতে পারে যে, কুরাইশগণ বংশ মর্যাদার অহংকারে লিপ্ত ছিল। তাদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে দ্বীনের পথে আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ ছিল। লড়াই ও যুদ্ধ-বিগ্রহ অধিকতর শত্রুতা ও ক্রোধ বৃদ্ধির সহায়ক হতো এবং তাদের জন্মগত রক্ত পিপাসা আরও প্রবল হয়ে উঠতো। ইতিপূর্বে গোত্রীয় বিদ্বেষের ভিত্তিতে দাহিস, গাবরা ও বাসুসের যুদ্ধগুলো বছরের পর বছর ধরে চালানো হয়েছিল এবং ঐসব যুদ্ধক্ষেত্রে গোত্রের পর গোত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ইসলাম যদি ঐ ধরনের গোত্রীয় বিদ্বেষের শিকারে পরিণত হতো, তাহলে তার আদর্শিক ও দাওয়াতী আবেদন কারো মনে সাড়া জাগাতে

পারতো না। বরং এক বিরামহীন রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের উপকরণ হয়ে থাকতো মাত্র। আর এ অবস্থায় তার বাণী ও মৌলিক শিক্ষা গোত্রীয় বিবাদের তলায় নিষ্পেষিত হওয়ার আশংকা ছিল।

ব্যাপকভাবে গৃহযুদ্ধের বিস্তার রোধ করাও মক্কায় যুদ্ধ পরিহার করে চলার অন্যতম উদ্দেশ্য হতে পারে। কারণ মুমিনদের উপর অত্যাচার করা ও তাদের আন্দোলনে বাধাদান করার জন্যে মক্কায় আইনানুগ কোন সরকার ছিল না। বরং প্রত্যেক মুসলমানের আত্মীয়-স্বজন ও স্বগোত্রীয় লোকেরাই তাদের দাওয়াতের কাজে বাধা দিচ্ছিল এবং তাদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় যুদ্ধ করার অনুমতি দিলে প্রত্যেক পরিবারেই একটি যুদ্ধক্ষেত্র কায়েম করা হতো। আর গৃহযুদ্ধের এ ধারা অব্যাহত গতিতে চলতো। বিরোধী মহলও প্রচারণা চালানোর সুযোগ লাভ করতো যে, ইসলাম গৃহ বিবাদ বাঁধিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে এ জাতীয় প্রচারণা শুরু করাও হয়েছিল। হজ্জের সময় দূর-দূরান্ত থেকে যেসব লোক মক্কায় হজ্জ অথবা ব্যবসা করার জন্যে সমবেত হতো, তাদের নিকট কুরাইশ দলপতিগণ গিয়ে বলতো, "মুহাম্মাদ শুধু নিজের গোত্রের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয়নি, সে পিতা-পুত্রের মধ্যেও বিবাদ বাঁধিয়ে দিয়েছে।" অথচ সে সময় দুশমনদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধ ছিল। যদি পুত্রকে ইসলাম বিরোধী পিতার এবং দাসকে দ্বীনের দুশমন মনিবের গর্দান উড়িয়ে দেয়ার অনুমতি দেয়া হতো, তাহলে ইসলামের বিরুদ্ধে কি পরিমাণ অপপ্রচার করা হতো, এবং বাস্তব ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হতো তা বলা কঠিন ছিল।

আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন যে, ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যারা অতিমাত্রায় তৎপর এবং মুসলমানদের প্রতি যারা নির্মম অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তাদের অনেকেই পরবর্তীকালে ঈমান আনয়ন করে ইসলামের একনিষ্ঠ সৈনিকে পরিণত হবেন। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) কি তাদেরই একজন নন ? এ জন্যেও যুদ্ধ না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

যুদ্ধ পরিহার করার অপর একটি কারণ এ-ও হতে পারে যে, গোত্রীয় প্রথা অনুযায়ী আরবদের মন-মেজায এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যে, যুলুম-নির্যাতনের মুখে অটল মনোভাব প্রদর্শনকারী ব্যক্তিদের প্রতি তারা সহানুভূতিশীল হয়ে উঠতো। গোত্রের সম্ভ্রান্ত ও সৎস্বভাব লোকদের বেলায় এ মনোভাব আরও বেশী প্রবল ছিল। অসংখ্য ঘটনাবলী থেকে আমাদের একথার প্রমাণ পাওয়া

যায়। হযরত আবু বকর (রা)-এর মত সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র ব্যক্তি মক্কা থেকে হিজরাত করতে উদ্যত হলে ইবনে আদ দাগনা তা বরদাশত করতে পারেনি। তাই সে হযরত আবু বকর (রা)-কে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। কারণ এরূপ ব্যক্তির দেশ ত্যাগকে ইবনে আদ দাগনা আরব সমাজের জন্যে মর্যাদা হানিকর বিবেচনা করতো। তাই সে হযরত আবু বকর (রা)-কে আশ্রয় দান ও পৃষ্ঠপোষকতা করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। যে চুক্তির মাধ্যমে বনী হাশেমকে আবু তালেব উপত্যকায় অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল তা ছিন্ন করার মধ্যেও আমাদের একথারই প্রমাণ পাওয়া যায়। বনি হাশেম গোত্রের অনাহার ও দুঃখ-কষ্ট তীব্র আকার ধারণ করায় আরব যুবকেরাই ঐ চুক্তিপত্র ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে। প্রাচীন আরব সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, নির্যাতিতের প্রতি তাদের মনে সহানুভূতি জাগ্রত হতো। অথচ সমসাময়িক আরবদের সমাজে অত্যাচারের মুখে ধৈর্য ধারণকারীদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হতো এবং অত্যাচারীগণকে সম্ভ্রমের চোখে দেখা হতো।

আর একটি কারণ এই যে, সে সময় মুসলমানদের সংখ্যা খবুই কম ছিল এবং ইসলামী দাওয়াত তখনো মক্কার বাইরে প্রসার লাভ করেনি। কোন কোন এলাকায় এ সম্পর্কে মাত্র ভাসা ভাসা খবর পৌছে। অপরাপর গোত্রের লোকেরা বিষয়টিকে কুরাইশ বংশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার মনে করে বিবাদের ফলাফল কি দাঁড়ায় তা দেখার জন্যে অপেক্ষা করছিল। এ সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ অনুষ্ঠিত হলে স্বল্প সংখ্যক মুসলমানদের জামায়াতটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আশংকা ছিল। যদিও তাঁরা নিজেদের সংখ্যার চাইতে কয়েকগুণ বেশী সংখ্যক দুশমনদের হত্যা করতে সক্ষম ছিলেন। তথাপি তাদের নিজেদের জীবিত থাকার সম্ভাবনা মোটেই ছিল না। কারণ সংখ্যায় তাঁরা খুবই কম ছিলেন। অসময়ে যুদ্ধ শুরু করার পরিণতি স্বরূপ তাঁদের সকলের জীবন নাশ হলে শির্‌ক যথাস্থানে বিরাজমান থাকতো এবং ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য কখনো বাস্তবায়িত হতে পারতো না। কিন্তু ইসলাম দুনিয়াতে বাস্তবায়িত হবার জন্যেই এসেছে। তাই যথাসময়ের আগে যুদ্ধ শুরু করে দেয়া সঙ্গত ছিল না।

হিজরাতের পরও কিছুকাল সশস্ত্র যুদ্ধ পরিহার

ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্র মদীনায় স্থানান্তরিত হবার পরও কিছুকাল যাবৎ যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াহুদী এবং মদীনার ভিতরে ও উপকণ্ঠে বসবাসকারী মুশরিক আরবদের সাথে সম্পাদিত এক চুক্তিনামায় পরস্পরের প্রতি আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন। আন্দোলনের এ স্তরে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণই ছিল অত্যন্ত জরুরী। এ চুক্তিপত্রের পটভূমিকা ছিল নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত মদীনায় ইসলামের বাণী প্রচার ও মতামত ব্যক্ত করার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মদীনায় কোন রাষ্ট্র-শক্তি না থাকায় জনগণের মতামত গ্রহণ ও বর্জনে হস্তক্ষেপ করার উপযোগী কোন শক্তি ছিল না। মদীনার সকল অধিবাসীই নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং তাদের সকল রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্যে আল্লাহর নবীর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল। তাই চুক্তিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, আল্লাহর নবীর বিনানুমতিতে মদীনার কোন অধিবাসীই বাইরের কারো সাথে শান্তিচুক্তি, যুদ্ধ ঘোষণা অথবা অন্য কোন প্রকারের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না। এমতাবস্থায় মদীনার রাজনৈতিক ক্ষমতা মুসলিম নেতৃত্বেরই হাতে ছিল এবং সেখানে মতামত প্রকাশেরও পূর্ণ স্বাধীনতা বিরাজ করছিল।

দ্বিতীয়ত রাসূল (সা) এ স্তরে সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত করে কুরাইশদের বিরোধিতার একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কারণ ঐ বংশের বিরোধিতা অন্যান্য গোত্রের লোকদের দ্বীন গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তারা কুরাইশদের "এ আভ্যন্তরীণ বিবাদ"-এর পরিণতি দেখার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) কালক্ষেপ না করে বিভিন্ন দিকে ছোট ছোট সৈন্যদল প্রেরণ করেন। সর্বপ্রথম তিনি যে সৈন্যদল প্রেরণ করেন তার সেনাপতি ছিলেন হযরত হামজা (রা) ইবনে আবদুল মুত্তালিব।

হিজরাতের পর ছয়মাস উত্তীর্ণ হতে না হতেই রমযান মাসে এ বাহিনী প্রেরিত হয়েছিল। এ বাহিনীর পর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রমাগত একটির পর একটি সৈন্যদল প্রেরণ করতে থাকেন। একটি হিজরাতের পর, দ্বিতীয়টি তেরমাস পর এবং তৃতীয়টি ষোড়ষ মাসের শুরুতে। হিজরাতের পর সপ্তদশ মাসের প্রারম্ভে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল প্রেরিত হয় এবং এ অভিযানেই রক্তপাত সংঘটিত হয়। সেটি ছিল রমযান মাস—আরবের স্বীকৃত নীতিমালা অনুসারে ঐ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। এ সম্পর্কে কুরআনে করীমে নিম্নলিখিত ভাষায় আলোচনা হয়েছে ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَمِ قِتَالٍ فِيْهِ ط قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ط وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ق وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ج وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ط

"আপনাকে (হে নবী) নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হচ্ছে। বলুন, ঐ সময় যুদ্ধ করা দূষণীয়, কিন্তু মানুষকে আল্লাহর পথে জীবন

যাপনে বাধাদান, আল্লাহর প্রতি কুফরী করা, আল্লাহর বান্দাদের জন্যে মসজিদুল হারামে আগমনের পথ বন্ধ করে দেয়া এবং হেরেম শরীফের বাসিন্দাদের সেখান থেকে বিতাড়িত করা আল্লাহর নিকট অধিকতর দূষণীয়। এসব অত্যাচার রক্ত পাতের চাইতেও জঘন্য।"—বাকারা ঃ ২১৭

হিজরাতের পর দ্বিতীয় বছরেই রমযানুল মুবারক মাসে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সূরায়ে আনফালে এ সম্পর্কে মন্তব্যও করা হয়েছে।

ইসলামী আন্দোলনের এ স্তর সম্পর্কে সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামী জিহাদকে আত্মরক্ষামূলক লড়াই আখ্যা দেয়ার কোনই সঙ্গত কারণ নেই। এটা শুধু পাশ্চাত্য দেশীয় বিভ্রান্তকারী লেখকদের আক্রমণে প্রভাবিত চিন্তাবিদদেরই অপকীর্তি। ইসলামের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক শিথিল হয়ে আসার দরুন তারা গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে দুর্বল ভূমিকা গ্রহণ করে এবং এ সুযোগেই ইসলাম বিরোধী পাশ্চাত্যের লেখক মহল ইসলামী আদর্শের প্রতি আক্রমণের পর আক্রমণ চালায়। আর তাদের প্রবল আক্রমণের তীব্রতা অনুভব করেই দুর্বলমনা মুসলমান নামধারী একদল 'গবেষক' ইসলামী জিহাদকে 'আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ' হিসেবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পায়। আল্লাহ তাআলারই মহান অনুগ্রহে একদল দৃঢ়চেতা মুসলমান এসব অপপ্রচারের প্রভাব থেকে মুক্ত রয়েছেন এবং তাঁরা সদর্পে ঘোষণা করেছেন যে, মানুষকে আল্লাহ ব্যতীত অপর সকল কর্তৃত্বের গোলামী থেকে পরিপূর্ণরূপে মুক্তিদান এবং দ্বীনকে শুধু এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করাই ইসলামের লক্ষ্য। কিন্তু এ স্বল্প সংখ্যক লোক ছাড়া সকল তথাকথিত চিন্তাবিদই ইসলামী জিহাদের স্বপক্ষে নৈতিক কারণের যুক্তি দেখিয়ে বিরোধী মহলের মনস্তুষ্টি সাধনের চেষ্টায় তৎপর রয়েছেন। কিন্তু ইসলামী সমর নীতির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে যে উক্তি করেছেন তার উপর আর কোন যুক্তি পেশ করার অবকাশ মাত্র নেই।

فَلْيُقَاتِلْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ط وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝ وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاۤءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ج

وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ○ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاۤءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ○

"আল্লাহর পথে লড়াই করার যোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন তাঁরা যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। আর যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেন তারা বিজয়ী হোক অথবা নিহত, উভয় অবস্থায়ই আমরা তাদের প্রচুর পরিমাণ পুরস্কার দান করবো। তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছো না অথচ অসহায় অবস্থায় পতিত কত পুরুষ, নারী ও শিশু আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে বলছে, 'প্রভু ! এ জনপদ থেকে আমাদের উদ্ধার কর। এখানকার অধিবাসীরা যালেম। আর আমাদের জন্যে তোমারই পক্ষ থেকে একজন উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী পাঠিয়ে দাও।' যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। আর যারা কাফির তারা জিহাদ করে তাগুতের পথে। তোমরা শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে যাও। শয়তানের সকল চক্রান্তই প্রকৃতপক্ষে দুর্বল।"—আন নিসা ঃ ৭৪—৭৬

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْلَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ○ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰكُمْ ط نِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ ○

"(হে নবী) কাফিরদের বলে দাও, তারা এখনও যদি (সুপথে) ফিরে আসে তাহলে আগে যা কিছু হয়ে গেছে তা মাফ করে দেয়া হবে। কিন্তু তারা যদি (পূর্বের আচরণের) পুনরাবৃত্তি করে তাহলে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর পরিণতি সকলেরই জানা আছে। হে ঈমানদারগণ ! কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাও যে পর্যন্ত না ফিতনা সম্পূর্ণরূপে মিটে যায় এবং একমাত্র আল্লাহ তাআলার দ্বীনই অবশিষ্ট থাকে। অতপর যদি তারা ফিতনা থেকে বিরত হয়, তাহলে জেনে রাখ যে,

আল্লাহ তাআলাই তাদের সকল কার্যকলাপ লক্ষ্য করছেন। আর যদি তারা অমান্য করে তাহলে (হে নবী !) মনে রেখো যে, আল্লাহ-ই তোমার পৃষ্ঠপোষক এবং উত্তম সাহায্যকারী।"—আনফাল ঃ ৩৮—৪০

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ○ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ نِ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ج يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ط قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ج اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○ اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ج وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا ج لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ○ التوبة : ٢٩-٣٢

"আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে সেসব লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়ন করে না। আল্লাহ ও রাসূল যা হারাম ঘোষণা করেছেন তা পরিত্যাগ করে না এবং দ্বীনে হককে তাদের জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করে না। তারা যে পর্যন্ত নতি স্বীকার করে ও স্বহস্তে জিযিয়া করদানে সম্মত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করে যাও। ইয়াহুদীগণ বলে, উযায়ের আল্লাহর পুত্র আর খৃষ্টানরা মসীহকে আল্লাহর পুত্র আখ্যা দিয়ে থাকে। এসব ভিত্তিহীন কথাবার্তা তাদের পূর্ববর্তী বিপথগামীদের কথাবার্তারই পুনরুক্তি মাত্র। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন, এরা কিভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে। তারা আল্লাহর স্থলে তাদের ধর্মযাজক ও পুরোহিতগণকে তাদের রব বানিয়ে নিয়েছে এবং মরিয়ামের পুত্র মসীহকেও। অথচ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো বন্দেগী করতে তাদের আদেশ দেয়া হয় না। তিনি ছাড়া বন্দেগী করার যোগ্যও কেউ নেই। তারা যেসব মুশরিকসুলভ কথাবার্তা বলে, সেগুলো থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। তারা আল্লাহর প্রদীপকে ফুঁৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু

কাফেরদের নিকট অসহনীয় হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁর দ্বীনের আলোকবর্তিকাকে পূর্ণত্ব দান থেকে বিরত হতে পারেন না।"

—আত্ তাওবা ঃ ২৯—৩২

উপরের আয়াতগুলোতে জিহাদের যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে যা বল হয়েছে তার সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহ তাআলার প্রেরিত দ্বীনে হককে মানুষের জীবনে রূপায়িত করা, সকল প্রকার শয়তানী শক্তি ও শয়তান রচিত জীবন বিধান উচ্ছেদ্ সাধন এবং মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্বের অবসান করা-ই জিহাদের লক্ষ্য। মানুষ শুধু মাত্র আল্লাহর দাসত্ব করার জন্যেই সৃষ্ট। সুতরাং কোন মানুষেরই মানুষের উপর প্রভুত্ব কায়েম করা ও নিজের ইচ্ছা মাফিক আইন-বিধান জারী করার অধিকার নেই। উপরে যেসব বিষয়ের উল্লেখ করা হলো সেগুলো জিহাদ শুরু করার দাবী পেশ করে। একই সাথে لَاۤ اِکْرَاهَ فِی الدِّیْنِ (দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তী নেই) আয়াতাংশের নির্দেশও মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ মানুষের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি লাভ করার পর একমাত্র আল্লাহরই প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকবে। দ্বীন একমাত্র আল্লাহরই হবে। কোন মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে জবরদস্তি করা যাবে না।

জিহাদের গুরুত্ব সম্পর্কে উপরের আলোচনা থেকে যা জানা গেল তা হচ্ছে এই যে, ইসলাম মানুষের জন্যে সত্যিকার স্বাধীন জীবনের নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যেই জিহাদের কর্মপন্থা পেশ করেছে। আর মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহ তাআলার দাসত্বে নিয়োগই পূর্ণ স্বাধীনতার বাস্তব রূপ। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ তাআলা ছাড়া মানুষ অন্য কোন শক্তির সামনেই মাথা নত করতে পারে না। এ একটি কারণই কি জিহাদ শুরু করার জন্যে যথেষ্ট নয়? তাই মুসলিম মুজাহিদগণ সর্বদা উপরে বর্ণিত মনোভাবের বশবর্তী হয়েই জিহাদে অংশ গ্রহণ করতেন। যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের প্রশ্ন করা হলে কোন মুজাহিদই বলতেন না "আমার দেশ বিপন্ন তাই যুদ্ধ করছি" অথবা "পারস্য এবং রোম আমাদের আক্রমণ করেছে তাই আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে লড়াই করছি" অথবা "আমরা রাজ্য বিস্তার ও গনীমাতের সম্পদ হস্তগত করার জন্যে যুদ্ধ করে চলছি।" অপর দিকে রাবি ইবনে আমের, হোজায়ফা ইবনে মুহাসিন এবং মুগীরা ইবনে শায়বা পারস্য সেনাপতি রুস্তমের প্রশ্নের জবাবে যে উত্তর দিয়েছিলেন, তারাও তা-ই বলতেন। কাদেসীয়ার যুদ্ধের তিনদিন পূর্ব পর্যন্ত সেনাপতি রুস্তম উপরোক্ত তিনজন মুজাহিদকে পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা কি উদ্দেশ্যে লড়াই করতে এসেছ?" তাঁরা উত্তরে বলেন—

"আল্লাহ তাআলা আমাদের হুকুম দিয়েছেন, আমরা যেন মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে অদ্বিতীয় আল্লাহ তাআলার প্রভুত্বের অধীনে আনয়ন করি, সংকীর্ণতার গন্ডী থেকে বের করে এনে তাদেরকে যেন পৃথিবীর সুপ্রশস্ত ময়দানে নামিয়ে দেই এবং বাতিল ধর্মীয় অনুশাসনের নির্যাতন থেকে রেহাই দিয়ে তাদেরকে যেন ইসলামী ন্যায়-নীতির সুশীতল ছায়াতলে স্থান করে দেই। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যেই আল্লাহ তাআলা নবীকে জীবন বিধান সহকারে মানব সমাজে প্রেরণ করেছেন।"

"যারা আমাদের উল্লেখিত জীবন বিধান কবুল করে নেয় আমরা তাদের স্বীকারোক্তি মেনে নিয়ে ফিরে যাই এবং তাদের দেশ তাদের হাতে প্রত্যর্পণ করি। আর যারা আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাই এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা শাহাদাত বরণ করে জান্নাতে প্রবেশ করি অথবা দুশমনের উপর আমাদের বিজয় সূচিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এ লড়াই অব্যাহত রাখি।"

জিহাদের আরও একটি কারণ

ইসলামের অন্তর্নিহিত ভাবধারার মধ্যেই জিহাদের উল্লেখিত কারণগুলো দৃঢ়মূল হয়ে আছে। অনুরূপভাবে ক্ষমতালিপ্সু মানুষের দাসত্ব থেকে বিশ্বজনীন আযাদীর ঘোষণা, মানবসমাজে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতির সার্বিক মুকাবিলা এবং অগ্রগতির প্রতিটি স্তরে যথাযোগ্য উপায়-উপকরণ ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় এ দ্বীনের বাস্তব চাহিদারই অন্তর্ভুক্ত। এ দ্বীনের দাওয়াত উচ্চারণের মধ্যেই জিহাদের ঘোষণা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি বিরুদ্ধ শক্তির পক্ষ থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা থাকুক বা না-ই থাকুক, সে জন্যে তার জিহাদী ভাবধারার কোনই পরিবর্তন হতে পারে না। অনৈসলামিক সমাজের বিরাজমান অবস্থা এবং ইসলামী আন্দোলনের সূচনা উভয়ই পরস্পরের প্রতি সংঘর্ষশীল। তাই জিহাদ শুধু দেশরক্ষা অথবা আত্মরক্ষার সাময়িক প্রয়োজনের সীমিত কার্যক্রম নয়। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লোভ চরিতার্থ করার জন্যে কোন মুসলমানই নিজের প্রাণ ও ধন-সম্পদ উৎসর্গ করে জিহাদে অংশ গ্রহণ করে না।

জিহাদের ময়দানে পদক্ষেপ নেয়ার আগেই মুজাহিদকে অপর একটি বিরাট জিহাদে জয়ী হতে হয়। সেটি হচ্ছে তার অন্তরে কুমন্ত্রণা দানকারী শয়তান, তার নিজের কামনা-বাসনা, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুখ-সুবিধা, তার পরিবার ও স্বজাতির স্বার্থের প্রশ্ন এবং এ জাতীয় অপরাপর বিষয় যেগুলো আল্লাহর বন্দেগী ও পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হয়ে

দাঁড়ায়। এগুলোর বাধা অতিক্রম করার পরেই মর্দে মু'মিন জিহাদের ময়দানে অবতরণ করতে পারে। আর সমাজে ইসলামের বিপরীত যত প্রকার শ্লোগান ও মতবাদের আন্দোলন বিদ্যমান থাকে তাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই চালিয়ে বাতিল প্রভুত্বের উচ্ছেদ ও আল্লাহর শাসন প্রবর্তনের মহান প্রেরণাই মুমিন মুজাহিদগণের জীবনের লক্ষ্য।

ইসলাম ও দেশরক্ষা

যারা ইসলামী জিহাদকে দেশের প্রতিরক্ষা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে রাখতে আগ্রহান্বিত তারা ইসলামী জীবন বিধানের মহত্ব হ্রাস করতে চায়। তারা বলতে চায় যে, ইসলামী আদর্শ মাতৃভূমির চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়। মাতৃভূমিও অনুরূপ অন্যান্য বিষয়কে অনৈসলামিক জীবন বিধান যে দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে, ইসলাম তা সমর্থন করে না। তাদের এ দৃষ্টিভংগী আধুনিক যুগের পরিবেশে জন্মলাভ করেছে। এ দৃষ্টিভংগী ও অনুভূতি ইসলামী আদর্শের সাথে মোটেই সামঞ্জস্যশীল নয়।

ইসলামী জীবনাদর্শের আলোকে দ্বীনের আকীদা-বিশ্বাস সংরক্ষণই ইসলামী জিহাদের লক্ষ্য অথবা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের বাস্তব প্রতিচ্ছবি উপস্থাপনকারী জীবন বিধানের সংরক্ষণ কিংবা ঐ আদর্শ জীবন বিধান সংরক্ষণই ইসলামী জিহাদের লক্ষ্য। ইসলামের নিকট ভূখন্ডের কোন মূল্য নেই। একটি ভূখন্ড শুধু তখনই মর্যাদা লাভ করতে পারে যখন সেখানে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান মূল বিস্তার করে। এ ভূখন্ডে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ভূখন্ড ইসলামী আদর্শের আবাসভূমি (দারুল ইসলাম) এবং মানব জাতির আযাদী ও মুক্ত জীবন-যাত্রার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ অবস্থায় উল্লেখিত ভূখন্ডের প্রতিরক্ষার অর্থই হচ্ছে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের সংরক্ষণ—ইসলামী জীবন বিধান ও ইসলামী আদর্শের প্রতিনিধিত্বকারী সমাজ কাঠামোর সংরক্ষণ। কিন্তু নিছক প্রতিরক্ষা ইসলামী জিহাদের মূল ও চরম লক্ষ্য হতে পারে না। দারুল ইসলামের প্রতিরক্ষাও ইসলামী জিহাদের মূল লক্ষ্য নয়। দারুল ইসলামের প্রতিরক্ষা আল্লাহর শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার একটি উপলক্ষ্য মাত্র। তাছাড়া দারুল ইসলামকে ইসলামী আলোকবর্তিকার কেন্দ্রস্থলে পরিণত করা জিহাদের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ দারুল ইসলামের কেন্দ্র থেকে ইসলামী জীবনাদর্শের আলোকোজ্জল কিরণ রশ্মি দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তে বিস্তার লাভ করে মানব সমাজে স্বাধীনতা ও মুক্তির নিশ্চয়তা বিধান করবে। আগেই উল্লেখ করেছি যে, দ্বীন ইসলামের লক্ষ্য সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণ এবং গোটা পৃথিবীটাই তার কর্মস্থল।

জিহাদ-ই ইসলামের প্রকৃতিগত দাবী

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, দুনিয়াতে আল্লাহর শাসন প্রবর্তন করার পথে কিছু পার্থিব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা, অসামাজিক রাজনীতি এবং সমগ্র মানব সমাজের পরিবেশ ইত্যাদির প্রত্যেকটিই ইসলামের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এসব বাধা অপসারণ করার জন্যে ইসলাম শক্তি প্রয়োগ করে। প্রতিটি মানুষের নিকটই ইসলামের বাণী পৌছানো এবং প্রত্যেকের পক্ষে ইসলামী বিধানকে যাচাই করে দেখার প্রতিবন্ধকতা অপসারণ এবং এভাবে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে মানুষের নিকট ইসলামের অমর বাণী পৌছানোর সুযোগ সৃষ্টিই এ শক্তি প্রয়োগের লক্ষ্য। কৃত্রিম খোদাদের বন্ধন থেকে উদ্ধার করে মানুষকে স্বাধীনভাবে ভাল-মন্দ যাচাই করার সুযোগদানের জন্যে জিহাদ এক অত্যাবশ্যক উপায়।

পাশ্চাত্য লেখকগণ জিহাদের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে, তার দরুন আমাদের বিভ্রান্ত বা ভীত হলে চলবে না। প্রতিকূল পরিবেশ অথবা বৃহত শক্তিবর্গের বিরোধিতায় প্রভাবান্বিত হয়ে জিহাদের জন্যে ইসলামী জীবন বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করা অথবা জিহাদকে আত্মরক্ষামূলক ও সাময়িক পদক্ষেপ আখ্যা দেয়া আমাদের কিছুতেই সঙ্গত হবে না। জিহাদ এক শাশ্বত বিধান। প্রতিরক্ষার প্রয়োজন ও সামরিক কার্যকারণ থাকুক বা না থাকুক, জিহাদের প্রয়োজনীয়তা কখনই ফুরিয়ে যাবে না। ইতিহাসের উত্থান-পতন সম্পর্কে অধ্যয়ন করার সময় এ জীবন বিধানের প্রকৃতি, তার বিশ্বজনীন মুক্তির ঘোষণা ও বাস্তব কর্মপন্থার মধ্যে যে ভাবধারা বিদ্যমান তা উপেক্ষা করা যাবে না। সামরিক কার্যকারণ ও প্রতিরক্ষার প্রয়োজনকে দ্বীনের মূল লক্ষ্যের সাথে সংমিশ্রিত করা হবে খুবই ভ্রান্ত পদক্ষেপ।

অবশ্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা এ দ্বীনেরই দাবী। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ঘোষণা, আল্লাহ ব্যতীত অপরের দাসত্ব থেকে মানব সমাজকে উদ্ধার করার জন্যে বাণী প্রচার এবং এ ঘোষণা ও প্রচারের ভিত্তিতে একটি বিপ্লবী আন্দোলন এবং অনৈসলামিক নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে এক নতুন ধরনের নেতৃত্ব গড়ে তোলা এ দ্বীনের লক্ষ্য। মানুষের প্রভুত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে অদ্বিতীয় আল্লাহ তাআলার নিরংকুশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য ঘোষণা করার সাথে সাথেই মানুষের প্রভুত্ব স্বীকারকারী জাহেলী সমাজ নিজের অস্তিত্ব বহাল রাখার জন্যে ইসলামের উপর প্রবলভাবে আক্রমণ করে। স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী আন্দোলন নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ

করতে বাধ্য হবে। ইসলামী আন্দোলনের সূচনাতেই এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ইসলাম এ ধরনের সংঘর্ষ পসন্দ করে কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর। কেননা ইসলামী আন্দোলনের উপর এ ধরনের সংঘর্ষ চাপিয়ে দেয়া হয়। দু'টো পরস্পর বিরোধী জীবনাদর্শের সহাবস্থান সম্ভবপর নয় বিধায় এদের নিজ নিজ অস্তিত্ব বহাল রাখার তাকীদই তাদের সংঘর্ষে লিপ্ত করে দেয়। এ বাস্তব সত্যের কারণেই ইসলামের পক্ষে প্রতিরক্ষামূলক লড়াই করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

জাহেলিয়াতের সাথে কোন আপোস নেই

ইসলামী জীবন বিধানের অপর একটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, প্রকৃতিগতভাবেই ইসলাম সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দিতে সংকল্পবদ্ধ। তাই এ জীবন বিধান নিজেকে ভৌগলিক, গোত্রীয় অথবা অন্য কোন সীমাবদ্ধ গন্ডীতে আবদ্ধ করে সমগ্র দুনিয়ার মানব গোষ্ঠীকে অন্যের দাসত্বে ছেড়ে দিতে পারে না। ইসলামের বিরোধী মহল কোন এক সময়ে কৌশল হিসেবে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তার বিনিময়ে নিজেদের এলাকায় জাহেলী সমাজ ব্যবস্থা জারী রাখা এবং ইসলামের পক্ষ থেকে তাদের এলাকায় মানবতার মুক্তির সনদ ইসলাম প্রতিষ্ঠার অভিযান মুলতবী রাখার আবেদন করতে পারে। ইসলাম এ জাতীয় 'যুদ্ধ বিরতি' গ্রহণ করবে না। অবশ্য বিরোধী মহল যদি ইসলামের কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে জিযিয়া কর প্রদানে সম্মত হয়ে যায় তাহলে তাদের নিরাপত্তা বিধান করা হবে। কারণ এমতাবস্থায় তারা ইসলামের বাণী প্রচারের পথে রাজনৈতিক শক্তি দ্বারা বাধা সৃষ্টি না করার জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। এ দ্বীনের প্রকৃতিই এরূপ। আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্বের ঘোষণা এবং দুনিয়ায় সর্বত্র তাঁরই বন্দেগী কায়েম করার অভিযান পরিচালনাই তার কর্মপন্থা। একটি ভৌগলিক এলাকা থেকে এ আন্দোলনের সূচনা এবং একটি ভৌগলিক জাতীয়তায় নিজেকে সীমিত করা এক কথা নয়। প্রথমাবস্থায় এ ভূখন্ড একটি গতিশীল বিপ্লবী আন্দোলনের **কেন্দ্রস্থল** এবং দ্বিতীয় অবস্থায় জাতীয় রাষ্ট্র সকল প্রকার বিপ্লবী কর্মতৎপরতা থেকে বিরত একটি নিষ্ক্রিয় ভূখন্ড মাত্র।

ইসলামের বিপ্লবী ভূমিকা উপলব্ধি করতে হলে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইসলাম মানুষের জন্যে প্রদত্ত আল্লাহর বিধান। কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণী বা গোত্র এ বিধান রচনা করেনি। তাই ইসলামী জিহাদের যৌক্তিকতার স্বপক্ষে কোন বাহ্যিক কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। এ জাতীয় কারণ অনুসন্ধান

করে তারা ভুলে যায় যে, দুনিয়াতে আল্লাহর নির্দেশিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃত্রিমখোদাদের উচ্ছেদ সাধন এ দ্বীনের কর্মসূচীরই অংশ। ইসলামী জীবনাদর্শের এ বিপ্লবী কর্মসূচী যাদের অন্তরে জাগ্রত থাকে তাদের পক্ষে জিহাদের সমর্থনে বাহ্যিক কার্যকারণ অনুসন্ধান করার কোন প্রয়োজনই হয় না।

ইসলামী জিহাদ সম্পর্কে দু'রকম ধারণা

প্রথম স্তরেই ইসলামী জিহাদ সম্পর্কে দু'রকম ধারণার পার্থক্য অনুভব করা সম্ভব নয়। একটি ধারণা হচ্ছে এই যে, ইসলামকে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল। কারণ তার আত্মপ্রকাশই জাহেলিয়াতকে ইসলামের প্রতি আক্রমণ চালাতে বাধ্য করে। আর ইসলাম তদবস্থায় আত্মরক্ষার্থে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হয়। অপর ধারণাটি হচ্ছে এই যে, ইসলাম নিজেই অগ্রসর হয়ে জাহেলিয়াতের প্রতি আঘাত হানে এবং পরিশেষে জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। চিন্তার প্রাথমিক স্তরে এ উভয় ধারণার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে না। কেননা, উভয় ধারণাই ইসলামকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করতে বাধ্য করে। কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর বুঝা যাবে যে, উভয় চিন্তাধারার ধারকগণ ইসলামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে যে ধরনের ভাবধারা পোষণ করে তার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে।

ইসলামকে একটি আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করা এবং অপর দিকে একটি আঞ্চলিক মতবাদ বিবেচনা করার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। প্রথমোক্ত ধারণা অনুসারে ইসলামী জীবন বিধানের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার দুনিয়ায় আল্লাহর সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করা, সকল মানুষকে এক আল্লাহর দাসত্ব করার জন্যে আহবান করা এবং এ ঘোষণার বাস্তব নমুনাস্বরূপ এমন একটি সমাজ গঠন করা যেখানে মানুষ সম্পূর্ণরূপে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সম্মিলিতভাবে আল্লাহ তাআলার দাসত্ব মেনে নিতে পারে। ঐ সমাজে শরীয়াতে ইলাহীই সর্বোচ্চ বিধান। এটিই ইসলামের প্রকৃতরূপ এবং এ ইসলামই তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে বাধাদানকারী সকল শক্তির মূলোৎপাটন করতে নির্দেশ দেয়। কারণ, ঐ উপায়েই মানুষের মনগড়া শাসন ব্যবস্থা ও সামাজিক বন্ধনের নাগপাশ থেকে মানব সমাজের মুক্তি সম্ভব। দ্বিতীয় ধারণা অনুসারে ইসলামকে একটি আঞ্চলিক মতবাদ বিবেচনা করার দরুন সে বিশেষ ভূখন্ডের অধিবাসীদের উপর বিদেশী শক্তির আক্রমণের পর সে অঞ্চলের জনগণ আত্মরক্ষার খাতিরে যুদ্ধ করতে বাধ্য। এ উভয় ধারণার পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। অবশ্য উভয় অবস্থায়ই ইসলাম জিহাদের

নির্দেশ দেয়। কিন্তু উল্লেখিত দু'টি ধারণার বশবর্তী হয়ে দু'টি পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে জিহাদের সূচনা হলে উভয়ের কার্যকারণ, লক্ষ্য ও ফলাফল মৌলিক দৃষ্টিভংগী ও বাস্তব কর্মপন্থার দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে বাধ্য।

অবশ্য ইসলাম অগ্রবর্তী হয়ে জিহাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করে, ইসলাম কোন দেশ বা জাতির সম্পত্তি নয়। আল্লাহ প্রদত্ত এ জীবনাদর্শ সমগ্র দুনিয়ার কল্যাণ সাধনের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই যেসব সমাজ ব্যবস্থা ও রীতি-নীতি মানুষের আযাদী হরণ করে মানবতাকে দাসত্বের শিকলে বেঁধে রেখেছে সেগুলো মিটিয়ে দেয়া অত্যন্ত জরুরী। ইসলাম জনগণের উপর আক্রমণ করে না—কারো উপর জোর করে নিজের আদর্শ চাপাতে চায় না। তার বিরোধ হচ্ছে রীতিনীতি ও মতবাদের সাথে। রীতিনীতি ও মতবাদের পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমেই মানব সমাজকে ভ্রান্ত আদর্শের বিষাক্ত প্রভাব থেকে মুক্ত করা যেতে পারে।

মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তাআলার দাসত্বে নিয়োগ করার লক্ষ্য থেকে ইসলাম কখনো বিচ্যুত হতে পারে না। আর এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যেই ইসলাম আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষকে পরিপূর্ণরূপে আযাদীর সাধ গ্রহণের সুযোগ করে দেয়। ইসলামী জীবনাদর্শের মৌলিক বিশ্বাস ও বাস্তব কর্মসূচী—এ উভয় দিক থেকেই একমাত্র ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমেই মানুষের সত্যিকার আযাদী অর্জিত হতে পারে। শাসক-শাসিত, সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্র, নিকটাত্মীয় অথবা অনাত্মীয় সকলের জন্যে একমাত্র আল্লাহর আইনই নিরপেক্ষ ও কল্যাণকর হতে পারে। সকল শ্রেণীর মানুষকেই এ আইন সমানভাবে মেনে চলতে হবে। অপরাপর জীবন বিধানে মানুষ মানুষের দাসত্ব করে থাকে। আইন প্রণয়ন আল্লাহর শক্তির একটি অংশ। যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মানুষের জন্যে আইন রচনার অধিকার দাবী করে, তারা প্রকারান্তরে আল্লাহর কর্তৃত্বের দাবী করে থাকে। মুখে এরূপ দাবী উচ্চারিত হোক বা না হোক বাস্তবে আইন রচনার অধিকার দাবী আল্লাহর কর্তৃত্বের দাবী ছাড়া আর কিছুই নয়।

জিহাদ সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ভ্রান্ত ধারণা

আমাদের মুসলিম লেখকগণের মধ্যে যারা বর্তমান যুগের অবস্থা ও পাশ্চাত্য লেখকদের ছলনাপূর্ণ সমালোচনায় বিভ্রান্ত, তারা ইসলামী জীবনাদর্শের এ বিপ্লবী ভূমিকা স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নন। পাশ্চাত্য লেখকগণ ইসলামকে একটি রক্ত পিপাসু আদর্শরূপে চিত্রিত করেছে। তারা বিশ্বাসীকে বুঝাতে চায় যে. ইসলাম তরবারির সাহায্যে অপরের উপর নিজের

আদর্শ চাপিয়ে দিতে চায়। অথচ তারা ভালভাবেই জানে যে, ইসলাম এরূপ নয়। তবু তারা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ইসলামী জিহাদের মূল সূত্র ও কার্যকারণগুলোকে বিকৃত করতে চেষ্টা করছে। পাশ্চাত্য লেখকদের এ জাতীয় প্রচারণায় প্রভাবান্বিত হয়ে আমাদের কোন কোন মুসলমান লেখকও ইসলামের ললাট থেকে জিহাদের 'কলংক-চিহ্ন' ধুয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে ময়দানে নেমেছেন এবং জটিল যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করার প্রয়াস পাচ্ছেন যে, ইসলামী জিহাদ নিছক আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ মাত্র। অথচ তারা ইসলামী জীবন বিধানের প্রকৃতি ও মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ। তাঁরা এটুকুও জানেন না যে, বিশ্বের একটি কল্যাণকামী মতাদর্শ হিসেবে অগ্রবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ ইসলামের প্রকৃতিগত চাহিদা। অপর জাতির দ্বারা প্রভাবান্বিত মনোবৃত্তি সম্পন্ন তথাকথিত গবেষকগণের মন-মানসে ধর্ম সম্পর্কে পাশ্চাত্য চিন্তাধারাই সক্রিয়। পাশ্চাত্যদের বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, ধর্ম একটি বিশ্বাসের নাম এবং তার স্থান মানুষের অন্তরে, বাস্তব কর্ম জীবনের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু ইসলাম কখনো উল্লেখিত ধরনের ধর্মীয় শিক্ষা দেয়নি। আর পাশ্চাত্যের অনুরূপ আকীদা-বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কখনো জিহাদের ঝান্ডা উত্তোলন করা হয়নি। ইসলাম মানব জীবনের জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান। এ জীবন বিধান একমাত্র আল্লাহ তাআলারই দাসত্ব ও আনুগত্য শিক্ষা দেয়। ইসলামী দৃষ্টিভংগী অনুসারে আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠাই তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য করার নিদর্শন। মানব জীবনের বড় বড় সমস্যা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের অতি ছোট-খাট বিষয় পর্যন্ত সকল সমস্যার সমাধান করা ইসলামেরই পক্ষে সম্ভব। এ আল্লাহর ব্যবস্থাকে বিজয়ী আদর্শরূপে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টাই জিহাদ। তবে ব্যক্তিগত আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকবে। মানুষের মতামত পোষণ ও গ্রহণ বর্জনের স্বাধীনতা যারা স্বীকার করে না ইসলাম তাদের প্রতিবন্ধকতা দূর করে আপন আদর্শের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন চায়। ব্যক্তি হিসেবে প্রত্যেকেরই যে কোন আকীদা-বিশ্বাস ও মতামত গ্রহণ ও বর্জনের স্বাধীনতা রয়েছে। একথা অনায়াসে উপলব্ধি করা যায় যে, ইসলামী আদর্শ ও পাশ্চাত্যের ধর্ম সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। তাই যেখানেই ইসলামী জীবন বিধানের বাস্তব নমুনাস্বরূপ কোন সমাজ গঠিত হয়ে যায়, সেখানে আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার বলেই জনগণের কর্তব্য হবে অগ্রবর্তী হয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করা এবং ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়িত করা। অবশ্য ব্যক্তিগত আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে ইসলাম যে মানুষের স্বাধীনতা স্বীকার করে, তা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

ইসলামের সূচনায় মুসলিম উম্মাতকে সাময়িকভাবে আল্লাহ তাআলা জিহাদ থেকে বিরত রেখেছিলেন। সেটা ছিল একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশবিশেষ—নীতিগত সিদ্ধান্ত তা নয়। এ আলোচনার আলোকেই আমরা কুরআনের জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতগুলোর মর্ম অবগত হতে পারবো। কারণ ক্রম অগ্রসরমান ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরের চাহিদা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন আয়াত নাযিল হয়েছিল। এসব আয়াতের পর্যালোচনাকালে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আয়াতগুলো দু'ধরনের প্রয়োজন পূরণ করছে। আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে যেসব আয়াত নাযিল হয়েছিল সেগুলোর মর্ম উদ্ধার করার জন্যে সে স্তর ও পটভূমি স্মরণ রাখা দরকার। আয়াতের অপর একটি দিক হচ্ছে, এগুলোর স্থায়ী শিক্ষা। এ স্থায়ী শিক্ষণীয় বিষয়গুলো কোন অবস্থাতেই পরিবর্তনীয় নয়। ইসলামী আন্দোলন পরিচালনাকালে কুরআনের নির্দেশাবলী থেকে পথের সন্ধান পেতে হলে আয়াত ও কুরআনের নির্দেশগুলোর উপরোল্লিখিত দু'টো প্রকৃতির মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেললে চলবে না।

ইসলামী জীবন বিধান

ইসলামী জীবনাদর্শের বুনিয়াদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। ঘোষণাটি হচ্ছে ইসলামী আকীদার প্রথম স্তম্ভ বা কালেমায়ে শাহাদাতের প্রথমাংশ। এ অংশে আল্লাহ ছাড়া বন্দেগীর যোগ্য কেহ নেই—একথার স্বীকৃতি রয়েছে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ—ইসলামী আকীদা বা কালেমায়ে শাহাদাতের দ্বিতীয় অংশ। এ অংশে আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করার জন্যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রদর্শিত পন্থাই সঠিক বলে মেনে নেয়া হয়েছে।

এ কালেমা (ঘোষণা) তার উল্লেখিত দু'টো অংশসহ প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরেই বদ্ধমূল হয়ে যায়। কারণ, ঈমানের অপরাপর বিষয় ও ইসলামের পরবর্তী স্তম্ভগুলো এ ঘোষণারই পরিণতি। স্বাভাবিকভাবেই ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, নবীগণ (আ), আখেরাত, তাকদীরের ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনয়ন এবং সালাত, সওম, যাকাত, হজ্জ, হালাল ও হারামের পার্থক্য, লেনদেন, আইন-কানুন, উপদেশ—শিক্ষাদান ইত্যাদি সকল কাজকর্মই আল্লাহ তাআলার বন্দেগী ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে।

ইসলামী সমাজ কালেমায়ে শাহাদাত ও তার চাহিদাগুলোর বাস্তব চিত্র পেশ করবে। যে সমাজে কালেমায়ে শাহাদাতের রূপ পরিস্ফুট হয় না সে সমাজ ইসলামী সমাজ নয়। তাই কালেমায়ে শাহাদাত একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শের ভিত্তি এবং এ ভিত্তির উপরেই মুসলিম উম্মাতের বিরাট সৌধ গড়ে উঠে। এ ভিত্তিটি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত না হলে জীবন যাত্রা প্রণালী রচিত হতেই পারে না। এ ভিত্তির পরিবর্তে অন্য কোন ভিত্তি অবলম্বন অথবা এ ভিত্তিটির সাথে অন্য কোন আদর্শের আংশিক সংমিশ্রণ ঘটিয়ে জীবন বিধান রচনার প্রচেষ্টায় যে সমাজ গড়ে উঠবে তাকে কিছুতেই ইসলামী সমাজ আখ্যা দেয়া যেতে পারে না। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন—

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ط أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ط ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ - يوسف : ٤٠

"আদেশ দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। তিনিই আদেশ করেছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী করা চলবে না। আর এটাই হচ্ছে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত জীবন বিধান।" —ইউসুফ ঃ ৪০

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ ج — النساء : ٨٠

"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য করে।" —আন নিসা ঃ ৮০

এ সংক্ষিপ্ত অথচ সিদ্ধান্তকারী ঘোষণাই দ্বীনে হক ও তার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পরিচালনার জন্যে কর্মসূচী প্রণয়নে আমাদের পথপ্রদর্শন করে। প্রথমত, এ ঘোষণা ইসলামী সমাজের প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয়। দ্বিতীয়ত, ইসলামী সমাজ গঠনের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করে। তৃতীয়ত, জাহেলী সমাজের পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, তা বলে দেয়। চতুর্থত, মানব সমাজের প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা পরিবর্তনের উপায় বলে দেয়। ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে সঠিক নির্দেশের প্রয়োজনীয়তা অতীতেও যেমন ছিল, তেমনই রয়েছে ভবিষ্যতেও।

ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য

ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, সমাজের সকল বিষয়-আশয়ই একমাত্র আল্লাহ তাআলার বন্দেগীর ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। কালেমায়ে শাহাদাত এই বন্দেগীরই স্বীকৃতি দেয় এবং এরই উপায়-পন্থা নিরূপণ করে। সমাজের আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদাতের সকল অনুষ্ঠান, আইন-কানুন, রীতিনীতি এ বন্দেগীরই বাস্তব নমুনা পেশ করে মাত্র। যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে না সে প্রকৃতপক্ষে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর বন্দেগী করতে প্রস্তুত নয়।

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ج اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنَ ○ وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ط اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ○ النحل : ٥١-٥٢

"এবং আল্লাহ দু'জন ইলাহর আনুগত্য করতে নিষেধ করেছেন। ইলাহ মাত্র একজনই। সুতরাং একমাত্র আমাকেই ভয় করে চল। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর মালিকানাধীন এবং একমাত্র তাঁরই দ্বীন কার্যকর রয়েছে। তারপরও কি তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের ভয় করে চলবে ?" —আন নাহল ঃ ৫১—৫২

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কোন শক্তির সম্মুখে নতি স্বীকার করে কিংবা সে শক্তিকে আল্লাহর সাথে অংশীদার বিবেচনা করে সে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর বান্দা হতে পারে না।

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَ نُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ ج وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ○

"বলুন (হে নবী !) আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ সবই বিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্যে। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমাকে এ বিষয়ে হুকুম দেয়া হয়েছে এবং আমিই সর্বপ্রথম আনুগত্যকারী।"—আল আনআম ঃ ১৬২-১৬৩

পুনরায় যে ব্য[ক্ত রাসূল (সা) প্রবর্তিত আইন-কানুন পরিত্যনগ করে অন্য কোন উৎস থেকে আইন রচনায় প্র}ত্ত হয়, সে ব্যক্তিও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর বন্দেঝী থেকে বঞ্চিত।

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ ط

"তারা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহর কর্তৃত্ব অংশীদার সাব্যস্ত করে নিয়েছে ? আর ঐ শক্তি কি তাদের জন্যে দ্বীন সমতুল্য কোন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে দিয়েছে, আল্লাহ যে বিষয়ের অনুমতি দান করেননি।"

—আশ শুরা ঃ ২১

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ع

"রাসূল তোমাদের যা দান করেন তা গ্রহণ কর এবং তিনি যে বিষয়ে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।"—আল হাশর ঃ ৭

এটাই হলো ইসলামী সমাজে ক্ষমতার উৎস। সমাজে ব্যক্তির আকীদা-বিশ্বাস ও চালচলনে আল্লাহর বন্দেগী রূপায়িত হয়। অনুরূপভাবে তাদের ইবাদাত ও অনুষ্ঠানাদি এবং সমষ্টিগত ব্যবস্থাপনা, আইন-কানুন ও সমাজ নীতির মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাআলার বন্দেগীর রূপ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। এসব বিষয়ের কোন একটিও যদি বন্দেগী থেকে বঞ্চিত থাকে, তাহলে ঐ সমাজ পরিপূর্ণ ইসলাম থেকেই বঞ্চিত হয়ে যায়। কারণ, এ জাতীয় শূন্যতার ফলে কালেমায়ে শাহাদাতের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে উঠতে পারে না।

একমাত্র এভাবেই একটি সমাজ ইসলামী সমাজে রূপান্তরিত হতে পারে। পরিপূর্ণ নিষ্ঠাসহকারে বন্দেগীর মনোভাব গ্রহণ না করা পর্যন্ত কোন দলই ইসলামী দল বা কোন সমাজই ইসলামী সমাজ হিসেবে পরিচিত হতে পারে

না। কারণ ইসলামী সমাজের প্রথম বুনিয়াদ কালেমায়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' সমাজের সকল স্তরে রূপ লাভ না করে ইসলামী সমাজের আত্মপ্রকাশ করার কোন উপায় নেই।

তাই ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপই মানুষের অন্তরকে আল্লাহ ছাড়া অপর সকল শক্তির দাসত্ব ও আনুগত্যের প্রবণতা থেকে মুক্ত করতে হবে। যাদের অন্তর অপর শক্তির দাসত্ব মুক্ত হয়ে পবিত্রতা অর্জন করেছে, শুধু এসব লোকই সম্মিলিত হয়ে একটি উম্মাত গঠন করবে। যে উম্মাতের আকীদা-বিশ্বাস, পূজা-উপাসনা, আইন-কানুন প্রভৃতি সকল বিষয় আল্লাহ ছাড়া অপর সকল শক্তির আনুগত্য থেকে পরিপূর্ণরূপে মুক্ত, শুধু তারাই ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার যোগ্য। যারা ইসলামী জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই এ সমাজে প্রবেশ করবে এবং তাদের আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদাত বন্দেগী এবং রীতিনীতি সকল বিষয়ই অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। এক কথায় এ ব্যক্তিদের জীবন কালেমায়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র বাস্তবরূপ ধারণ করবে।

প্রথম মুসলিম উম্মাত এভাবেই গঠিত হয়েছিল এবং এ উম্মাত গঠনের স্বাভাবিক পরিণতি স্বরূপ ইসলামী সমাজ অস্তিত্ব লাভ করেছিল। মুসলিম উম্মাত গঠন ও ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার এটাই একমাত্র পথ।

ইসলামী সমাজ গঠনের উপায়

ব্যক্তি ও সমষ্টি একযোগে আল্লাহ ব্যতীত সকল শক্তির দাসত্ব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করার পরই ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অপরাপর শক্তির পূর্ণ আনুগত্য হোক অথবা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের সাথে সংমিশ্রিত আনুগত্য হোক—উভয় প্রকারের অধীনতা থেকেই মুক্ত হতে হবে। কেননা, আল্লাহ তাআলার কোন অংশীদার নেই। আল্লাহ তাআলার নিকট এভাবে আত্মসমর্পণকারী জনসমষ্টি নিজেদেরকে সংগঠিত করে তাদের জীবনযাত্রা ঐ আত্মসমর্পণের ভিত্তিতে পরিচালিত করতে সংকল্পবদ্ধ হতে হবে। এ সংকল্প থেকেই একটি নতুন উম্মাত জন্মলাভ করবে। জাহেলিয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন সমাজের বুকে এক নতুন সমাজ আত্মপ্রকাশ করে, নতুন আকীদা-বিশ্বাস, নতুন মতবাদ ও নতুন ধরনের জীবনযাত্রা প্রণালীর মাধ্যমে এ নব সমাজ কালেমায়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র পূর্ণরূপ ধারণ করে।

জাহেলিয়াতের প্রাচীন সমাজ এ নতুন সমাজের মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে পারে কিংবা এ সমাজের সাথে একটা আপোষ রফা করতে অথবা এর বিরুদ্ধে

লড়াইও করতে পারে। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, জাহেলী সমাজ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোগেই আন্দোলনের সূচনাকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সূচনায় স্বল্প সংখ্যক লোক এ আন্দোলনের ডাকে সাড়া প্রদানের সাথে সাথেই জাহেলিয়াতের পক্ষ থেকে লড়াই শুরু হয়। আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলে তাদের লড়াই প্রবল হয়ে উঠে। এমন কি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পরও জাহেলিয়াতের পতাকাবাহী দল লড়াই অব্যাহত রাখে। হযরত নুহ (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ (সা) পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর আহবানের জবাবে বাতিল সমাজ একই পন্থা অবলম্বন করেছে।

তাই একথা সুস্পষ্ট যে, জাহেলিয়াতের আক্রমণ প্রতিরোধ করার উপযোগী শক্তি অর্জন না করা পর্যন্ত মুসলিম উম্মাত গঠিত হতে পারে না। আর যদি তা গঠিত হয় তাহলে কিছুতেই টিকে থাকতে পারবে না। সর্বক্ষেত্রেই শক্তি অর্জনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ঈমান ও আকীদার শক্তি, প্রশিক্ষণ ও নৈতিক শক্তি, একটি উম্মাতের সংগঠন ও তাকে টিকিয়ে রাখার শক্তি এবং বাতিলের উপর প্রাধান্য বিস্তার করার জন্যে না হলেও বাতিল শক্তির আক্রমণ প্রতিহত করার উপযোগী শক্তি অর্জন করা খুবই জরুরী।

জাহেলিয়াত এবং তার প্রতিকার

এবার দেখা যাক জাহেলিয়াত ভিত্তিক সমাজ বলতে আমরা কি বুঝি এবং ইসলাম কিভাবে এ সমাজের মুকাবিলা করতে চায় ঃ

ইসলামী সমাজ বহির্ভূত সকল প্রকারের সমাজ ব্যবস্থাই জাহেলিয়াত ভিত্তিক সমাজ। আরও স্পষ্ট ভাষায় এ সমাজের সংজ্ঞা দান করতে হলে বলতে হয় যে সমাজের আকীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, ইবাদাত-বন্দেগী ও রীতিনীতি এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর সমীপে আত্মসমর্পণের ভিত্তিতে রচিত নয় সে সমাজই জাহেলিয়াতের সমাজ।

এ সংজ্ঞানুসারে বর্তমান বিশ্বে যত সমাজ রয়েছে, সবগুলোই জাহেলিয়াতের সমাজ।

কম্যুনিষ্ট সমাজ এসব জাহেলী সমাজগুলোর অন্যতম। আমাদের এ উক্তির প্রথম প্রমাণ এই যে, এ সমাজ আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব অস্বীকার করে এবং বিশ্বাস করে যে, বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে বস্তু অথবা প্রকৃতি থেকে। তারা আরও বিশ্বাস করে যে, মানুষের সকল ক্রিয়াকলাপ ও তার ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থনীতি অথবা উৎপাদনের উপায় উপাদানের দ্বারা। দ্বিতীয়ত এ সমাজের

সকল রীতিনীতি কম্যুনিষ্ট পার্টির সমীপে আত্মসমর্পণের ভিত্তিতে রচিত—আল্লাহর সমীপে নয়। দুনিয়ার সকল কম্যুনিষ্ট দেশেই কম্যুনিষ্ট পার্টির হাতে থাকে দেশের পূর্ণনিয়ন্ত্রণ ও নেতৃত্ব। তাছাড়া এ সমাজ ব্যবস্থার বাস্তব পরিণতি দাঁড়ায় এই যে, মানুষের মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে জীবজন্তুর প্রয়োজনীয়তার সমপর্যায়ে বিবেচনা করা হয়। খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, আশ্রয় এবং যৌন প্রবৃত্তির প্রয়োজনীয়তার উর্ধে মানুষের অন্য কোন প্রয়োজনীয়তার বিষয় এ সমাজে চিন্তা করা হয় না। কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থা মানুষের আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছে। অথচ মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের পার্থক্য সূচিত হয় এখান থেকেই। আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের প্রথম ধাপই হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং এ বিশ্বাস সম্পর্কে প্রকাশ্য ঘোষণা করার স্বাধীনতা। সবচেয়ে বড় কথা এই, এ সমাজ ব্যবস্থা মানুষের ব্যক্তি সত্তা বিকশিত করার স্বাধীনতা হরণ করে। মানুষের ব্যক্তি সত্তা নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করে।

এক ঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা।

দুই ঃ পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতা।

তিন ঃ যে কোন পেশায় বিশেষ দক্ষতা অর্জনের অধিকার ও সুযোগ।

চার ঃ বিভিন্ন শিল্প-কলার ভিতর দিয়ে নিজের মনোভাব প্রকাশ করার অধিকার।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর ভিতর দিয়েই মানুষ পশু ও যন্ত্রের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। কিন্তু কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থা মানুষকে এসব বিষয় থেকে বঞ্চিত করার দরুন তারা জন্তু-জানোয়ার এবং যন্ত্রের পর্যায়ে নেমে যেতে বাধ্য হয়।

পৌত্তলিক সমাজেও জাহেলিয়াতের একই রূপ। ভারত, জাপান, ফিলিপাইন ও আফ্রিকাতে এ ধরনের সমাজ রয়েছে। পৌত্তলিকতাবাদী জাহেলিয়াতের পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ তারা আল্লাহর সাথে অন্য কাল্পনিক খোদার বন্দেগী করে—কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য খোদা গ্রহণ করে নেয়।

দুই ঃ তারা নানাবিধ দেব-দেবীর পূজা-উপাসনা করার জন্যে বিস্তারিত নিয়ম-পদ্ধতি রচনা করে রেখেছে।

অনুরূপভাবে তাদের আইন-কানুন ও রীতিনীতি অর্থাৎ তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী আল্লাহ তাআলার দেয়া শরীয়াত পরিত্যাগ করে অন্যান্য উৎস থেকে

রচিত। এসব উৎসের মধ্যে রয়েছে ধর্মযাজক, জ্যোতিষী, যাদুকর, সমাজের নেতা এবং আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াতের প্রতি বিন্দুমাত্র গুরুত্ব আরোপ না করে জাতি, দল অথবা অন্য কোন বিষয়ের নামে আইন রচনা করার পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণকারী সংস্থা। অথচ আইন রচনার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা আল্লাহ তাআলার এবং একমাত্র আল্লাহর রাসূল (সা)-এর অনুসৃত পন্থায়ই এ আইন কার্যকরী করা যেতে পারে।

ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের দ্বারা গঠিত সকল সমাজই জাহেলিয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা তাদের মূল আকীদা-বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং আল্লাহর গুণাবলী থেকে কিছু অন্যান্য শক্তির উপর আরোপ করেছে। তারা আল্লাহর সাথে মানুষের বিচিত্র ধরনের সম্পর্ক কল্পনা করে থাকে। কোন কোন ব্যক্তিকে তারা আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে। পুনরায় এক আল্লাহকে তারা তিন ভাগে বিভক্ত করে ত্রিত্ববাদ সৃষ্টি করেছে। কোন কোন সময় তারা অদ্ভুতভাবে আল্লাহর পরিচয় ব্যক্ত করে, যদিও এ পরিচয় আল্লাহর আসল পরিচয় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ نِ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ج يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ط قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ ج اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○ - التوبه : ٣٠

"ইয়াহুদীরা বলে ওযায়ের আল্লাহর পুত্র। আর খৃস্টানরা বলে ঈসা আল্লাহর পুত্র। তাদের পূর্ববর্তীদের অনুকরণ করে এরা এসব ভিত্তিহীন কথা বলাবলি করে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করবেন—কিভাবে তারা বিভ্রান্ত হচ্ছে।"—আত তাওবা ঃ ৩০

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ م وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ط وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ - المائده : ٧٣

"যারা আল্লাহকে তিন জনের অন্যতম বলে, তারা অবশ্যই কুফরী করে। কারণ এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তারা যদি এসব উক্তি থেকে বিরত না হয়, তাহলে তাদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করছে তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে।"—আল মায়েদা ঃ ৭৩

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ط غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَ لُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا م بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ لا يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ط

"ইয়াহুদীরা বলে আল্লাহর হাত বাঁধা রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তাদেরই হাত বাঁধা এবং তাদের অশোভন উক্তি ও কার্যকলাপের জন্যে তারা অভিশপ্ত। আল্লাহর হাত মুক্ত এবং তিনি যেভাবে ইচ্ছা খরচ করেন।"
—আল মায়েদা ঃ ৬৪

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّاؤُهٗ ط قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ط

"ইয়াহুদী ও নাছারাগণ বলে থাকে যে, তারা আল্লাহর সন্তান ও প্রিয়পাত্র। তাদের জিজ্ঞেস কর, যদি তা-ই হয় তাহলে তোমাদের গুনাহের জন্যে তোমাদের শাস্তি দেয়া হয় কেন ? প্রকৃতপক্ষে তোমরাও আল্লাহর সৃষ্টি অন্যান্য বান্দাদেরই মত মানুষ মাত্র।"—আল মায়েদা ঃ ১৮

এসব সমাজের পূজা-উপাসনার পদ্ধতি, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার সব কিছুই তাদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস থেকে রচিত এবং এ জন্যেই এ সমাজ জাহেলী সমাজ। এগুলো এ জন্যেও জাহেলী সমাজ যে, তাদের সকল সংস্থা ও আইন-কানুন এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর সমীপে নতি স্বীকারের ভিত্তিতে রচিত হয়নি। তারা আল্লাহর আইন মানে না এবং আল্লাহর নির্দেশাবলীকে আইনের উৎস হিসেবে স্বীকার করতেও প্রস্তুত নয়। পক্ষান্তরে তারা মানুষের সমন্বয়ে গঠিত আইন পরিষদকে বিধান প্রণয়ণের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান করেছে। অথচ এ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর জন্যে সুনির্দিষ্ট। কুরআন নাযিলের যুগে যারা তাদের ধর্মযাজক ও পুরোহিতদের বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছিল, কুরআন তাদেরকে মুশরিক আখ্যা দান করেছে।

اِتَّخَذُوٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ج وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ - التوبه : ٣١

"তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের ওলামা ও পুরোহিতদের 'রব' বানিয়ে নিয়েছে এবং মরিয়ামের পুত্র মসীহকেও। অথচ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী করতে তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়নি। তিনি ব্যতীত

বন্দেগীর যোগ্য অন্য কেউ নেই। তাদের মুশরিক সুলভ রীতিনীতি থেকে আল্লাহ তাআলা সম্পূর্ণ পবিত্র।"—আত তাওবা ঃ ৩১

এসব লোকেরা তাদের ওলামা ও পুরোহিতদের খোদাও মনে করতো না এবং তাদের উপাসনাও করতো না। তবে তারা ঐ সব ধর্মযাজক ও পুরোহিতদের বিধান প্রণয়নের অধিকার দিয়েছিল এবং তাদের প্রণীত আইন-বিধান মেনে চলতো। অথচ আল্লাহ তাআলা এরূপ করার অনুমতি দেননি। তাই কুরআন সে যুগে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মুশরিক আখ্যা দান করেছে। আজও একই অবস্থা, পার্থক্য শুধু এটুকু যে আইন রচনার অধিকার ধর্মযাজক ও পুরোহিতদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নির্বাচিত আইন-পরিষদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, আইন পরিষদের সদস্যগণও ধর্মযাজকদেরই মত মানুষ মাত্র।

সর্বশেষে এটাও উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান যুগের তথাকথিত মুসলিম সমাজগুলোও জাহেলী সমাজ। তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন দেবদেবীর প্রতি ঈমান আনয়ন বা তাদের উপাসনায় লিপ্ত হয়নি। তথাপিও তাদের সমাজ জাহেলী সমাজ। কারণ তারা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর সমীপে আত্মসমর্পণের ভিত্তিতে তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী নির্ধারণ করেনি। তারা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার আইন-বিধান রচনা ও প্রবতর্নের অধিকারটিকে তাদেরই মত মানুষের হাতে অর্পণ করেছে এবং মানুষের রচিত রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, আইন-কানুন ও জীবনের মূল্যবোধ ইত্যাদি মেনে নিয়ে জীবনের প্রায় সকল দিক ও বিভাগে মানুষেরই কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছে।

শাসন ও আইন রচনা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

"যারা আল্লাহর দেয়া বিধান মুতাবিক বিচার ফায়সালা করে না তারা কাফের।"—আল মায়েদা ঃ ৪৪

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ط – النساء : ٦٠

"(হে নবী !) তুমি কি ঐসব লোকদেরকে দেখেছ যারা মুখে দাবী করে যে, তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তা সবই সত্য বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু তারা তাদের মামলা-মোকদ্দমা ও বিষয়াদি মীমাংসার জন্যে তাগুতের নিকটে পেশ করে। অথচ তাগুতকে অস্বীকার করার নির্দেশই তাদের প্রতি দেয়া হয়েছিল।"—আন নিসা ঃ ৬০

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

" না, (হে মুহাম্মাদ !) তোমার রবের কসম ! তারা কিছুতেই মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের সকল বিষয়ে তোমাকেই চূড়ান্ত মীমাংসাকারী হিসেবে গ্রহণ করে এবং তোমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ না রেখে অবনত মস্তকে তা মেনে নেয়।"

—আন নিসা ঃ ৬৫

ইতিপূর্বে আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদী ও নাসারাদের এ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং শির্ক ও কুফরের মাধ্যমে আল্লাহর বন্দেগী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার এবং ধর্মযাজক ও পুরোহিতদের খোদায়ী অধিকার প্রদানের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। আজ ইসলামের দাবীদারগণ এসব অধিকার তাদেরই মত কিছু সংখ্যক মানুষের হাতে অর্পণ করে রেখেছে। ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের মরিয়াম পুত্র ঈসা (আ)-কে 'রব' ও 'ইলাহ' বানিয়ে তাঁর বন্দেগী করাকে আল্লাহ তাআলা যেভাবে শির্ক আখ্যা দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই ধর্মযাজক ও পুরোহিতদের আইন ও বিধান রচনার অধিকার দানকেও শির্ক বলেছেন। এ উভয় ধরনের শিরকের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। উভয় ধরনের কাজই এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তাআলার বন্দেগী পরিত্যাগ, আল্লাহর দ্বীন থেকে বিচ্যুতি এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দানের পরিপন্থী।

মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে প্রকাশ্যেই ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে। দ্বীনের সাথে তাদের সম্পর্ক মোটেই নেই। আবার অনেকে দ্বীনের প্রতি বিশ্বাসী বলে মৌখিক স্বীকারোক্তি করার পর বাস্তব কর্মক্ষেত্রে দ্বীনকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে। তারা বলে যে, তারা অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস করে না। তারা নাকি বিজ্ঞানের ভিত্তিতে তাদের সমাজ জীবন রচনা করতে চায়। তাদের বিবেচনায় বিজ্ঞান ও অদৃশ্য বিষয়াবলী পরস্পর বিরোধী। বলাবাহুল্য, এসব উক্তির কারণ হচ্ছে অজ্ঞতা। একমাত্র অজ্ঞ ব্যক্তিরাই এ ধরনের উক্তি করতে পারে। কোন কোন সমাজ আইন-বিধান রচনার অধিকার আল্লাহ ছাড়া

অন্যদের হাতে তুলে দিয়েছে। ঐসব আইন প্রণেতাগণ নিজেদের খেয়াল খুশী মুতাবিক আইন রচনা করে এবং বলে, "এটাই আল্লাহর শরীয়াত।" এসব সমাজ বিভিন্ন ধরনের হলেও একটি বিষয়ে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। আর সে বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ না করা।

উপরের আলোচনায় সকল ধরনের জাহেলী সমাজ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগী পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। এক কথায় ইসলাম এসব সমাজকে অনৈসলামিক সমাজ বিবেচনা করে। উল্লেখিত সমাজগুলোর বাহ্যিক নামফলক যাই হোক না কেন, এ বিষয়ে তাদের সকলেরই আভ্যন্তরীণরূপ অভিন্ন। অর্থাৎ তারা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তাআলার সমীপে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ভিত্তিতে জীবন বিধান রচনা করেনি। এদিক থেকে তারা জাহেলী সমাজের রীতি অনুযায়ী কুফরীর পথাবলম্বী।

এবার আমরা সর্বশেষ প্রশ্নটির সম্মুখীন হচ্ছি। এ অধ্যায়ের সূচনাতেই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশ্নটি হচ্ছে, ইসলাম মানবীয় তৎপরতা ও কার্যকলাপকে কি উপায়ে পরিশুদ্ধ করে থাকে। অতীতে কিভাবে করেছে এবং নিকট ও সুদূর ভবিষ্যতে এজ্ঞজন্যে কি উপায় অবলম্বন করবে? 'মুসলিম সমাজের প্রকৃতি' শীর্ষক আলোচনায় আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত করেছি যে, এ সমাজ আল্লাহ তাআলার সমীপে পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভিত্তিতেই সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য স্থির করার পর আমাদের পক্ষে নিম্নের প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে নেয়া সহজ হয়ে যায়। প্রশ্নটি হচ্ছে, মানুষের জীবন যাত্রা প্রণালী কোন্ ভিত্তির উপর রচিত হবে? আল্লাহ তাআলার দেয়া দ্বীন ও জীবন বিধান মানুষের জন্যে কার্যোপযোগী হবে, না মানব রচিত ব্যবস্থা?

ইসলাম এ প্রশ্নের জবাবে অত্যন্ত স্পষ্ট ও জোরালো ভাষায় আমাদের জানিয়ে দেয় যে, একমাত্র আল্লাহর দ্বীন এবং তা থেকে উদ্ভূত জীবন বিধানই মানুষের জন্যে কার্যকরী ব্যবস্থা। এ দ্বীনকে গ্রহণ না করে কখনো ইসলামের প্রথম স্তম্ভ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কায়েম হতে পারে না। এবং জীবনের কোন ক্ষেত্রেই কালেমার কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। দ্বিধাহীন চিত্তে এ নীতি অবলম্বন করা এবং বিশ্বস্ততার সাথে তা মেনে চলা ব্যতীত নবীর শিক্ষা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার সমীপে পূর্ণ আত্মসমর্পণ হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

"রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর এবং তিনি যে বিষয়ে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।"—আল হাশর ঃ ৭

অধিকন্তু ইসলাম মানুষের নিকট এ প্রশ্নও তুলে ধরেছে—

أانتم اعلم ام الله "তোমরা বেশী জানো, না আল্লাহ বেশী জানেন ?" তারপর তিনি নিজেই ঐ প্রশ্নের জবাব দান প্রসঙ্গে বলেন —

وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً

অর্থাৎ "তোমাদেরকে অতি সামান্য মাত্রই জ্ঞান দান করা হয়েছে।" অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিতে হয় যে, জ্ঞানের ভান্ডার যাঁর হাতে, তিনি সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক, তিনিই মানুষের শাসনকর্তা এবং একমাত্র তারই দেয়া জীবন বিধান মানব জাতির জন্যে সঠিক জীবন বিধান হতে পারে। তাঁর নির্দেশই হবে আইন-বিধানের উৎস। মানব রচিত জীবন বিধান ও আইন-কানুন থেকেই ভাঙ্গন ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি। কারণ অসম্পূর্ণ জ্ঞানও কোন কোন ক্ষেত্রে অজ্ঞতা নিয়ে মানুষ আইন রচনা করে। তাই ঐ আইন কিছুকাল পরেই অসামঞ্জস্য ও অনুপযোগী হয়ে পড়ে। তাছাড়া, অজ্ঞতা ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান নানাবিধ জটিলতার জন্ম দেয়।

আল্লাহর দ্বীন অস্থায়ী দোদুল্যমান নীতিমালার সমষ্টি নয়। কালেমার শেষার্ধ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' (সা) বাক্যাংশের দ্বারা ইসলামী জীবন বিধানের মূলনীতিগুলোকে সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় করে দেয়া হয়েছে। মুহাম্মাদ (সা) ইসলামের যে চিত্র ও মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন, তা চিরস্থায়ী। যে বিষয়ে কুরআন অথবা রাসূল (সা) স্পষ্ট ভাষায় যে নীতি ঘোষণা করেছেন, সে বিষয়ে ঐ বর্ণিত নীতিই হবে সিদ্ধান্তের ভিত্তি। যদি কোন বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ না পাওয়া যায়, তাহলেই ইজতেহাদ (চিন্তা-গবেষণা) করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর প্রিয় রাসূল (সা)-এর দেয়া মূলনীতিগুলোর চতুসীমার ভিতরেই ইজতেহাদ করতে হবে। নিজের মর্জি মুতাবিক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না।

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ– النساء :٥٩

"যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, তাহলে বিষয়টিকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।"---আন নিসা ঃ ৫৯

ইজতেহাদ করা এবং একটি বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যশীল অপর বিষয়ে আন্দায-অনুমান করে সিদ্ধান্ত নেয়ার নিয়ম-কানুনও ঠিক করে দেয়া হয়েছে। এসব নিয়ম-কানুন অত্যন্ত স্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত। কিন্তু নিজেদের রচিত আইন-কানুনকে আল্লাহর শরীয়াত বলে ঘোষণা করার অধিকার কারো নেই। অবশ্য আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে যদি তাকেই আল্লাহর আইন ও বিধান রচনার সঙ্গত অধিকারী বলে মেনে নেয়া হয় এবং কোন জাতি, দল বা ব্যক্তিকে ঐ মর্যাদার আসনে বসানোর পরিবর্তে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ মুতাবিক আইন রচিত হয় ; তাহলে ঐ আইন বিধানকে সঙ্গতভাবেই আল্লাহর শরীয়াত বলে মান্য করতে হবে। কিন্তু ইউরোপীয় গীর্জার মত আল্লাহর নাম ব্যবহার করে নিজেদের ইচ্ছা মাফিক আইন রচনার অধিকার কারো নেই। ইসলামে গীর্জাবাদ নেই। আল্লাহর রাসূল (সা) ব্যতীত আর কোন মানুষই আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধান জারী করার ক্ষমতা প্রাপ্ত নয়।

ইসলাম ইজতেহাদের জন্যে কতিপয় শর্ত আরোপ করে সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এ সীমা লংঘন করার ক্ষমতা করোর নেই।

"জীবনের জন্যেই জীবন বিধান" কথাটিকে অনেক সময়ই অত্যন্ত ভুল অর্থে ব্যাখ্যা এবং খুবই অসঙ্গত পন্থায় ব্যবহার করা হয়। অবশ্য ইসলাম মানুষের জীবন যাপনের পথ সুগম করার জন্যে রচিত। কিন্তু কোন্ ধরনের জীবন যাপন ? ইসলামের নিজস্ব মূলনীতির ভিত্তিতে রচিত জীবন বিধান ও রীতি অনুযায়ী মানুষের জীবন যাপনের উদ্দেশ্যেই ইসলামী জীবনাদর্শ রচিত। এ জীবনাদর্শ মানব প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যশীল এবং মানুষের সকল চাহিদা পূরণে সক্ষম। কেননা মানুষের সৃষ্টিকর্তাই তাঁর সৃষ্টির চাহিদা সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত।

اَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ط وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ○ – الملك : ١٤

"যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি কি সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত নন ? তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সকল বিষয়ে অবহিত।"––আল মুল্‌ক ঃ ১৪

মানুষ নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করবে এবং ইসলাম তার ভাল মন্দ সকল কাজকেই সমর্থন যুগিয়ে যাবে ; এটা দ্বীনের কাজ নয়। দ্বীন ভাল মন্দের মানদন্ড। এ মানদন্ডের নিরিখে যা ভাল প্রমাণিত হয় তা গ্রহণযোগ্য এবং যা মন্দ প্রমাণিত হয় তা বর্জনীয়। যদি প্রতিষ্ঠিত সমাজের সম্পূর্ণ কাঠামোটিই দ্বীনের বিপরীত মতাদর্শভিত্তিক হয়, তাহলে পুরো সমাজ কাঠামো পরিবর্তন করে নতুন সমাজ গঠন করাই ইসলামের লক্ষ্য। "জীবনের জন্যেই

জীবন বিধান" কথাটির সঠিক ব্যাখ্যা তাই। অর্থাৎ জীবনকে জীবন বিধান মুতাবিক গড়ে তোলাই দ্বীন বা জীবন বিধানের উদ্দেশ্য।

এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে মানুষের কল্যাণ সাধনই কি সমস্যা সমাধানের উত্তম মানদন্ড নয় ? আমরা এ প্রশ্নের জবাবে পুনরায় ইসলামের উত্থাপিত প্রশ্ন এবং ইসলামের দেয়া জবাব উদ্ধৃত করছি। প্রশ্নটি হচ্ছে—

ءانتم اعلم ام الله

"তোমরা বেশী জ্ঞানের অধিকারী, না আল্লাহ ? জবাবটি হলো

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ

"আল্লাহই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী এবং তোমরা অজ্ঞ।"

—আলে ইমরান ঃ ৬৬

আল্লাহ তাআলা যে শরীয়াত রচনা করে দিয়েছেন এবং রাসূল (সা) যা আমাদের নিকট পৌছিয়েছেন তা মানবীয় চাহিদা পূরণ করার জন্যেই প্রণয়ন করা হয়েছে। যদি কেউ মনে করে যে, আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান মেনে চলার মধ্যে মানুষের কল্যাণ নেই বরং অবাধ্যাচরণের মধ্যে কল্যাণ নিহিত, তাহলে প্রথমত সে ব্যক্তি ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কেই বলেছেন—

اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ج وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ۝ط اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ۝ صلے فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى ۝

"তারা আন্দায-অনুমান ও আপন প্রবৃত্তি অনুসরণ করে চলে। এদিকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের নিকট জীবন বিধান এসেছে। মানুষের যা ইচ্ছা তা-ই কি তারা করবে ? অথচ দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণ তাঁরই হাতে।"—আন নাজম ঃ ২৩—২৫

দ্বিতীয়ত সে ব্যক্তির বুঝা উচিত যে, আল্লাহর শরীয়াত সম্পর্কে সে যে মনোভাব গ্রহণ করেছে তা কুফরীরই নামান্তর মাত্র। এক ব্যক্তি শরীয়াতের বিধি-নিষেধ অমান্য করার মধ্যে মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত বলে ঘোষণা করার পর কি করে দ্বীনের অনুসরণকারী হিসেবে পরিচিত হতে পারে ? শরীয়াত লংঘন করার পর কারো পক্ষেই দ্বীনদার হিসেবে পরিগণিত হবার কোন উপায় নেই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিশ্বজনীন জীবনাদর্শ

ইসলাম আল্লাহর সমীপে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের উপরই মানুষের আকীদা-বিশ্বাস ও জীবন যাত্রার ভিত্তি স্থাপন করে। তার মৌলিক চিন্তাধারা, বন্দেগীর অনুষ্ঠানাদি এবং জীবন যাপনের জন্যে রচিত সকল নিয়ম-কানুনের মধ্যে সমতা রক্ষা করেই আল্লাহর সমীপে আত্মসমর্পণের রূপ প্রকাশ পায়। কালেমায়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বাস্তব রূপ মানুষের বান্দা সুলভ চাল-চলনের ভিতর দিয়েই ফুটে উঠে। দ্বিতীয়ত, জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তারিত আইন-কানুন প্রণয়নের জন্যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করতে হয়।

কালেমার এ উভয় অংশ সম্মিলিত হয়ে ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে রচিত সমাজ কাঠামোর রূপরেখা ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই এ সমাজ কাঠামো মানব রচিত সকল সমাজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এক অতুলনীয় সমাজের জন্ম দান করে। ইসলাম প্রবর্তিত এ নতুন ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সমাজ মানব দেহসহ সমগ্র বিশ্বে বিরাজমান প্রাকৃতিক বিধানের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে যায়।

ইসলামী দৃষ্টিভংগী অনুসারে সমগ্র বিশ্ব-জগত আল্লাহরই সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা বিশ্ব সৃষ্টির ইচ্ছা করেন এবং তার ফলে বিশাল জগত অস্তিত্ব লাভ করে। তারপর তিনি সৃষ্ট জগতের জন্যে কতিপয় আইন-কানুন জারী করেন যা তারা মেনে চলতে শুরু করে। লক্ষ্যণীয় যে, সৃষ্ট জগতের বিভিন্ন অংশে প্রাকৃতিক আইন নামে পরিচিত যেসব বিধান জারী রয়েছে, সেগুলো পরস্পর সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল ও সঙ্গতিপূর্ণ।

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ○

"যখন আমরা কোন কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করি তখন শুধু বলি - হও—আর তা হয়ে যায়।"—আন নাহল ঃ ৪০

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ○ - الفرقان : ٢

"তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের প্রত্যেকের জন্যে ঠিক ঠিক স্থান নির্দেশ করে দিয়েছেন।"—আল ফুরকান ঃ ২

একটি অদৃশ্য ইচ্ছা সৃষ্ট জগতকে নিয়ন্ত্রণ করছে। একটি বিশাল শক্তি সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুকে পরিচালিত করছে। একটি সুদৃঢ় আইন এ সুপ্রশস্ত জগতকে শৃংখলার বাঁধনে বেঁধে রেখেছে। এ শক্তিই সৃষ্টির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমতা রক্ষা করে এবং চলমান বিশ্বের গতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ জন্যেই সৃষ্টির বিভিন্ন অংশের মধ্যে কখনো সংঘর্ষ হয় না। কোথাও বিশৃংখলা দেখা দেয় না, কখনো তার স্বাভাবিক গতি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় না। এবং বিশ্ব-জগতে বিরাজমান শক্তিগুলো পরস্পর থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না। স্রষ্টা যতদিন তাদেরকে এভাবে চালাবেন ততদিন তারা তাঁরই ইচ্ছা মাফিক চলবে। সমগ্র সৃষ্ট জগত স্রষ্টার অনুগত। তাঁর রচিত আইন লংঘন ও তাঁর অবাধ্যাচরণ করার কোন ক্ষমতা সৃষ্ট জগতের নেই। স্রষ্টার প্রতি অবিচল আনুগত্য ও তাঁর সমীপে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ফলেই সমগ্র সৃষ্ট জগত ভালোভাবে টিকে রয়েছে এবং কোথাও বিন্দুমাত্র বিশৃংখলা ব্যতীতই অব্যাহত গতিতে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে।

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ قف يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا لا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ط اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ط تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○ - الاعراف : ٥٤

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতিপালক যিনি ছয় দিনে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তারপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি দিনকে রাত্রির আঁধারে ঢেকে দেন এবং দিনের পেছনে রাত্রিকে আবর্তিত করান। তিনিই সূর্য, চন্দ্র ও তারকা সৃষ্টি করেছেন। সকলেই তাঁর আদেশের অনুগামী। মনে রেখো, সৃষ্টি তাঁর, সুতরাং এ সৃষ্টি তাঁরই নির্দেশে চলবে। তিনি অত্যন্ত মহান সমগ্র বিশ্বের অধিপতি ও প্রতিপালক।"

মানবদেহের জৈবিক অংশ

মানুষ এ মহান বিশ্বেরই একটি অংশ। সৃষ্ট জগত যেসব আইন-কানুন মেনে চলে, মানবদেহের জৈবিক অংশও তাই মেনে চলে। আল্লাহ তাআলাই বিশ্ব-জগত ও মানুষের স্রষ্টা। মাটি থেকেই মানুষের দেহ সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মানুষকে কতক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যার ফলে মানুষ তার সৃষ্টির মৌল উপাদান মাটির তুলনায় অনেক উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু তার দেহের জৈবিক অংশ মানুষ অন্যান্য জীবের মতই সৃষ্ট জগতের

আইন-কানুন মেনে চলে। মানুষ আল্লাহর ইচ্ছায় জন্মগ্রহণ করে, মাতা-পিতার ইচ্ছায় নয়। মাতা-পিতা পরস্পর মিলিত হতে পারে। কিন্তু একবিন্দু শুক্র থেকে মানুষের অবয়ব সৃষ্টি করার কোন ক্ষমতাই তাদের নেই। মাতৃগর্ভে মানব জীবনের সূচনা, মাতৃগর্ভে অবস্থানের মেয়াদ, ভূমিষ্ঠ হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহ যে আইন-কানুন বেঁধে দিয়েছেন তা পালন করার ভিতর দিয়েই মানুষ জন্মগ্রহণ করে। সে আল্লাহর সৃষ্ট বায়ুমণ্ডলে তাঁর নির্ধারিত পদ্ধতি ও পরিমাণ অনুসারে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। তার অনুভূতি ও বোধশক্তি লাভ, তার ব্যাথা-বেদনা ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতি এবং পানাহার ইত্যাদি সকল বিষয়েই সে আল্লাহর নির্ধারিত আইন মেনে চলতে বাধ্য। এদিক থেকে মানুষ অন্যান্য প্রাণী ও অপ্রাণী বাচক সৃষ্টির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সকলেই আল্লাহর ইচ্ছা ও বিধানের নিকট বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করেছে।

যে মহান আল্লাহ তাআলা বিশাল বিশ্ব ও মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং যিনি মানুষের জৈবিক দেহকে প্রাকৃতিক বিধানের অধীন করে সৃষ্টি করেছেন তিনিই মানুষের ব্যবহারিক জীবনের জন্যে একটি শরীয়াত রচনা করে দিয়েছেন। মানুষ যদি এ শরীয়াত মেনে চলে তাহলে তার ব্যবহারিক জীবন তার দৈহিক প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বুঝা যায় যে, ইসলামী শরীয়াত বিশ্বজনীন প্রাকৃতিক বিধানেরই একটি অংশ এবং এ প্রাকৃতিক বিধান মানুষের দেহ ও জৈবিক সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আল্লাহর প্রতিটি কথা তা আদেশ হোক বা নিষেধ, সুসংবাদ অথবা সতর্কবাণী, আইন-কানুন হোক অথবা উপদেশ, সবকিছুই বিশ্বজনীন আল্লাহর বিধানের বিভিন্ন অংশ মাত্র। এসব আইন বিধান প্রাকৃতিক আইন নামে পরিচিত এবং ঐ সদা-সক্রিয় আইন সর্বদা নিখুঁত ও কার্যকরী। সৃষ্টির সূচনা থেকে সমগ্র জগতে আমরা যে অটল ও সর্বকালোপযোগী বিধানের প্রাধান্য লক্ষ্য করে থাকি, তারই অংশ হিসেবে মানব জীবনের জন্যে রচিত শরীয়াতও সমানভাবেই অটল ও কার্যোপযোগী। সৃষ্ট জগতে বিরাজমান সাধারণ প্রাকৃতিক বিধানের সাথে পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করে মানব জীবনকে সংগঠিত করাই আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াতের লক্ষ্য।

তাই আল্লাহর শরীয়াত মেনে চলা মানুষের জন্যে অপরিহার্য। কারণ এ শরীয়াত মেনে চলার ভিতর দিয়েই মানুষের জীবনযাত্রা সৃষ্ট জগতের গতিধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। শুধু তাই নয় বরং আল্লাহর শরীয়াতই মানুষের দেহে কার্যকর প্রাকৃতিক ও জৈবিক বিধানের সাথে তার ব্যবহারিক জীবনের নৈতিক বিধানকে সঙ্গতিশীল করে দিতে পারে। মানুষের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যক্তিসত্তা শুধুমাত্র এ উপায়েই সুসংহত হতে পারে।

সৃষ্টির সকল আইন-কানুনের যথার্থতা উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এসব আইন-কানুনের ঐক্যসূত্রও তার বোধগম্য নয়। মানুষের দেহে যেসব প্রাকৃতিক বিধান কার্যকর রয়েছে এবং মানুষ এক মুহূর্তের জন্যেও যেসব জৈবিক বিধান লংঘন করতে পারে না, সেসব আইন-বিধানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যও তো সকল সময় সে বুঝে উঠতে পারে না। তাই সৃষ্ট জগতের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নিজেদের জন্যে জীবন বিধান রচনা করার সাধ্য মানুষের নেই। সে তো নিজের দেহের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রয়োজনের উপযোগী সুসামঞ্জস্য বিধান রচনা করতেও অক্ষম। এ কাজ তো সর্বোতভাবেই মানুষ ও বিশ্ব-জগতের স্রষ্টারই আয়ত্ত্বাধীন। তিনি শুধু প্রাকৃতিক জগতেরই নয়, মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সকল বিষয়ও নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিজের ইচ্ছা মুতাবিক সকলের জন্যে নিরপেক্ষ ও দোষমুক্ত আইন-বিধান রচনা ও জারী করে থাকেন।

তাই জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এবং ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করার জন্যে শরীয়াতের অধীন হওয়া অত্যন্ত জরুরী। কারণ হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রদর্শিত পন্থায় আল্লাহ তাআলার সমীপে পূর্ণ আত্মসমর্পণ ব্যতীত সত্যিকার মুসলিম হওয়া সম্ভব নয়। অন্য কথায় ইসলামের প্রথম স্তম্ভ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অংশদ্বয় মানুষের বাস্তব জীবনে রূপায়িত না হলে ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত জীবনের কোন একটি ক্ষেত্রও ইসলামের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠে না।

মানব জীবন ও প্রাকৃতিক বিধানের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন মানুষের জন্যে খুবই কল্যাণকর। মানব জীবনকে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্যে এ ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরী। নিজের সত্তায় শান্তিলাভ ও প্রাকৃতিক জগতের সাথে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান জনিত সুখ-সুবিধা অর্জন করার জন্যে প্রাকৃতিক জগতের সাথে সুসামঞ্জ্যস্য বিধান রচনা অপরিহার্য। এ একই উপায়ে মানুষ নিজের মনেও সুখ-শান্তি অনুভব করবে। কারণ তার জীবনযাত্রা, দেহের প্রাকৃতিক দাবী পূরণ করতে সক্ষম হবে। তখন দেহের জৈবিক চাহিদা ও মানুষের জীবন বিধান পরস্পর বিপরীতমুখী হবে না।

আল্লাহ তাআলার শরীয়াত মানুষের বাহ্যিক আচার-ব্যবহার ও আভ্যন্তরীণ চাহিদার মধ্যে অতি সহজেই সংগতি স্থাপন করে। মানুষ যখন প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপনে সফল হয়, তখন মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং জীবনের সাধারণ সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই সহযোগিতা ও পরিপূরক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কারণ মানুষ প্রাকৃতিক জগতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলে মানুষের জীবনযাত্রা ও প্রাকৃতিক

নিয়ম-কানুন বিশ্ব-জগতের সামগ্রিক পরিচালনা ব্যবস্থার অধীন হয়ে যায়। ফলে মানব জীবনের সমষ্টিগত দিক থেকে সামঞ্জস্যহীনতা ও পারস্পরিক বৈপরিত্য দূর হয়ে এক সুষ্ঠু ও নিখুঁত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে। মানবতা কল্যাণ ও সুখ-শান্তি লাভ করে।

এ ব্যবস্থার ফলে প্রাকৃতিক জগতের গুপ্ত রহস্য মানুষের নিকট প্রকাশ হয়ে যায়। সম্প্রসারণশীল জগতের অসংখ্য গুপ্ত শক্তি ও সম্পদ তার করায়ত্ব হয়। আল্লাহর বান্দাগণ প্রকৃতির এসব শক্তি ও সম্পদকে আল্লাহর শরীয়াতের নির্দেশানুসারে মানবজাতির কল্যাণে নিয়োগ করে। কোথাও কোন সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় না। মানুষ ও প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে কোন বৈপরিত্য থাকে না। মানুষের ব্যক্তিগত লোভ-লালসা আল্লাহর শরীয়াতের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَ هُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ط

"যদি মহাসত্য তাদের নফসের খাহেস পূর্ণ করার কাজে নিয়োজিত হতো, আকাশ, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল সৃষ্টির শৃংখলা ভেঙ্গে দিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি হতো।"—মু'মিনুন ঃ ৭১

মহাসত্য অবিভাজ্য—উপরের আলোচনা থেকে জানা গেল যে, মহাসত্য একটি পূর্ণ একক। দ্বীনের ভিত্তি এরই উপর স্থাপিত। আকাশ ও পৃথিবীর সকল ব্যবস্থাপনা মহাসত্যের ভিত্তিতেই রচিত। ইহলোক ও পরলোকের সকল বিষয়াদি মহাসত্যের নিরিখেই মীমাংসিত হবে এবং মানুষকে এ মহা সত্য সম্পর্কেই আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। সীমালংঘনকারীকে আল্লাহ্ তাআলা মহাসত্যের ন্যায়দণ্ডেই শাস্তি দিবেন এবং তিনি মহাসত্যের মানদণ্ডেই মানুষের কার্যকলাপ বিচার করে দেখবেন। বিশাল বিশ্বজগত যে আইনের বন্ধনে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত, সেই আইনেরই অপর নাম মহাসত্য। সৃষ্ট জগত ও তার মধ্যে প্রাণীবাচক বা বস্তুবাচক যা কিছু আছে, সকলেই এ মহাসত্যের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে এবং সমগ্র সৃষ্টি মহাসত্যের কঠোর বন্ধনে আবদ্ধ।

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّ اَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ○ فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَاْسَنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ ○ط لَا

تَرْكُضُوْا وَ ارْجِعُوْآ اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تُسْئَلُوْنَ ○ قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○ فَمَا زَالَتْ
تِّلْكَ دَعْوٰهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ○ وَمَا خَلَقْنَا
السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ○ لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ
لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ ق اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ○ بَلْ نَقْذِفُ
بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ط وَلَكُمُ الْوَيْلُ
مِمَّا تَصِفُوْنَ ○ وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا
يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ○ يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ
وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ○ الانبياء : ١٠-٢٠

"আমরা তোমাদের নিকট যে কিতাব প্রেরণ করেছি তার মধ্যে তোমাদেরই বিষয় উল্লেখ রয়েছে। তোমরা কি তা বুঝে দেখছ না? কত অত্যাচারী জনপদকে আমরা ধ্বংস করে দিলাম। তারপর অন্য জাতিকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করলাম! আমাদের পক্ষ থেকে আযাব যখন নেমে এসেছিল, তখন তারা ছুটে পালাতে শুরু করেছিল। (তাদের বলা হয়েছিল) পালিয়ে যেও না। নিজেদের বাড়ী ও চিত্তবিনোদনের স্থানগুলোতে ফিরে যাও। তোমাদের কৃতকর্মের হিসেব সেখানেই হবে। তারা বলল, 'হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য! অবশ্যই আমরা অপরাধী'। তারা এভাবে কাতর ভাষায় চীৎকার করে যাচ্ছিল, যতক্ষণ না আমরা তাদের ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলাম। আকাশ, পৃথিবী ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী বিষয়গুলোকে আমরা ছেলেখেলার জন্যে সৃষ্টি করিনি। যদি খেলনা তৈরী করাই আমাদের উদ্দেশ্য হতো, তাহলে (অন্যবিধ উপায়ে) খেলার সরঞ্জাম সৃষ্টি করতাম। কিন্তু আমরা মহাসত্যের আঘাত হেনে বাতিলের মস্তক চূর্ণ করে দেই। তারপর বাতিল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং তোমরা যেসব মনগড়া কথা বলে থাক সেগুলোর মধ্যেই রয়েছে তোমাদের ধ্বংসের উপকরণ। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, সবকিছুই আল্লাহর। আর তাঁর নিকট যেসব ফেরেশতা রয়েছে, তারা অহংকারের বশবর্তী হয়ে আল্লাহর বন্দেগী থেকে কখনো বিরত হয় না এবং কখনো হীনতার শিকারে পরিণত হয় না। রাতদিন তারা তাসবীহ পড়ে এবং কখনো বিন্দুমাত্র এদিক-ওদিক করে না।"—আম্বিয়া ঃ ১০—১২

সৃষ্টজগত মহাসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত

মানব প্রকৃতির গভীর অন্তস্থলে মহাসত্যের পূর্ণ অনুভূতি বিদ্যমান। মানুষের দেহ-সৌষ্ঠব ও গঠন প্রকৃতি এবং তার চারপাশে বিরাজমান বিশাল সৃষ্ট জগতের সৃষ্টি নৈপুণ্য ও উপকরণাদি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মহাজগত মহাসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। মহাসত্যই তার মূল উপাদান এবং তা একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় আইনের রূপ ধারণ করে সৃষ্টিকে স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা দান করে। এ জন্যেই সৃষ্ট জগতের কোথাও বিশৃংখলা দেখা দেয় না। এর এক অংশ অপর অংশের সাথে সংঘর্ষ বাঁধায় না। কোথাও উদ্দেশ্যহীন কোন কিছু ঘটতে দেখা যায় না। সমগ্র সৃষ্টিকে নিছক দুর্ঘটনার ফল মনে করারও কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সৃষ্টির কোন কিছুই পরিকল্পনাবিহীন নয়। অথবা এখানে বিকারগ্রস্ত মানুষের উদ্ভট কার্যকলাপের চিহ্নমাত্র পরিদৃষ্ট হয় না। বরং সৃষ্ট জগতকে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সাথে সুনির্দিষ্ট পথে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে পরিচালিত হতে দেখা যায়। মানুষ যখন তার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে লুকায়িত মহাসত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজেরই প্রকৃতির বিপরীত মুখে চলতে শুরু করে এবং স্বেচ্ছাচারী প্রবৃত্তির চাপে আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে নিজের মতামতকেই প্রাধান্য দেয়, তখনই বিপর্যয়ের সূচনা হয়। সমগ্র সৃষ্ট জগতের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে বিশ্বের প্রতিপালকের সমীপে আত্মসমর্পণ করার পরিবর্তে মানুষ যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করে ; তখনই সর্বত্র অশান্তি দেখা দেয়।

মহাসত্য থেকে বিচ্যুতির কুফল

মানুষ ও তার নিজের প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে বৈপরিত্য ও সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেলে তা ক্রমে বিস্তার লাভ করে এবং ব্যক্তি, বিভিন্ন ব্যক্তি সমষ্টি বা দল ভিন্ন ভিন্ন জাতি এবং গোত্রের মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিরোধ সৃষ্টি করে দেয়। ফলে মহাজগতের সকল শক্তি ও সম্পদ মানুষের উন্নতি ও কল্যাণে নিয়োজিত না হয়ে মানবজাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

উপরের আলোচনা থেকে জানা যায় যে, দুনিয়াতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য শুধু আখেরাতের কল্যাণ নয়। দুনিয়া ও আখেরাত দু'টি পৃথক পৃথক বস্তু নয় বরং পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত শরীয়াতে এ উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে এবং মানব জীবনকে মহাবিশ্বে বিরাজমান সুদৃঢ় আইন-বিধানের সাথে সংযুক্ত করে দেয়। মহাবিশ্বে বিরাজমান আইন বিধানের সাথে মানব জীবনের সামঞ্জস্য স্থাপিত হবার ফলে মানুষ অপরিমিত সৌভাগ্য ও কল্যাণ লাভের যোগ্যতা অর্জন করে এবং এ

সুফল শুধু আখেরাতের জন্যে মুলতবী থাকে না। বরং দুনিয়ার জীবনেও তার সুফল প্রকাশ পায়। অবশ্য ইসলামী জীবনাদর্শের সুফল প্রাপ্তি আখেরাতেই পূর্ণতা লাভ করবে।

সৃষ্ট জগত ও জগতের একটি অংশ হিসেবে মানুষ সম্পর্কে ইসলামী ধারণার মৌলিক কথা উপরে আলোচিত হলো। এ ধারণা দুনিয়ায় প্রচলিত সকল ধারণা-বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ জন্যেই সৃষ্টজগত ও মানুষ সম্পর্কিত ইসলামী ধারণা মানুষের প্রতি কতিপয় দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপ করে। অন্য কোন ধারণা ও জীবনাদর্শ এরূপ দায়িত্ব বা কতর্ব্য আরোপ করে না। ইসলামী ধারণা অনুসারে মানব জীবন ও সৃষ্ট জগতের মধ্যে এবং মানুষের প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিশ্বে বিরাজমান আইন-কানুনের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য প্রয়োজন। এ প্রয়োজনের দাবীতেই প্রাকৃতিক জগতের স্থায়ী আইন বিধান এবং মানব জীবনকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে রচিত আল্লাহর দেয়া শরীয়াতের মধ্যেও পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকা দরকার। আর আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত শরীয়াত মেনে চলার মাধ্যমেই মানুষ ঠিক ঠিকভাবে আল্লাহর বান্দা হয়ে জীবন যাপনে সক্ষম হবে এবং কোন মানুষই অন্য কারো উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে সচেষ্ট হবে না।

আমরা উপরে যে বিষয় আলোচনা করেছি তা মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) ও নমরুদের কথোপকথন থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। নমরুদ ছিল একজন অত্যাচারী শাসক। সে খোদায়ী দাবী করতো। কিন্তু সে প্রাকৃতিক জগত, মহাশূন্য, গ্রহ ও নক্ষত্রাদির উপর খোদায়ী দাবী করেনি। তার সামনে হযরত ইবরাহীম (আ) যুক্তি পেশ করেন যে, প্রাকৃতিক জগতের উপর যার নিরংকুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, মানব জীবনে শুধু তাঁরই সার্বভৌমত্ব চলতে পারে, অন্য কারো নয়। নমরুদ এ যুক্তির কোনই জবাব দিতে পারেনি।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘটনাটি নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন—

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِىْ حَآجَّ إِبْرٰهِمَ فِىْ رَبِّهٖ أَنْ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ م

إِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَ يُمِيْتُ لا قَالَ أَنَا أُحْىٖ وَ

أُمِيْتُ ط قَالَ إِبْرٰهِمُ فَإِنَّ اللّٰهَ يَأْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ

فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ

الظّٰلِمِيْنَ ۝ - البقره : ٢٥٨

"তুমি কি সে ব্যক্তির বিষয়টি ভেবে দেখেছ যে, ইবরাহীম (আ)-এর সাথে তার 'রব' সম্পর্কে এ জন্যে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে একটি রাজ্য দান করেছিলেন। ইবরাহীম (আ) যখন বলেন, "যার হাতে জীবন ও মৃত্যু তিনিই আমার 'রব" ; তখন সে ব্যক্তি বলল, "আমিই জীবন ও মৃত্যুর মালিক" ইবরাহীম (আ) তখন বললেন, "আচ্ছা আল্লাহ প্রতিদিন পূর্বদিক থেকে সূর্য উদিত করেন, তুমি পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় করে দেখাও তো!" সত্য অস্বীকারকারী ব্যক্তি তখন নিরুত্তর হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা যালিমদেরকে সহজ-সরল পথ দেখান না।"—আল বাকারা ঃ ২৫৮

আল্লাহ তাআলা পুনরায় যথার্থ রূপেই বলেছেন—

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○ - ال عمران : ٨٣

"তারা কি আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ছেড়ে অন্য কোন পথ অবলম্বন করতে চায় ? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় তাঁর আনুগত্য করে চলেছে। আর পরিণামে সকলকে তাঁর নিকট ফিরে যেতে হবে।"—আলে ইমরান ঃ ৮৩

সপ্তম অধ্যায়

ইসলামই সত্যিকার সভ্যতা

ইসলামী সমাজ ও জাহেলী সমাজের মৌলিক পার্থক্য

ইসলাম মাত্র দু'ধরনের সমাজ স্বীকার করে। একটি হচ্ছে ইসলামী সমাজ ও অপরটি জাহেলী সমাজ। যে সমাজের সার্বিক কর্তৃত্ব ইসলামের হাতে এবং মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, পূজা-উপাসনা, আইন-কানুন, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, নৈতিক চরিত্র, পারস্পরিক লেন-দেন ইত্যাদি সকল বিষয়ে ইসলামের প্রাধান্য বিদ্যমান সে সমাজই ইসলামী সমাজ। অপর দিকে যে সমাজের ব্যবহারিক ক্ষেত্র থেকে ইসলাম বর্জন করা হয়েছে এবং সেখানে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ ও বর্জনের ইসলামী মানদন্ড, ইসলামী আইন-কানুন ও রীতিনীতি, ইসলামী নৈতিকতা ও আদান-প্রদান নীতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃতি লাভ করেনি, সে সমাজই জাহেলী সমাজ।

যে সমাজ 'মুসলিম' নামধারী ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী শরীয়াতকে আইনগত মর্যাদা দান করেনি, সে সমাজ ইসলামী সমাজ নয়। সালাত, সওম, হজ্জ ও যাকাতের ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সে সমাজ ইসলামী সমাজ হতে পারে না। বরং সে সমাজের কর্ণধারগণ রাসূল (সা)-এর দেয়া আইন-কানুন পালন থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের খেয়াল-খুশী মতো ইসলামের এক নতুন সংস্করণ আবিষ্কার করে নিয়েছে এবং এর নাম দিয়েছে 'প্রগতিশীল ইসলাম'।

জাহেলী সমাজ বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকে। তবে আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকাটাই তার আসল রূপ। কোন কোন সময় সে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বই অস্বীকার করে বসে এবং মানব জাতির ইতিহাসকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ রূপে ব্যাখ্যা করে। এ মতবাদের ভিত্তিতে গঠিত সমাজ ব্যবস্থার নাম দেয়া হয় 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'।

কোন সময় জাহেলী সমাজ অন্যরূপ ধারণ করে। তারা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। তবে, তাঁর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বকে আকাশ ও উর্ধ জগতে সীমিত রেখে ধূলির ধরা থেকে তাঁর দেয়া আদেশ-নিষেধগুলো নির্বাসিত করে। এ সমাজে আল্লাহর শরীয়াত কার্যকরী হয় না। মানব জীবনের জন্যে স্বয়ং

আল্লাহ তাআলা যেসব শাশ্বত ও চিরন্তন মূল্যবোধ নির্ধারিত করে দিয়েছেন সেগুলোও এ সমাজে সমাদৃত হয় না। এ সমাজের কর্মকর্তাগণ মানুষকে মসজিদ, মন্দির ও গীর্জার চার দেয়ালের অভ্যন্তরে আল্লাহ তাআলার পূজা-উপাসনা করার অনুমতি দেয়। কিন্তু মানুষের ব্যবহারিক জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াতের প্রাধান্য স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত নয়। এদিক দিয়ে তারা ধুলির ধরায় আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিরোধী। কারণ তারা বাস্তব কর্মজীবনে আল্লাহর শরীয়াতকে বর্জন করে চলে। অথচ আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

وَهُوَ الَّذِىْ فِىْ السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ ط – الزخرف : ٨٤

"তিনি আল্লাহ, যিনি আসমানের সার্বভৌম প্রভু এবং পৃথিবীরও।"

আল্লাহ তাআলা নিম্নের আয়াতে যে সমাজকে 'দ্বীনে কাইয়্যেম' আখ্যা দিয়েছেন, উপরোল্লিখিত সমাজ সে পবিত্র সমাজ নয়।

اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ ط اَمَرَ اَلاَّ تَعْبُدُوْآ اِلاَّ اِيَّاهُ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ – يوسف : ٤٠

"আদেশ দান ও আইন জারী করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, একমাত্র তিনি ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব করা চলবে না। আর এটাই হচ্ছে 'দ্বীনে কাইয়্যেম' (সুসামঞ্জস্য ও সুদৃঢ় জীবন বিধান)।"—ইউসুফ ঃ ৪০

এ শ্রেণীর সমাজ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করার বিষয় সহস্রবার ঘোষণা করা সত্ত্বেও এবং মানুষকে মসজিদ, মন্দির ও গীর্জায় গিয়ে পূজা-উপাসনা করার অবাধ অধিকার দান করা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলী বাস্তব কর্মজীবনে বর্জন করার দরুন জাহেলী সমাজ হিসেবেই গণ্য হবে।

একমাত্র ইসলামী সমাজই সুসভ্য সমাজ

এ অধ্যায়ের শুরুতে আমরা ইসলামী সমাজের যে সংজ্ঞা উল্লেখ করেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা অসংগত হবে না যে, ইসলামী সমাজই প্রকৃত সভ্য সমাজ। জাহেলী সমাজ যে রূপই ধারণ করুক না কেন, তা মৌলিক চিন্তাধারার দিক থেকেই পশ্চাদমুখি ও সভ্যতা বর্জিত।

একদা আমি স্বরচিত একটি গ্রন্থ প্রকাশনার উদ্দেশ্যে প্রেসে দেয়ার সময় গ্রন্থটির 'সুসভ্য ইসলামী সমাজ' নাম ঘোষণা করি। কিন্তু পরবর্তী ঘোষণায় 'সুসভ্য' শব্দটি বাদ দেই এবং গ্রন্থখানির শুধু 'ইসলামী সমাজ' নামকরণ করি।

ফরাসী ভাষার জনৈক আলজিরীয় লেখক আমার বইয়ের এ নাম পরিবর্তন লক্ষ্য করেন এবং মন্তব্য করেন যে, ইসলামের স্বপক্ষে কলম ধারণকালে আত্মরক্ষামূলক মনোভাবের বশবর্তী হয়েই নাকি এ ধরনের পরিবর্তন করা হয়েছে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন—ইসলাম সম্পর্কে আমার চিন্তাধারা অপরিপক্ক থাকার দরুনই আমি বাস্তবের সম্মুখীন হতে অক্ষম। আমি উক্ত আলজিরীয় গ্রন্থকারকে ক্ষমার যোগ্য বিবেচনা করি। আমিও পূর্বে তারই মত মনোভাব পোষণ করতাম এবং প্রথম যে সময় এ বিষয়ে লিখতে শুরু করি তখন তিনি আজ যেভাবে চিন্তা করছেন, আমিও তা-ই করতাম। তিনি আজ যে জটিলতার সম্মুখীন আমি ঐ সময় এ ধরনের জটিলতাই অনুভব করছিলাম। প্রশ্ন হচ্ছে, সভ্যতার সংজ্ঞা কি ? সে সময় পর্যন্ত আমি ইসলামী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মন-মস্তিষ্ক থেকে ভ্রান্ত কৃষ্টির প্রভাব দূর করতে সক্ষম হইনি। পাশ্চাত্য লেখকদের সাহিত্য ও চিন্তাধারা আমার ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের বিপরীতমুখী হওয়া সত্ত্বেও আমার মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সভ্যতার পাশ্চাত্য সংজ্ঞাই আমার নিকট বিচারের মানদন্ড ছিল। ফলে, আমি সুষ্ঠু ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সকল বিষয়কে যাচাই করে দেখতে পারিনি।

পরবর্তীকালে আমার দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে আসে এবং আমি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করি যে, 'ইসলামী সমাজ' অর্থই হচ্ছে সভ্য সমাজ। তাই আলোচ্য পুস্তকটির নামকরণ বিষয়ে পুনর্বিবেচনাকালে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ঐ নামের মধ্যে সুসভ্য শব্দটি প্রয়োজনাতিরিক্ত। বরং ঐ শব্দটি ব্যবহার করার ফলে পাঠকগবর্গের চিন্তাধারাও পূর্ববর্তী চিন্তাধারার মত বিভ্রান্তির কবলে পতিত হবে। এখন দেখা যাক সভ্যতা শব্দটির অর্থ কি ?

কোন সমাজে যদি সার্বভৌমত্ব শুধু আল্লাহরই নিকটে অর্পিত হয় এবং এর বাস্তব প্রমাণ স্বরূপ সমাজের সকল স্তরে আল্লাহর শরীয়াতের প্রাধান্য স্বীকৃতি লাভ করে, তাহলে একমাত্র সে সমাজেই মানুষ মানুষের দাসত্ব থেকে প্রকৃত ও পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে। এ প্রকৃত ও পূর্ণ স্বাধীনতারই অপর নাম 'মানব সভ্যতা'। কেননা মানব সভ্যতা একটি মানদন্ড দাবী করে, যার আওতাধীনে প্রতিটি মানুষ পরিপূর্ণরূপে সত্যিকার আযাদী উপভোগ করতে পারে এবং বিনা বাধায় সকল মানবীয় অধিকার অর্জন করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে যে সমাজে কিছুসংখ্যক লোক 'রব' ও 'শরীয়াত রচনাকারী'র আসন দখল করে থাকে এবং অবিশিষ্ট সকল মানুষই তাদের অনুগত দাসে পরিণত হয়, সে সমাজে সাধারণ মানুষের মানব সুলভ স্বাধীনতা থাকে না এবং তারা সকল মানবীয় মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আইন প্রণয়নের বিষয়টি শুধু আইন রচনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। আজকাল অনেকেই শরীয়াত সম্পর্কে এ ধরনের সংকীর্ণ ধারণা পোষণ করেন। প্রকৃতপক্ষে ধ্যান-ধারণা জীবন যাত্রা প্রণালী, জীবনের মূল্যমান, গ্রহণ ও বর্জনের মানদন্ড, অভ্যাস ও রীতিনীত সব কিছুই আইনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। যদি একটি বিশেষ গোষ্ঠী এসব বিষয়কে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের রচিত আচার ব্যবহারের শৃংখলে সমাজের মানুষকে বন্দী করে নেয়, তাহলে এ সমাজকে স্বাধীন সমাজ বলা যেতে পারে না। এ ধরনের সমাজে তো কিছু সংখ্যক মানুষ রবুবিয়াত বা সার্বভৌম প্রভুর আসনে সমাসীন থাকে এবং অবশিষ্ট সকল মানুষ তাদের বন্দেগী বা দাসত্ব করতে বাধ্য হয়। এ জন্যে এ সমাজকে পশ্চাতপদ সমাজ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং ইসলামী পরিভাষা মুতাবিক এ সমাজই হচ্ছে প্রকৃত জাহেলী সমাজ।

একমাত্র ইসলামী সমাজেই আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মানুষ নিজেদের সমগোত্রীয়দের গোলামীর শিকল ছিন্ন করে আল্লাহর গোলামীতে নিয়োজিত হয়। আর এ পথেই মানুষ সত্যিকার আযাদীর স্বাদ গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত মর্যাদা ও সম্মান লাভ করে। সে দুনিয়াতে আল্লাহর খলিফার পদে অভিষিক্ত হয়ে ফেরেশতাদের চাইতেও অধিক গৌরব অর্জন করে।

ইসলাম ও জাহেলী সমাজের মৌলিক পার্থক্য

যে সমাজের ধ্যান-ধারণা, আকীদা-বিশ্বাস ও জীবনযাত্রা ইত্যাদি সব বিষয়ই এক আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে রচিত হয়, সে সমাজে মানুষ সর্বোচ্চ মর্যাদা ও গৌরব লাভ করে। কারণ সেখানে কোন মানুষ অপর মানুষের দাস থাকে না এবং ঐ সমাজের ধ্যান-ধারণা, আকীদা-বিশ্বাস, জীবনাযাত্রা এক বা একাধিক প্রভুত্বের দাবীদার মানুষের মন-মস্তিষ্ক প্রসুত নয়। এ ধরনের সমাজেই মানুষের সত্তা ও চিন্তায় লুক্কায়িত যোগ্যতা ও গুণাবলী পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়। পক্ষান্তরে, যে সমাজে বর্ণ, বংশ, ভাষা ও ভৌগোলিক এলাকা পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে গৃহীত হয়, সে সমাজের উল্লিখিত ঐক্যসূত্রগুলো মানবতার পায়ে নানাবিধ বিধি-নিষেধের শিকল পরিয়ে দেয় এবং এর ফলে মানুষের উচ্চতর গুণাবলী বিকাশ লাভ করার সুযোগই পায় না। বর্ণ, ভাষা ও এলাকার গন্ডী থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ জীবন যাপন করতে পারে। আত্মা ও চিন্তার বিকাশ অবরুদ্ধ হয়ে গেলে মানুষ মানবীয় মর্যাদায় বহাল থাকে না। একজন মানুষ স্বেচ্ছায় তার ধ্যান-ধারণা, আকীদা-বিশ্বাস ও জীবনযাত্রা পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু বর্ণ, বংশ, রক্ত

এবং ভৌগলিক জাতীয়তা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। মানুষ স্বেচ্ছায় বিশেষ বংশে বা এলাকায় জন্মগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগ। সুতরাং যে সমাজের স্বাধীন বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে মত ও পথ গ্রহণের অধিকার স্বীকৃত সে সমাজ সভ্য সমাজ এবং সে সমাজে বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে যাচাই-বাছাই করে সত্য পথ গ্রহণ-বর্জনের অবকাশ থাকে না, সে সমাজ পাশ্চাতপদ ও সভ্যতা বর্জিত। ইসলামী পরিভাষায় এ সমাজকে জাহেলী সমাজ বলা হয়।

একমাত্র ইসলামী সমাজই আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষকে পরস্পরের সাথে অটুট ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং ঐ আকীদা-বিশ্বাসের সূত্র ধরেই কালো ও সাদা, আরব ও গ্রীক, পারসী ও নিগ্রো এবং পৃথিবীতে বিদ্যমান শতধা বিভক্ত জাতিগুলোকে একই সারিতে দাঁড় করিয়ে একই উম্মাতে শামিল করে নেয়। এ সমাজের সর্বময় কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর এবং মানুষ শুধু তাঁরই সমীপে মাথা নত করে, অন্য কারো নিকট নয়। যে ব্যক্তির চরিত্র যত উন্নত এ সমাজে তার মর্যাদা ততই উচ্চ। আল্লাহ প্রদত্ত আইনের চোখে সমাজের সকল মানুষই সমান।

যে সমাজে মানবতাকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হয় এবং যেখানে মানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনই প্রাধান্য লাভ করে, সে সমাজই সত্যিকার অর্থে সভ্য সমাজ। অন্যান্য সমাজে প্রাধান্য লাভ করে বস্তুবাদ। অবশ্য বস্তুবাদ বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। উদাহরণ স্বরূপ ইতিহাসের মার্কসীয় ব্যাখ্যা অনুসারে বস্তুকে সর্বোচ্চ মর্যাদাদানের উল্লেখ করা যেতে পারে অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও অন্যান্য সমাজের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেখানে বস্তু-সামগ্রীর উৎপাদনের হারই মর্যাদার মানদন্ড হিসেবে স্বীকৃত। এসব সমাজে বস্তু-সামগ্রীর বধ্যভূমিতে মানবতাকে যবেহ করা হয়। এ ধরনের সমাজ অবশ্যই পশ্চাতমুখী সমাজ এবং ইসলামী পরিভাষায় জাহেলী সমাজ।

সভ্য সমাজ তথা ইসলামী সমাজ বস্তু-সামগ্রীকে তুচ্ছ জ্ঞান করে না। ইসলাম বস্তুর যথাযোগ্য মূল্যদান করতে কার্পণ্যও করে না। বস্তু-সামগ্রীর উৎপাদনের গুরুত্বও অস্বীকার করে না। বরং ইসলাম একথা স্বীকার করে যে, আমরা যে জগতে বাস করি যার দ্বারা আমাদের জীবন প্রভাবিত হয় এবং আমরাও যার উপর অনেক বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করে থাকি ; সে জগত বস্তু সমন্বয়ে গঠিত। ইসলাম একথাও স্বীকার করে যে, বস্তু-সামগ্রীর উৎপাদন আল্লাহর পার্থিব খিলাফতের মেরুদন্ড স্বরূপ। পার্থক্য শুধু এই যে, ইসলামী সমাজ মানুষের স্বাধীনতা ও মানবীয় মর্যাদা, পারস্পরিক রীতিনীতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ইত্যাদি মানবীয় বৈশিষ্ট্যগুলোকে বস্তুগত আরাম-আয়েসের

বিনিময়ে বর্জন করে বস্তু-সামগ্রীকে পূজা করার পক্ষপাতি নয়। পক্ষান্তরে জাহেলী সমাজ বস্তু-সামগ্রীর প্রাচুর্য অর্জনের খাতিরে মানবীয় মূল্যবোধ ও মান-মর্যাদা ধূলিস্মাৎ করতে কণ্ঠিত হয় না।

যে সমাজে মানবীয় মূল্যবোধ ও উন্নত মানব চরিত্রের প্রাধান্য থাকে, সে সমাজ সভ্য সমাজ। মানবীয় মূল্যবোধ ও উন্নত মানব চরিত্র অপ্রকাশ্য অথবা ব্যাখ্যার অযোগ্য বিষয় নয়। ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যাদানকারী অথবা তথাকথিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদীদের দাবী মুতাবিক মানবীয় মূল্যবোধ ও উন্নত চরিত্র উৎপাদনের উপকরণাদির সাথে সাথে পরিবর্তনশীল অথবা কোন কেন্দ্রবিন্দুর সাথে সংযোগবিহীন আদর্শ নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলামে মূল্যবোধ ও চারিত্রিক মানদন্ড মানুষের প্রকৃতির সুপ্ত গুণাবলীকে বিকশিত করে মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টেনে দেয়। ফলে মানুষ পশুর স্তর থেকে অগ্রসর হয়ে মানবতার স্তরে উপনীত হয়। জাহেলী সমাজের মত এ সমাজের মূল্যবোধ ও চারিত্রিক মান মানুষকে পশুর পর্যায়ে নামিয়ে দেয় না।

সভ্যতার প্রকৃত মানদন্ড

আমরা যদি এ দৃষ্টিভংগীতে বিষয়টিকে বিচার করি, তাহলে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যস্থলে একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা ফুটে উঠে এবং তথাকথিত প্রগতিবাদী ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদীদের অবিরাম অপচেষ্টা সত্ত্বেও নৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্ব বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় না। ইসলামী দৃষ্টিভংগী হচ্ছে এই যে, পরিবেশ ও পরিবর্তনশীল অবস্থা নৈতিক মূল্যবোধ পরিবর্তন করতে পারে না। বরং কাল ও পরিবেশের সকল পরিবর্তন অগ্রাহ্য করে নৈতিক মূল্যবোধ চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। তাই নৈতিকতাকে কৃষিভিত্তিক, শৈল্পিক, পুঁজিবাদী, সমাজতন্ত্রী, বুর্জোয়া ও প্রলিটারিয়েট নৈতিকতার নামে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিভক্ত করার কোন যৌক্তিকতা নেই। প্রকৃতপক্ষে নৈতিক মূল্যবোধ পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সমাজ উন্নয়নের স্তর ইত্যাদির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এসব পরিবর্তন খুবই অস্থায়ী ও কৃত্রিম। অপরপক্ষে আমরা অত্যন্ত বাস্তবমুখি বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মূল্যবোধ ও চারিত্রিক মান মাত্র দু'ভাগে বিভক্ত। একটি হচ্ছে মানবীয় মূল্যবোধ ও মানবসুলভ চারিত্রিক মান এবং অপরটি হচ্ছে পশুসুলভ মূল্যবোধ ও চারিত্রিক মান। ইসলামী পরিভাষায় আমরা এ দু'টিকে "ইসলামী মূল্যবোধ" ও "চারিত্রিক মান" এবং "জাহেলী মূল্যবোধ" ও "জাহেলী চারিত্রিক মান" আখ্যা দিতে পারি।

ইসলাম অবশ্যই মানবীয় মূল্যবোধ ও চারিত্রিক মানের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে মানুষকে পশুত্ব থেকে উচ্চতর মর্যাদায় পৌঁছে দেয়। যে সমাজেই

ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সেখানেই সে নৈতিক মান ও মূল্যবোধ জাগ্রত করে তার উন্নতি বিধান ও শক্তি বৃদ্ধির জন্যে যত্ন নেয়। এ সমাজ কৃষক, শ্রমিক, বেদুইন, পশুপালনকারী, শহর ও গ্রামবাসী, ধনী ও দরিদ্র, শিল্পপতি ও পুঁজিপতি নির্বিশেষে সকল ধরনের সমাজে একই চারিত্রিক মান ও মানবীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করে এবং সকল অবস্থায় ও সকল পরিবেশে মানুষের মানবসুলভ বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীকে বিকশিত করে তোলে, যেন কখনো মানুষের মধ্যে পশুসুলভ চরিত্রের উন্মেষ না হয়। আমরা উপরে যে মানবীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক চরিত্রের উল্লেখ করেছি, তা মানুষকে পশুর স্তর থেকে উপরের দিকে উন্নীত করে এবং এ মূল্যবোধের সীমারেখাই মানুষকে সগৌরবে মনুষত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। মূল্যবোধ ও চারিত্রিক মানদন্ডের এ সীমারেখা মুছে গেলে মানুষের পতন শুরু হয় এবং মানবতার স্তর থেকে অধপতিত এ সমাজের সামগ্রীর প্রাচুর্য ও উন্নতি থাকা সত্ত্বেও তাকে সভ্যতা বলা যায় না। বরং এটা পতনশীল ও পশ্চাদমুখী অথবা জাহেলী সমাজ হিসেবেই পরিগণিত হবে।

সভ্যতার বিকাশে পারিবারিক ব্যবহারের গুরুত্ব

যদি পরিবারকে সমাজের ভিত্তি বিবেচনা করা হয়, জন্মগত বৈশিষ্ট্য ও স্বাভাবিক যোগ্যতানুসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক দায়িত্ব বন্টন করা হয় এবং সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও প্রশিক্ষণ পরিবারের লক্ষ্য হয়, তাহলে এ সমাজকে নিসন্দেহে সভ্য সমাজ গণ্য করা হবে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার উল্লেখিত ধরনের পারিবারিক পরিবেশ পরবর্তী বংশধরের মধ্যে মানবীয় মূল্যবোধ ও উন্নত মানের চরিত্র সৃষ্টি করে এ ধরনের পারিবারিক ব্যবস্থা ব্যতীত এ মূল্যবোধ ও চরিত্র সৃষ্টির কোন ক্ষেত্র নেই। পক্ষান্তরে অবাধ যৌনমিলন ও অবৈধ সন্তানই যদি সমাজের ভিত্তি রচনা করে এবং দৈহিক চাহিদা, যৌনক্ষুধা এবং পশুসুলভ উত্তেজনাই যদি নর-নারীর সম্পর্ক নির্ধারণ করে, যদি জন্মগত বৈশিষ্ট্য ও স্বাভাবিক যোগ্যতার নিরিখে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক দায়িত্ব বন্টন করা না হয়, যৌন আবেদন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নিজেকে পর পুরুষের নিকট আকর্ষণীয় করে তোলাই যদি নারী জাতির ভূমিকা হয়, নারী জাতি যদি সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে এবং স্বেচ্ছায় অথবা সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে যদি নারী বিমানবালা, জাহাজের সেবিকা ও হোটেলের পরিচারিকা রূপে বস্তু সম্পদ বৃদ্ধির কাজে নিজের যোগ্যতা নিয়োজিত করে এবং মানুষের বংশ বৃদ্ধির তুলনায় সম্পদ বৃদ্ধিকেই

অধিকতর লাভ ও সম্মানজনক বিবেচনা করে, তাহলে সে সমাজ জাহেলী সমাজ।

পারিবারিক প্রথা ও দাম্পত্য সম্পর্কের প্রকৃতি থেকেই বিশেষ কোন সমাজ সভ্য কিনা, তা নির্ণয় করা যায়। যে সমাজে এ সম্পর্কে নিছক দৈহিক চাহিদা ও পশু প্রকৃতির দাবী পূরণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে রাখা হয় সে সমাজ শিল্প ও বিজ্ঞানে যতই উন্নতি সাধন করুক না কেন সভ্য সমাজ বলে বিবেচিত হতে পারে না। যেকোন সমাজের সামগ্রিক উন্নতি ও অবনতি বিচার করার জন্যে সে সমাজের পারিবারিক প্রথাই নির্ভুল চিত্র পেশ করে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার নমুনা

বর্তমান যুগের সকল জাহেলী সমাজেই মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী নৈতিক গুণাবলী পরিত্যাগ করা হয়েছে। এসব সমাজে অবৈধ ও যৌন সম্পর্ক এমন কি সম মৈথুনকেও চরিত্রহীনতা বিবেচনা করা হয় না। নৈতিকতাকে অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। কারণ এ দু'টি ক্ষেত্রে সরকারী স্বার্থে নৈতিকতা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ ক্রীশ্চিয়ান কিলার ও বৃটিশ মন্ত্রী প্রফুমোর যৌন কেলেংকারীর বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। বৃটিশ সমাজ যৌন অপরাধ হিসেবে বিষয়টিকে লজ্জাষ্কর বিবেচনা করেনি। ক্রীশ্চিয়ান কিলার বৃটিশ মন্ত্রী প্রফুমো ছাড়াও রুশীয় দূতাবাসের জনৈক নৌবাহিনীর কর্মকর্তার সাথে একই সময় যৌন সম্পর্ক স্থাপন করায় রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকেই নিন্দনীয় বিবেচনা করা হয়। যৌন কেলেংকারী বিষয়টিকে মোটেই অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়নি। সবচাইতে জঘন্য ব্যাপার এই যে, মন্ত্রীমহোদয় বৃটিশ পার্লামেন্টে মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং পরে তার ঐ মিথ্যা উক্তি প্রকাশ হয়ে যায়। আমেরিকার সিনেটেও এ ধরনের কেলেংকারী হতে শোনা যায়। বৃটিশ বা আমেরিকান নাগরিকদের মধ্য থেকে যারা উল্লেখিত ধরনের গুপ্তচর বৃত্তি সম্পর্কিত কেলেংকারীর সাথে জড়িয়ে পড়ে ; তারা রাশিয়াতে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করে। সেখানেও যৌন অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় দানে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় না।

নিকট ও দূরের সকল জাহেলী সমাজের লেখক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও গল্প লেখক অবিবাহিত হোক কিংবা বিবাহিত সকলেই প্রকাশ্যে অবাধে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের পরামর্শ দেয় এবং এ বিষয়টিকে নৈতিক অপরাধ নয় বলে অভিমত প্রকাশ করে। হ্যাঁ, তাদের বিবেচনায় যদি কোন যুবক বা যুবতী

সত্যিকার আন্তরিক ভালবাসা ছাড়াই পরস্পরের সাথে মিলিত হয়, তবে তা অপরাধ। কোন স্ত্রীর অন্তরে স্বামীর জন্যে কোন ভালবাসা না থাকা সত্ত্বেও যদি সে নিজের সম্ভ্রম ও সতীত্বের হেফাযত করতে থাকে, তাহলে সে সমাজে এ মহিলা নিন্দনীয়। বরং এ অবস্থায় অন্য কোন প্রেমিক খুঁজে নেয়াই প্রশংসনীয়। এ পন্থা অবলম্বনের পক্ষে ডজন ডজন গল্প লেখা হয়। সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, সাধারণ প্রবন্ধ, ভাবগম্ভীর ও হালকা ফিচার এবং কার্টুনাদির মাধ্যমে নোংরা ও নির্লজ্জ জীবন যাত্রার প্রতি আহবান জানানো হয়।

মানবীয় দৃষ্টিভংগীর বিচারে এবং মানবতার ক্রমবিকাশের মানদন্ড অনুসারে উল্লেখিত ধরনের সমাজ পশ্চাদমুখী এবং সভ্যতা বিবর্জিত সমাজ।

মানুষের উন্নতির ধারা পশু প্রবৃত্তির পর্যায় থেকে উর্ধগামী হয়ে উচ্চ মূল্যবোধের দিকে পরিচালিত হয়। মানুষের স্বভাবে যে পশু প্রবৃত্তি রয়েছে, তার আকাংখা নিবৃত্ত করার জন্যে উন্নয়নশীল সমাজ পারিবারিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। এ ব্যবস্থার ফলে দেহের জৈবিক চাহিদা পূরণের সাথে সাথে ভবিষ্যত বংশধরদের লালন-পালন ও পূর্ণ মানবসুলভ বৈশিষ্ট্য সহকারে তাদের গড়ে তোলার জন্যে প্রশিক্ষণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। মানব সভ্যতা এভাবেই টিকে থাকতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই যে সমাজ মানুষের পশু প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সাথে মানবীয় বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিকাশ লাভ করার পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা দানে আগ্রহী সে সমাজকে পারিবারিক পবিত্রতা ও শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্যে উপযুক্ত পরিমাণে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরিবারকে দৈহিক উত্তেজনার প্রভাব মুক্ত হয়ে তার মৌলিক কর্তব্য পালনের সুযোগ দান করার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। অপরপক্ষে যে সমাজে নৈতিকতা বিরোধী শিক্ষা ও বিষাক্ত পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বিরাজমান এবং যেখানে যৌন উচ্ছৃংখলতাকে নৈতিক মূল্যবোধের বহির্ভূত বিবেচনা করা হয়, সে সমাজে মনুষ্যত্ব গড়ে উঠার সুযোগ কোথায়?

তাই একমাত্র ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতা, ইসলামী শিক্ষা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাই মানব সমাজের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা। মানব সমাজের উন্নয়নের জন্যে গৃহীত স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় ও সঠিক পদক্ষেপের মাধ্যমে এ সত্য স্বীকৃতি লাভ করে যে, ইসলামী সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যতা এবং ইসলামী সমাজই হচ্ছে সত্যিকার সভ্য সমাজ।

আল্লাহপোরস্ত সভ্যতা ও বৈষয়িক উন্নতি

মানুষ যখন পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত কায়েম করে তখন খিলাফতেরই দাবী অনুসারে নিজেকে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বে উৎসর্গ করে দেয় এবং

আল্লাহ্ ছাড়া অপর সকল শক্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে নেয়। সে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধান বাস্তবায়িত এবং মানব রচিত সকল জীবনাদর্শকে পরিত্যাগ করে আল্লাহর শরীয়াত মেনে চলে এবং অপর সকল প্রকারের আইন পরিত্যাগ করে। আল্লাহর নির্ধারিত মূল্যবোধ ও চারিত্রিক মানদন্ড গ্রহণ এবং অপর সকল মানদন্ড মেনে নিতে অস্বীকার করে। খিলাফতে-ইলাহীয়া প্রতিষ্ঠার ফলে একদিকে মানুষের চালচলনের উপরোক্ত ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়। অপর দিকে সে সৃষ্টি জগতে নিয়ন্ত্রণকারী আইন-বিধানগুলোর রসহস্যোদঘাটনের জন্যে চিন্তা-গবেষণায় নিয়োজিত হয়। এ গবেষণালব্ধ ফলাফলগুলোকে সে আল্লাহ্ তাআলারই দেয়া বিধি-নিষেধের আওতায় রেখে মানব জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করে। আল্লাহর খলীফা হিসেবে সে সৃষ্টি থেকে খাদ্য সম্ভার ও শিল্প-কারখানার জন্যে কাঁচামাল সংগ্রহ করে এবং তার কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন কাজে অগ্রসর হয়। মানুষ যখন বৈষয়িক উন্নতির জন্যে প্রয়োজনীয় সকল কাজই আল্লাহভীরু অন্তর নিয়ে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সম্পন্ন করে এবং যখন সে নৈতিক ও বৈষয়িক সকল কাজেই আল্লাহ্ তাআলার বিধি-নিষেধ সম্পর্কে সজাগ থাকে, তখনই মানুষ পরিপূর্ণরূপে সভ্য হয়। তাদের সমাজ সভ্যতার উচ্চতম শিখরে পৌঁছে যায়। ইসলাম নিছক বৈষয়িক উন্নতিকে সভ্যতা বিবেচনা করে না। কারণ জাহেলী সমাজও বৈষয়িক উন্নতি লাভ করে থাকে। কুরআনের বহু স্থানে এ ধরনের সমাজকে বৈষয়িক উন্নতি সত্ত্বেও জাহেলী সমাজ আখ্যা দান করা হয়েছে।

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ○ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ○ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ○ فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ○ وَاتَّقُوْا الَّذِيْٓ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ○ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ○ وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ○ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○ - الشعراء : ١٢٨-١٣٥

“তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা প্রত্যেক উঁচু স্থানে নিছক স্মৃতির নিদর্শনস্বরূপ বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ কর। তোমাদের নির্মিত বিশাল প্রাসাদ দেখে মনে হয় তোমরা দুনিয়ায় চিরকাল থাকবে। যখনই কারো উপর হস্ত প্রসারিত কর, অত্যাচারী হয়েই হস্তক্ষেপ কর। আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। যিনি তোমাদের জ্ঞাতসূত্রেই অনেক কিছু

দান করেছেন, তাঁকে ভয় করে জীবন যাপন কর। তিনি তোমাদের পশুপালন, সন্তান-সন্ততি, বাগ-বাগিচা ও প্রস্রবণ দান করেছেন। আমি তোমাদের উপর এক ভয়ানক দিনের আযাবের আশংকা করছি।"

أَتُتْرَكُوْنَ فِىْ مَا هٰهُنَآ اٰمِنِيْنَ ○ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ○ وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ○ وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ○ فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ○ وَلاَ تُطِيْعُوْا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ○ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُوْنَ ○ -الشعراء : ١٤٦-١٥٢

"তোমরা কি কি পার্থিব দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে চিরকাল সুখে বসবাস করতে পারবে বলে মনে কর, এসব বাগান ও প্রস্রবণে ? এসব ফসলের জমি ও রস ভরা খেজুর বাগানে ? তোমরা পাহাড় খোদাই করে অহংকারের প্রতীক বিশালাকৃতির বাড়ি-ঘর তৈরী কর। আল্লাহকে ভয় কর এবং আনুগত্য কর। যারা পৃথিবীতে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং শান্তি ও শৃংখলা স্থাপন করে না, তাদের অনুগত হয়ে জীবন যাপন করো না।"

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ ط حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ○ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ط وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ -الانعام : ٤٤-٤٥

"তাদের যেসব নসিহত করা হয়েছিল, তা যখন তারা ভুলে গেল, তখন আমি তাদের জন্যে স্বাচ্ছন্দ্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলাম। তারা যখন আমার দেয়া পার্থিব প্রাচুর্যের আনন্দে বিভোর ছিল, তখন হঠাৎ তাদের পাকড়াও করি। তারা তখন সকল বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেল। এভাবে আমরা অত্যাচারী জাতির মূলোৎপাটন করেছিলাম। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলারই প্রাপ্য।"—আনআম ঃ ৪৪-৪৫

حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَا لا اَتٰهَآ اَمْرُنَا لَيْلاً اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ط - يونس : ٢٤

"যে সময় পৃথিবী ফুলে-ফলে সুশোভিত ও চাষের জমি শস্য ভারাক্রান্ত ছিল এবং জমির মালিকগণ ঐ শস্য থেকে লাভবান হবে বলে বিশ্বাস পোষণ করছিল, ঠিক সে সময় অতর্কিত রাত্রিকালে অথবা দিনমানে আমার নির্দেশ পৌঁছে গেল। আমি তাদের এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিলাম যে, তাদের অস্তিত্বের কোন নিদর্শনই বাকী রইল না।"—ইউনুস ঃ ২৪

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি ইসলাম বৈষয়িক উন্নতি ও দ্রব্য সামগ্রীর আবিষ্কার ও সংগ্রহের বিরোধী নয় বরং আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের অধীনে বৈষয়িক উন্নতি সাধনকে আল্লাহর নেয়ামত বলা হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলাই তাঁর আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর পুরস্কারস্বরূপ মানুষকে ঐ নেয়ামতের শুভ সংবাদও প্রদান করেন।

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۙ يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۙ وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ٥ - نوح :١٠-١٢

"(হযরত নূহ বললেন,) আমি আমার জাতিকে বললাম, এস পরওয়ারদিগারের নিকট ক্ষমা চাও—নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্যে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন। তিনি তোমাদেরকে বাগ-বাগিচা দান করবেন এবং তোমাদের জন্যে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত করবেন।"
—নূহ ঃ ১০—১২

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَلاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○- الاعراف : ٩٦

"যদি জনপদের অধিবাসীগণ ঈমান আনয়ন করতো এবং আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে চলতো, তাহলে আমরা তাদের জন্যে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে সকল কল্যাণের পথ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। তাই আমি তাদের অপকর্মের শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে পাকড়াও করলাম।"—আরাফ ঃ ৯৬

শুধু বৈষয়িক উন্নতি মানব সমাজের মান নির্ণয়ক নয়। যেসব ধ্যান-ধারণাকে ভিত্তি করে বৈষয়িক ও শৈল্পিক উন্নয়নের বিশাল প্রাসাদ নির্মিত হয়,

জীবনের যেসব মূল্যবোধ সমাজকে গ্রথিত করে রাখে এবং সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজের চাল-চলন ও রীতিনীতির ভিতর দিয়ে মানব সভ্যতার যে ছাপ পরিস্ফুট হয়ে উঠে, সেগুলোই প্রকৃতপক্ষে সমাজের মান নির্ধারণ করে থাকে।

ইসলামী সমাজের ক্রমবিকাশ

একটি আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী সমাজের অস্তিত্ব লাভ এবং একটি উত্তম জীবন বিধানের রূপ ধারণের ফলে এ সমাজ নজীরবিহীন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। তাই জাহেলী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে যে দৃষ্টিভংগী, মনোভাব ও কর্মসূচীর প্রয়োজন হয়, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তা কিছুতেই ফলপ্রদ হতে পারে না। দীর্ঘকাল ব্যাপী প্রাণান্তকর সংগ্রামের ফলে ইসলামী সমাজের জন্ম হয়। এ সংগ্রাম পরিচালনার রীতিনীতিও ইসলামেরই সীমারেখার দ্বারা পরিবেষ্টিত। এ সংগ্রামী আন্দোলনই সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদা নিরূপণ করে এবং তার যথার্থ মূল্যায়ণের পর সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য স্থির করে দেয়। যে আন্দোলনের গর্ভ থেকে ইসলামী সমাজ জন্মলাভ করে, সে আন্দোলনের ভাবধারা ও কর্মসূচী পার্থিব জগত বর্হিভূত ও মানবীয় শক্তি সীমার উর্ধে অবস্থানরত উৎস থেকে রচিত হয়। এ সংগ্রামী আন্দোলনের উৎস হচ্ছে মানুষের প্রতি আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ ঈমান বা বিশ্বাস। এ ঈমান সৃষ্ট জগত মানব জীবন, মানুষের ইতিহাস, জীবনের মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণা জন্মায় এবং এ ধারণা মুতাবিক জীবন যাপনের উপযোগী জীবন ব্যবস্থাও প্রদান করে। মোদ্দাকথা মানুষের মন-মগয অথবা বস্তু জগত ইসলামী আন্দোলনের প্রেরণা যোগানোর উৎস নয়। আমরা উপরে উল্লেখ করেছি যে, এ আন্দোলনের উৎসমূল মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বস্তু জগতের উর্ধে। ইসলামী সমাজ গঠনের প্রধান বৈশিষ্টই হচ্ছে উর্ধ জগত থেকে অবতীর্ণ ঈমান।

উর্ধজগত থেকে অবতীর্ণ আকীদা-বিশ্বাস মানুষের চিন্তা-গবেষণা অথবা চেষ্টা-তদবিরের ফলে আসে না। ঐশী বাণী থেকে প্রাপ্ত ঈমান ইসলামী আন্দোলনের বীজ বপন করে এবং সাথে সাথে সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে মানুষ তৈরী করে। ঈমানের ঐশী বাণী যার নিকটে পৌছে যায় এবং যিনি এ বাণীকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বলে বিশ্বাস করেন, তার মাধ্যমেই বীজ বপনের কাজ শুরু হয়ে যায়। এ ব্যক্তি তাঁর ঈমান অন্তরে চেপে নিষ্ক্রিয় বসে থাকেন না। বরং যে বাণীর প্রতি তিনি ঈমান আনয়ন করেছেন তা অন্যের নিকট পৌছানোর জন্যে চেষ্টা-তদবির শুরু করেন। ঈমানের প্রকৃতিই এরূপ। একটি বলিষ্ঠ ও সক্রিয় আন্দোলনের প্রকৃতিই গতিশীল। উর্ধজগত থেকে যে শক্তিমান সত্তা মানুষের অন্তরে ঈমানের আলো জ্বালিয়ে দেন, তিনি ভালভাবেই

জানেন যে, ঈমানের আলো অন্তরের গন্ডীতে আবদ্ধ হয়ে থাকে না বরং তা মশাল হয়ে বিশাল পৃথিবীর সর্বত্র আলোক রশ্মি ছড়িয়ে দেয়।

ঈমানদারদের সংখ্যা যখন তিনজন হয়ে যায় তখন এ ঈমানই তাদের বলে, "এখন তোমরা একটি সমাজে পরিণত হয়েছ এবং এ সমাজ একটি বৈশিষ্ট্যময় ইসলামী সমাজ। প্রচলিত জাহেলী সমাজ থেকে তোমাদের সমাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। কারণ জাহেলী সমাজ তোমাদের ঈমান মুতাবিক পরিচালিত হচ্ছে না।" তিনজন ঈমানদার সংগঠিত হয়ে যাবার পর ইসলামী সমাজের একটি বাস্তব নমুনা পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

তিনজন থেকে ঈমানদারদের সংখ্যা দশজনে, দশজন থেকে একশতে, একশত থেকে হাজারে এবং হাজার থেকে কয়েক হাজারে পৌঁছে যায় এবং এভাবেই ইসলামী সমাজ ক্রমশ সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠে।

ইতিমধ্যেই জাহেলী সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। বিবদমান পক্ষ দু'টোর মধ্যে একদিকে থাকে নবগঠিত ইসলামী সংগঠন। ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ, সভ্যতার মানদন্ড, সাংগঠনিক কাঠামো ইত্যাদি সহকারে একটি ছোট্ট সদ্যজাত সমাজ জাহেলী সমাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। অপরপক্ষে জাহেলী সমাজ এ নবজাত সমাজের পথ রোধ করে দাঁড়ায় এবং উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ চলাকালে জাহেলী সমাজ থেকে একজন দু'জন করে লোক ইসলামী সমাজে যোগদান করে। আন্দোলনের সূচনা থেকে শুরু করে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ইসলামী সমাজ তার প্রতিটি ব্যক্তিকে যাচাই করে নেয় এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ইসলামী মানদন্ড যে ব্যক্তি যে মর্যাদা ও দায়িত্ব বহনের যোগ্য, তাকে সে মর্যাদা ও দায়িত্ব দান করে। ইসলামী সমাজ প্রয়োজনের তাকিদেই মানুষের যোগ্যতা, কর্মশক্তি, মর্যাদা ইত্যাদি যাচাই করে নেয়। কোন ব্যক্তির পক্ষেই অগ্রসর হয়ে নিজের যোগ্যতা ও মর্যাদার দাবী পেশ করার প্রয়োজন হয় না। বরং ব্যক্তির আকীদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধ তাকে সমাজের সন্ধানী দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য করে। কারণ তার সমাজ সর্বদা দায়িত্ব অর্পণের জন্যে যোগ্য লোক অনুসন্ধান করে। ওদিকে ব্যক্তি নিজেকে অপরের তুলনায় যোগ্যতর বিবেচনা করে না। তাই লুকিয়ে থাকাই পসন্দ করে।

কিন্তু ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে যে সমাজের জন্ম, সে সমাজে কারো পক্ষে নিজের যোগ্যতা গোপন করে রাখা সম্ভব নয়। এ সমাজের প্রতিটি সদস্যকে সক্রিয় হতে হবে। তার আকীদা-বিশ্বাসে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যাবে। তার শরীরের রক্ত হবে উত্তপ্ত। তাই ইসলামী সমাজ

কর্মপ্রেরণায় সর্বদা কর্মতৎপর হবে এবং সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছার জন্য প্রতিটি ব্যক্তি নিজের যথাসর্বস্ব সংগ্রামের পথে ঢেলে দেবে। ইসলামী সংগঠনের চারিদিকে বিরাজমান জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে জারীকৃত সংগ্রাম পূর্ণ গতিতে এগিয়ে যাবে। এ সংগ্রামের বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, নেই বাতিলের সাথে কোন আপোষ রফা। তাই আল্লাহর রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন, "জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।"

উত্থান পতনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলার পথে প্রতিটি ব্যক্তির মর্যাদা নিরুপিত হয়ে যায় এবং সংগ্রাম চলাকালে প্রত্যেকের নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ভিতর দিয়েই আন্দোলন সফলতা অর্জন করে। ইসলামী সমাজের দু'টো বৈশিষ্ট্য, যথা আন্দোলনের সূচনা ও সংগঠন পদ্ধতি, এ সমাজের গঠন, আকৃতি-প্রকৃতি, রীতিনীতি ও কর্মসূচীকে অন্যান্য সকল অনৈসলামিক সমাজ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মর্যাদায় পৌঁছে দেয়। তাই অন্যান্য মতবাদের দৃষ্টিভংগীতে যাচাই করে যেমন ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যাবে না, তেমনি অনৈসলামিক আন্দোলনের রীতিনীতি ধার করে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নয়।

ইসলামী সভ্যতা সমগ্র মানবতার সম্পদ

আমরা উপরে ইসলামী সভ্যতার যে সংজ্ঞা উল্লেখ করেছি, সে সংজ্ঞানুসারে ইসলাম অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত একটি বিশেষ যুগের মতবাদ নয়। বরং ইসলামী সভ্যতা আধুনিক যুগের দাবী ও ভবিষ্যতের জন্যে আশার আলো। এ আদর্শ সকল যুগের জন্যেই এসেছে। মানুষ আজও যেমন ইসলামী আদর্শের সংস্পর্শে অশেষ কল্যাণ লাভ করতে পারে, তেমনি ভবিষ্যতেও পারবে। আর আজকের দুনিয়াকে শুধু ইসলামী আদর্শই জাহেলিয়াতের নিরেট অন্ধকার গুহা থেকে উদ্ধার করতে পারে। শিল্প-বিজ্ঞান ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে উন্নত জাতিগুলো যেমন ইসলামী আদর্শ থেকে কল্যাণ লাভ করতে পারে, তেমনি পারে দুর্বল ও দরিদ্র জাতিগুলো।

উপরে আমরা যে মূল্যবোধের উল্লেখ করেছি তা একমাত্র ইসলামী সভ্যতার যুগেই মানব সমাজে রূপ লাভ করেছিল। তাছাড়া আর কোন কালেই হয়নি। যে সভ্যতায় মানবীয় মূল্যবোধ পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করে, আমরা সে সভ্যতাকেই ইসলামী সভ্যতা বলে জানি। কিন্তু যে সভ্যতায় শুধু শিল্প বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং মানবীয় মূল্যবোধ হ্রাস পায় সে সভ্যতাকে ইসলামী সভ্যতা আখ্যা দেয়া যেতে পারে না। ইসলামী মূল্যবোধ কাল্পনিক বিষয় নয় বরং অত্যন্ত বাস্তব। মানুষ যখনই

ইসলামী শিক্ষার আলোকে মূল্যবোধ অর্জন করার জন্যে সঠিকভাবে চেষ্টা করবে ; শুধু তখনই এ সম্পদ লাভ করবে। পরিবেশ যাই হোক না কেন এবং শিল্প ও বিজ্ঞানে উন্নতিশীল সমাজ উন্নতির যে স্তরেই অবস্থান করুক না কেন, উল্লেখিত মূল্যবোধ অর্জনের প্রচেষ্টা তার উন্নয়নের গতি বিন্দুমাত্র হ্রাস করে না। কারণ মানবীয় মূল্যবোধ উন্নয়নের বিরোধী নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম বৈষয়িক উন্নতি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা-গবেষণার প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে। কারণ বৈষয়িক উন্নতি খিলাফতের দায়িত্ব পালনে সহায়ক।

অনুরূপভাবেই যেসব দেশ শিল্প ও বিজ্ঞানে অনগ্রসর সেসব দেশে উল্লেখিত মূল্যবোধ মানুষের নিশ্চেষ্ট বসে থাকা পসন্দ করে না বরং শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর জন্যে তাদেরকে উৎসাহিত করে। মানবীয় মূল্যবোধ সহকারে ইসলামী সভ্যতা সকল প্রকারের অর্থনৈতিক পরিবেশেই বাস্তবে রূপ লাভ করতে পারে।

ইসলামী সমাজের জীবন যাত্রা প্রণালী ও বাণিজ্যিক আকার-আকৃতি যুগ ও পরিবেশ অনুসারে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু ইসলামী সভ্যতার গোড়ায় যে মূল্যবোধ রয়েছে তা স্থায়ী, অটল, অপরিবর্তনীয় ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা যখন মূল্যবোধকে 'ঐতিহাসিক বাস্তবতা' আখ্যা দেই তখন তার অর্থ দাঁড়ায়, ইতিহাসের এমন একটি অধ্যায় যে অধ্যায়ে ইসলামী মূল্যবোধ মানব সমাজে রূপ লাভ করেছিল। ইতিহাসের পাঠক মাত্রই এসব মূল্যবোধ সম্পর্কে অবগত। এ মূল্যবোধ ইতিহাসের সৃষ্টি নয় বরং ইতিহাস এ মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ইসলামী মূল্যবোধ প্রকৃতিগত কারণেই কোন বিশেষ যুগ বা পরিবেশে সীমিত হতে পারে না। এ মূল্যমান ও মূল্যবোধ মানুষের মন-মস্তিষ্ক অথবা প্রাকৃতিক জগতে রচিত হয়নি। বরং সকল যুগ ও সকল পরিবেশে মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে ঊর্ধজগত থেকে রচিত।

ইসলামী সভ্যতা বৈষয়িক ও সাংগঠনিক কাঠামোর দিক থেকে বিভিন্ন বাহ্যিক রূপ ধারণ করতে পারে। কিন্তু তার মূলনীতি ও মূল্যমান শাশ্বত ও চিরন্তন। এগুলো হচ্ছে আল্লাহর বন্দেগী, তৌহিদের ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন, বস্তুসামগ্রীর উপর মানবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, মানবীয় মূল্যবোধের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে পশুত্ব দমন, পারিবারিক ব্যবস্থার যথাযোগ্য মর্যাদা দান। আল্লাহ তাআলারই নির্দেশ মুতাবিক পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠা এবং তারই শরীয়াত মুতাবিক খিলাফতের সকল কার্য পরিচালনা করা।

উপরেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামী সভ্যতা বৈষয়িক সংগঠনের জন্যে যোগ্যতা ও কর্মশক্তিকে ব্যবহার করে। তাই স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় মূল্যমান বহাল রাখার পরও ইসলামী সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত সমাজের শিল্প, বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রক্ষার জন্যে ইসলামী সভ্যতার বাহ্যিক ধরন-ধারণে কিছুটা রদবদল হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। এ পরিবর্তনশীলতাও ইসলামের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত। বাইরের কোন মতাদর্শ থেকে তা ধার করা হয়নি। কিন্তু সভ্যতার বাহ্যিক ধরন-ধারণে সময়োপযোগী পরিবর্তনের অর্থ আকীদা-বিশ্বাসে অথবা মূল্যবোধের পরিবর্তন নয়। বাহ্যিক রদবদলকে আভ্যন্তরীণ নীতি পরিবর্তনের সাথে মিশ্রিত করে নেয়ার কোনই অবকাশ নেই।

ইসলাম মধ্য আফ্রিকায় প্রবেশ করে উলংগ মানুষের সমাজে সভ্যতার বীজ বপন করেছে এবং যেখানে যেখানে ইসলামী প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে, সেখানের মানুষই উলংগ দেহ কাপড় দিয়ে ঢেকেছে এবং দিগম্বর চলাফেরায় অভ্যস্ত মানুষ লেবাছ-পোশাক পরিধান করে সভ্যতার সীমারেখায় প্রবেশ করেছে। ইসলামী শিক্ষার প্রভাবেই তারা মানব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন তাদের পূর্ববর্তী জীবন পরিত্যাগ করেছে এবং ইসলামের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই সভ্যতা বর্জিত মানুষেরা প্রকৃতির গুপ্ত সম্পদ খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে কায়িক পরিশ্রম করার শিক্ষা লাভ করেছে। ইসলামই তাদের সংকীর্ণ গোত্রীয় গন্ডি থেকে টেনে বের করে বিশাল ইসলামী সমাজের জনসমুদ্রে নিক্ষেপ করেছে এবং পর্বত গুহার ভিতর বসে নানাবিধ কাল্পনিক দেব-দেবীর পূজা করার পরিবর্তে বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক এক আল্লাহর বন্দেগীর শিক্ষা দিয়েছে। এ বিরাট পরিবর্তন যদি সভ্যতা না হয়, তাহলে সভ্যতার সংজ্ঞা কি ? এটা ছিল এক বিশেষ পরিবেশের সভ্যতা এবং এ পরিবেশে যে যে উপকরণ বিদ্যমান ছিল তা-ই তখন ব্যবহার করা হয়েছে। অনুরূপভাবেই ইসলাম যদি অন্য কোন পরিবেশে প্রবেশ করে তাহলে তার কার্যক্রম সে পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করেই রচিত হবে এবং সে সমাজের অবস্থা মুতাবিকই সভ্যতার রূপ প্রকাশিত হবে। তাই ইসলামের শেখানো পদ্ধতি অনুসারে ইসলামী সভ্যতা বিকাশ লাভ করার জন্যে শিল্প বিজ্ঞান ও অর্থনীতির বিশেষ কোন স্তর নির্দিষ্ট নেই। ইসলামী সভ্যতা যেখানেই প্রবেশ করবে সে স্থানে যেসব বস্তুর উপাদান থাকবে সেগুলোকে ব্যবহার করবে এবং সেগুলোকে অধিকতর মার্জিত রূপ দান করবে। যদি কোন সমাজে এসব বস্তু উপাদান না থাকে, তাহলে সেগুলো অর্জন করার পন্থা শিখিয়ে দিয়ে সমাজটিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করে দেবে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম তার শাশ্বত ও চিরন্তন মূলনীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যেখানে যখনই তা প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানেই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। তাকে কায়েম করা ও কায়েম রাখার জন্যে বিশেষ সংগঠনও গড়ে উঠবে এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও সংগঠন কাঠামো নিয়ে ইসলামী সভ্যতা জাহেলী সমাজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করবে।

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۙ - البقرة : ١٣٨

"আল্লাহর রঙে নিজেকে রঙীন কর। আল্লাহর দেয়া রঙের চাইতে উৎকৃষ্ট রঙ আর কি হতে পারে?"—আল বাকারা ঃ ১৩৮

অষ্টম অধ্যায়

ইসলাম ও কৃষ্টি

ষষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি যে, ইসলামী জীবনাদর্শের প্রথম স্তম্ভের প্রথম অংশ হচ্ছে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর সমীপে আত্মসমর্পণ। এটাই হচ্ছে, কালেমায়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ। এ স্তম্ভের দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে এই যে, আল্লাহর সমীপে আত্মসমর্পিত জীবন যাপনের উপায়-পদ্ধতি হযরত মুহাম্মাদ (সা) থেকে গ্রহণ করতে হবে। কালেমায়ে তাওহীদের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)—এ অর্থই প্রকাশ করে। আল্লাহর সমীপে আত্মসমর্পণ ও তাঁর বন্দেগীর বাস্তব নমুনা হচ্ছে আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বাস্তব কর্মজীবনের এবং আইন-কানুন প্রণয়ন ও আইনের আনুগত্যের ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহকেই মাবুদ হিসেবে মেনে নিতে হবে। কোন মুসলমানই আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তিকে আল্লাহর মর্যাদার অধিকারী অথবা ইবাদাতের যোগ্য বিবেচনা করতে পারে না। মুসলমান কখনো আল্লাহ ছাড়া অন্য সৃষ্ট জীবের পূজা-উপাসনা করা বা তাকে সার্বভৌম শক্তি হিসেবে স্বীকার করে নেয়ার বিষয়ে চিন্তাই করতে পারে না।

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা ইবাদাত, ঈমান ও সার্বভৌমত্বের ব্যাখ্যা দান করেছি। এ অধ্যায়ে আমরা সার্বভৌমত্বের তাৎপর্য ও কৃষ্টির সাথে তার সম্পর্ক আলোচনা করব।

শরীয়াতে ইলাহীর সীমারেখা

ইসলামী দৃষ্টিভংগী অনুসারে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব শুধু আইন প্রণয়নের উৎস হিসেবে গ্রহণ অথবা তাঁরই আইন মুতাবিক বিচার ফায়সালা করা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামী শরীয়াতের অর্থও নিছক ব্যবস্থা শাস্ত্র নয়। বরং মানব জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল রীতিনীতিই এর অন্তর্ভুক্ত। শরীয়াতের ঐ সংকীর্ণ ধারণা ইসলামী শরীয়াতের সঠিক পরিচয় নয়। মানুষের জন্যে আল্লাহ তাআলার দেয়া যাবতীয় নির্দেশাবলীই শরীয়াতে ইসলামীর ভিত্তি। আকীদা-বিশ্বাস, শাসন পরিচালনার নীতি, বিচার-পদ্ধতি, নৈতিকতার মান, পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মূলনীতি ইত্যাদি সকল বিষয়ই শরীয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষের ধ্যান–ধারণা, দৃশ্যমান জগত সম্পর্কে হোক অথবা অদৃশ্য জগত, মানুষের নিজস্ব সত্তা ও সৃষ্ট জগতে তার মর্যাদা ইত্যাদি মানব জীবন সম্পর্কিত সকল বিষয়াদিই ইসলামী শরীয়াতের অন্তর্ভুক্ত অনুরূপভাবেই রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি এবং এ বিষয়গুলোর মূলনীতি ইসলামী শরীয়াতের আওতাভুক্ত। এসব বিষয়ে আল্লাহ তাআলার সমীপে পূর্ণ আত্মসমর্পণই শরীয়াতে ইলাহীর লক্ষ্য। উপরোক্ত বিষয়াদির সাথে সাথে সমাজের আইন-গঠিত বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণও শরীয়াতেরই আওতাধীন কাজ। এ জন্যে সাধারণত আমরা শরীয়াত অর্থে শুধু আইন-কানুন অথবা ব্যবস্থা শাস্ত্রকেই বুঝে থাকি। অথচ প্রকৃতপক্ষে শরীয়াতের পরিধি আরও বিস্তৃত। নৈতিক চালচলন এবং সমাজের মূল্যবোধ ও মূল্যমান যাচাই করার মানদন্ড শরীয়াতেরই অঙ্গ। জ্ঞান চর্চার সকল বিষয় এবং বিজ্ঞান ও কলাশাস্ত্রের মূলনীতি শরীয়াতেরই অংশ বিশেষ। কারণ উল্লেখিত সকল বিষয়েই আইন-কানুন গঠিত বিষয়ের মতই আমরা আল্লাহ তাআলার হেদায়াতের মুখাপেক্ষী।

আইন-কানুন ও সরকার সংক্রান্ত বিষয়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। অনুরূপভাবেই নৈতিকতা, লেন-দেন, মূল্যমান এবং গ্রহণ ও বর্জনের মানদন্ড বিষয়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে কার্যকরী করার প্রয়োজনীয়তাও স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, মূল্যবোধ, গ্রহণ-বর্জনের মানদন্ড, নৈতিকতা ও চাল-চলনাদি সমাজের প্রতিষ্ঠিত আকীদা-বিশ্বাসেরই পরিণতি এবং যে ঐশী উৎস থেকে আকীদা বিশ্বাসের জন্ম, সে একই উৎস থেকেই উল্লেখিত বিষয়াদিও গৃহীত হয়ে থাকে।

কিন্তু সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও ঐশী জ্ঞান প্রয়োগের আলোচনা শুনে শুধু সাধারণ মানুষ নয়, ইসলামী সাহিত্যের পাঠক এবং লেখক মন্ডলীর মধ্য থেকেও অনেকেই আশ্চর্যান্বিত হন।

কলা বিজ্ঞান সম্পর্কে ইতিপূর্বে প্রকাশিক আমার একটি পুস্তকে একথা বলা হয়েছে যে, সকল প্রকারের কলাশিল্পই মানুষের আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন মাত্র। মানব জীবন ও বিশ্ব সম্পর্কে মন-মস্তিষ্কে যে ধারণা বিশ্বাস থাকে তা-ই শিল্পীর তুলিতে রূপ ধারণ করে প্রকাশ পায়। ইসলামী ধ্যান-ধারণা শিল্পকলাকে শুধু নিয়ন্ত্রণই করে না বরং মুসলমানের অন্তরে সৃজনশীল ভাবধারারও জন্ম দিয়ে থাকে। কারণ সৃষ্ট জগত সম্পর্কে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস সৃষ্টি ও স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। বিশেষভাবে সৃষ্টি জগতে মানুষের স্থান ও মর্যাদা মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও

ভূমিকা এবং মানুষের দায়িত্ব, তার জীবনের সঠিক মূল্য নিরূপণ ইসলামী আকীদারই অন্তর্ভুক্ত। কেননা, ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস শুধু কল্পনা ও চিন্তারাজ্যে সীমাবদ্ধ থাকার বিষয় নয় বরং তা হচ্ছে জীবন্ত, সক্রিয়, প্রভাবশালী ও সদা তৎপর ভাবাদর্শ এবং এ আকীদা-বিশ্বাসই মানুষের ভাবাবেগ ও কর্ম প্রবণতা প্রভান্বিত করে।

সারকথা হচ্ছে এই যে, শিল্পকলা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে আল্লাহর বাণীর প্রয়োগ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। আগেই উল্লেখ করেছি যে, এ বিষয়ে আমার বক্তব্য সম্পর্কে শুধু শিক্ষিত ব্যক্তিই নয় বরং আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী অনেক মুসলমানও আশ্চর্যান্বিত হয়ে থাকেন।

ঈমান সম্পর্কে হোক অথবা জীবন সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা, পূজা-উপাসনার প্রকার-পদ্ধতি হোক অথবা নৈতিক ও পারস্পরিক আদান-প্রদান, মূল্যবোধ হোক অথবা গ্রহণ-বর্জনের মানদন্ড, অর্থনীতি ও রাজনীতির রূপরেখা হোক অথবা ইতিহাসের ব্যাখ্যা, এসব বিষয়ের কোন একটির জন্যেও মুসলমান আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী বাদ দিয়ে অন্য কোন উৎস থেকে হেদায়াত গ্রহণ করতে পারে না। তাই উল্লেখিত সকল বিষয়ে জ্ঞান আহরণের জন্যে মুসলমানকে সর্বদা কোন একজন জ্ঞানবান মুসলমানের শরণাপন্ন হতে হবে। কথিত জ্ঞানী ব্যক্তির কথা ও কাজ সর্বদা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। তবেই তিনি সঠিকভাবে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে পারবেন।

অবশ্য মুসলমানের জন্যে অমুসলমানের নিকট থেকে বিশেষ বিশেষ বিদ্যা শিক্ষা করার অনুমতি রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ—রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, শিল্প, কৃষি, শাসনকার্য (শুধু প্রশাসনিক পদ্ধতি সম্পর্কে), কারিগরী বিদ্যা, সামরিক শিক্ষা এবং জাতীয় শিল্প-বিজ্ঞান ইত্যাদির নামোল্লেখ করা যেতে পারে। অবশ্য একথা সত্য যে, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর উল্লেখিত সকল বিষয়ে যথেষ্ট সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করতে হবে। কারণ এসব বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা মুসলমানের জন্যে ফরযে কেফায়া অর্থাৎ সমাজের প্রয়োজনানুসারে যথেষ্ট সংখ্যক লোক উপরোক্ত বিষয়গুলোতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করবেন। অন্যথায় সমগ্র ইসলামী সমাজই গুণাহগার সাব্যস্ত হবে। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ লোক সৃষ্টি না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান বিশেষ বিশেষ বিদ্যা ও জ্ঞান বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করার জন্যে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে বিশেষজ্ঞদের দ্বারস্থ হতে পারে কিংবা তাদেরকে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করাও যেতে পারে।

এ ধরনের বিষয়াদি সম্পর্কেই আল্লাহর নবী (স) বলেছিলেন—

انتم اعلم بامور دنياكم। অর্থাৎ পার্থিব বিষয়ে তোমরা অধিকতর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। এসব বিষয় জীবন, সৃষ্ট জগত, মানুষ ও তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য, মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য, সৃষ্ট জগত ও স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এসব বিদ্যা সমাজের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণকারী আইন প্রণয়নের নীতি, নৈতিকতা, চালচলন, প্রথা-পদ্ধতি, রীতিনীতি, অভ্যাস-আচরণ, মূল্যবোধ এবং গ্রহণ-বর্জনের মানদন্ডের সাথেও সম্পর্কযুক্ত নয়। তাই অমুসলমানের নিকট থেকে উপরোক্ত বিষয়গুলোতে বিদ্যা শিক্ষার ফলে মুসলমানের ঈমান বিকৃত হয়ে যাবার বা জাহেলিয়াতের দিকে ফিরে যাবার কোন আশংকা নেই।

কিন্তু মানুষের কর্মতৎপরতার অন্তর্নিহিত ভাবধারা ও তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে হলে (কর্মতৎপরতা ব্যক্তিগত হোক কিংবা সমষ্টিগত) মানুষের ব্যক্তিগত সত্তা ও মানবতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে হবে। অনুরূপভাবেই সৃষ্টির সূচনা এবং মানবজীবনের প্রারম্ভ সম্পর্কিত বিষয়াদি অধিবিদ্যার (Metaphysices) অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসা বিদ্যার সাথে সংযুক্ত নয়) বিধায় এগুলো আইন-কানুন ও ব্যবস্থা শাস্ত্রেরই মত মানব জীবনের চালচলন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ বিষয়গুলো পরোক্ষভাবে মানুষের আকীদা-বিশ্বাসের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

তাই একজন মুসলমান উল্লেখিত বিষয়গুলোতে জ্ঞান অর্জনের জন্যে কোন অমুসলমানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পারে না। মানুষের জীবন যাত্রা প্রণালীর উপর প্রভাব বিস্তারকারী সকল বিষয়ে শুধুমাত্র দ্বীনদার ও মুত্তাকী মুসলমানের নিকট থেকেই জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষক সম্পর্কে মনে এ বিশ্বাস থাকার দরকার হবে যে, তিনি একমাত্র আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের উপরই নির্ভর করেন। সারকথা হচ্ছে এই যে, মুসলমানের মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল ধারণা থাকা দরকার যে, ঐসব বিষয় আকীদার সাথে জড়িত। তাই উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে ঐশী বাণীর আলোকে মতামত ও চলার পথ স্থিরিকরণ বন্দেগীর অপরিহার্য অংশ এবং কালেমায়ে শাহাদাতের অবশ্য পূরণীয় দাবী।

অবশ্য জাহেলিয়াতের সমর্থক লেখকদের রচনা ও গ্রন্থাবলীতে কি কি পরিমাণ বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশিত হয়েছে এবং কি কি উপায়ে মানুষকে ঐসব ভ্রান্ত মতবাদ থেকে রক্ষা করা যায় তা জানার জন্যে তাদের মতামত অধ্যয়ন ও বিচার-বিশ্লেষণ করতে কোন বাধা নেই। বরং মানুষকে সঠিকভাবে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের সাথে পরিচিত করানোর জন্যে এরূপ করা প্রয়োজন।

দর্শনশাস্ত্র, মানবেতিহাসের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, মনস্তত্ব (অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা লব্ধ ফলাফল ব্যতীত—কারণ এগুলো কারো মতামত নয় বরং অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার বাস্তব ফল) নৈতিকতা, ধর্মতত্ত্ব ও বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা, সমাজ বিজ্ঞান (পরিসংখ্যান ও অভিজ্ঞতা লব্ধ ফলাফল ব্যতীত) ইত্যাদি বিষয় অতীত এবং বর্তমান যুগের বিভিন্ন সময় নানাবিধ ভ্রান্ত মতবাদের দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হয়েছে এবং হচ্ছে। বরং জাহেলী আকীদা-বিশ্বাস ও মতবাদের ভিত্তিতেই উল্লেখিত বিষয়গুলোর পুরো কাঠামো রচিত হয়েছে। এ জন্যেই উপরোল্লিখিত বিজ্ঞানগুলোর বেশীর ভাগই দ্বীনের সাথে সংঘর্ষশীল এবং সাধারণভাবে সকল ধর্মের প্রতি এবং বিশেষভাবে ইসলামের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন।

মানুষের চিন্তা-গবেষণার বিষয়গুলোর মধ্যে উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো রসায়নশাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যা, জীববিদ্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদির মত নয়। এ বিষয়গুলো যদি অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা লব্ধ ফলাফল পর্যন্ত সীমিত থাকে এবং আন্দায-অনুমানকে ভিত্তি করে কোন মতবাদ রচনার প্রয়াস না পায়—তাহলে তার দ্বারা আকীদা-বিশ্বাস নষ্ট হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু যদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার সীমালংঘন করে কল্পনার আশ্রয় নেয়, তাহলে তা হবে অবশ্যই বিভ্রান্তিকর। উদাহরণ স্বরূপ ডারউইনের জীববিদ্যার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। জীববিদ্যা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা করতে গিয়ে তিনি বিনা যুক্তি প্রমাণে ও বিনা প্রয়োজনেই সৃষ্টিতে জীবনের সূত্রপাত ও তার ক্রমবিকাশের আলোচনায় বস্তু জগতের বহির্ভূত কোন শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেছেন।

এসব প্রয়োজনীয় বিষয়ে মুসলমানদের নিকট আল্লাহ্ প্রদত্ত যে জ্ঞান রয়েছে, তা যথেষ্ট ও পরিপূর্ণ। আল্লাহর প্রতি অটল ঈমান ও তাঁর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ সম্পর্কিত জ্ঞান অত্যন্ত উঁচু স্তরের জ্ঞান। মানুষের সকল কাল্পনিক মতবাদ ও যুক্তি-তর্ক আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানের তুলনায় হাস্যকর প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কারো কারো অভিমত এই যে, কৃষ্টি মানবতার সমষ্টিগত উত্তরাধিকার। কোন বিশেষ দেশ বা জাতি ধর্মের গন্ডীতে কৃষ্টি সীমাবদ্ধ নয়। বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যার কার্যকুশলতা এবং তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পর্যন্ত একথা অনেকাংশে যথার্থ। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, পরীক্ষা গবেষণার ফলাফল অতিক্রম করে অধিবিদ্যার দার্শনিক ব্যাখ্যা, মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও তার ঐতিহাসিক ভূমিকার বিচার বিশ্লেষণ এবং সাহিত্য ও কলাশিল্প নিয়ে আন্দায-অনুমান ভিত্তিক মতবাদ রচনা থেকে বিরত থাকতে হবে। কিন্তু 'কৃষ্টি' ও

'সংস্কৃতি'কে মানবতার সমষ্টিগত উত্তরাধিকার আখ্যাদানকারীগণ উল্লেখিত শর্ত লংঘন করে চালবাজীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিশ্বব্যাপি ইয়াহুদী ষড়যন্ত্রের একটি সূক্ষ্ম চাল হিসেবে এ মতের প্রবক্তাগণ কৃষ্টির নামে সকল প্রকার নৈতিক বন্ধন বিশেষত ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস দুর্বল করে দেয়ার প্রয়াস পেয়ে থাকেন। বিশ্ব-রাজনীতির অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে সমগ্র দুনিয়ায় ইয়াহুদীদের অসদুদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্যই তাঁরা মানুষকে নৈতিক ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছেন। ইয়াহুদী ষড়যন্ত্রের প্রথম দফা হচ্ছে সুদী ব্যবসায়। এ ব্যবসার মাধ্যমে তাঁরা মানবজাতির রক্ত শোষণ করে ইয়াহুদী পরিচালিত সুদভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থভান্ডার সমৃদ্ধ করে চলেছেন।

ইসলামের বিবেচনায় নিরেট বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তার বাস্তব প্রয়োগ বাদ দিয়ে আমরা দু'ধরনের সংস্কৃতির সন্ধান পাই। একটি হচ্ছে, ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের উপর গড়ে উঠা ইসলামী সংস্কৃতি। অপরটি হচ্ছে জাহেলী সংস্কৃতি। বিভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রার ভিতর দিয়ে জাহেলী সংস্কৃতি আত্মপ্রকাশ করে। তবে জাহেলিয়াতের রচিত সকল জীবনযাত্রা প্রণালীই মানুষকে আল্লাহ তাআলার আসনে বসিয়ে দেয়। এবং মানব রচিত মতবাদগুলোকে আল্লাহ প্রদত্ত মানদন্ডের ভিত্তিতে যাচাই না করেই গ্রহণ করে নেয়। ইসলামী সংস্কৃতি মানুষের সকল প্রকার চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিকেই প্রভাবান্বিত করে এবং সংস্কৃতির কর্মতৎপরতাকে গতিশীল ও বৈশিষ্ট্যময় করে তোলার উপযোগী সূত্র ও কর্মপদ্ধতি দান করে।

ইউরোপের পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান

একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, আধুনিক ইউরোপের শিল্প-কৃষ্টির জীবনীশক্তি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতি। আর এ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতিটি ইউরোপের আবিষ্কার নয়। এ পদ্ধতিটি স্পেন ও প্রাচ্যের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই জন্ম নিয়েছিল। সৃষ্ট জগত, প্রাকৃতিক আইন-কানুন এবং সৃষ্ট-জগতে লুক্কায়িত অসংখ্য শক্তি ও সম্পদ সম্পর্কে ইসলামে স্পষ্ট ভাষায় ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং এ ইঙ্গিতই মুসলমানদেরকে সৃষ্ট জগত সম্পর্কে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর জন্যে উৎসাহিত করেছে। পরবর্তীকালে ইউরোপ মুসলমানদের প্রদর্শিত পথ ধরেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি বিশেষ আন্দোলন শুরু করে দেয় এবং ক্রমে ক্রমে উন্নতির শীর্ষদেশে পৌঁছে যায়। এদিকে মুসলিম বিশ্ব ইসলাম থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করে এবং এর ফলে তাদের সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা প্রথমত স্থবির এবং পরে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়।

এ নিষ্ক্রিয়তার মূলে অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি ছিল তৎকালীন ইসলামী সমাজের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং অপরটি ছিল মুসলিম জাহানের উপর পুনঃ পুনঃ খৃস্টান ও ইয়াহুদীদের সশস্ত্র আক্রমণ। ইউরোপ ইসলামী দুনিয়া থেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পদ্ধতি শিক্ষা করে ইসলামের সাথে এ পদ্ধতির সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পরবর্তীকালে তারা গীর্জার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কারণ গীর্জা আল্লাহর শাসন ব্যবস্থার নাম নিয়ে সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতন চালাচ্ছিল। গীর্জার বিরোধিতা করার সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইসলামী পদ্ধতিটিও পরিত্যাগ করে। ফলে ইউরোপে চিন্তা-গবেষণার ধারা জাহেলিয়াতের পথ ঘরে অগ্রসর হয়ে এবং তা প্রকৃতিগত দিক থেকে ইসলামী ধ্যান–ধারণা থেকে সম্পূর্ণরূপে শুধু বিছিন্নই হয়নি উপরন্তু ইসলাম বিরোধী খাতে প্রবাহিত হয়। এ জন্যে একজন মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাসকে নিজের সকল চিন্তা-গবেষণা ও তৎপরতার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা। নিজের জ্ঞান ও যোগ্যতা যথেষ্ট পরিমাণে পাকা-পোক্ত হলে নিজে নিজেই ইসলামী দৃষ্টিভংগীতে চিন্তা-ভাবনা শুরু করবে অথবা কোন আল্লাহভীরু নির্ভরযোগ্য জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

'যেখান থেকেই পার, জ্ঞানার্জন কর'—এ নীতি বাক্য ইসলামের দৃষ্টিতে সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ঈমান, জীবনযাত্রা প্রণালী, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, অভ্যাস ও রীতিনীতি এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ঘটিত বিষয়ে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে যত্রযত্র ছুটাছুটি করলে চলবে না।

অবশ্যই ইসলাম রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞান, জ্যোতিষ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা, কৃষি বিদ্যা, প্রশাসন পরিচালনা ও অনুরূপ ধরনের যাবতীয় প্রকৌশল বিষয়ক জ্ঞানার্জন করার জন্য আল্লাহভীরু ও নির্ভরযোগ্য মুসলিম শিক্ষক না পেলে অমুসলিম অথবা আল্লাহর নাফরমান মুসলমানের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণের অনুমতি দেয়। মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা দুঃখজনক। তাদের অনেকে নিজের দ্বীন ও জীবন বিধান থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। তাঁরা ভুলে গেছেন যে, ইসলাম তাঁদেরকে আল্লাহর যমীনে খলিফা নিযুক্ত করেছেন এবং খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যে তাদেরকে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের দক্ষতা অর্জন এবং নিজেদের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্যে তাগিদ করেছেন। তাই বর্তমান অবস্থায় নিছক কারিগরী ও প্রকৌশল বিষয়ে অমুসলিম পন্ডিতদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জনের অনুমতি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু আকীদা-বিশ্বাসের মূলতত্ত্ব, জীবন সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণার ভিত্তি, কুরআনের তাফসীর, হাদীস, সীরাতুন্নবীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ,

ইতিহাসের দর্শন, মানবীয় কর্মতৎপরতার দার্শনিক পর্যালোচনা, সামাজিক রীতিনীতি, সরকার গঠনের উপায়-পন্থা, রাজনীতির মৌলিক সূত্র ইত্যাদি বিষয় কোন অমুসলমান অথবা মুসলমান নামধারী আল্লাহর নাফরমান ব্যক্তির নিকট থেকে জ্ঞান শিক্ষা করার অনুমতি ইসলামে নেই।

আপনাদের নিকট উপরোক্ত বিষয়ে বক্তব্য পেশ করার আগে আমি চল্লিশ বছর কাল পর্যন্ত বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের চিন্তা-গবেষণার ফলাফল জানতে চেষ্টা করেছি। যেসব বিষয়ের প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল সেসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের চিন্তা-গবেষণা করেছি। তারপর আমি আমার ঈমানের উৎস মূলের দিকে মনোযোগী হই এবং আশ্চর্যান্বিত হয়ে লক্ষ্য করি যে, ইতিপূর্বে যা কিছু শিক্ষা লাভ করেছি তা অতি তুচ্ছ। তবে আমার জীবনের চল্লিশটি বছর এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় কাটিয়ে দেয়ার জন্যে আমার কোন দুঃখ নেই। কারণ ঐ সময়ে আমি জাহেলিয়াতের প্রকৃতি, তার বিভ্রান্তি, তার পথচ্যুতি ও তার অজ্ঞতা সম্পর্কে অবগত হবার সুযোগ পেয়েছি এবং সাথে সাথে তার তর্জন-গর্জন ও হাঁক-ডাকের আড়ালে চাপা অন্তসারশূন্যতা পরিষ্কারভাবে দেখতে পেয়েছি। আমি ঐ সময়ই ভালভাবে উপলব্ধি করেছি যে, মুসলমান জ্ঞান অর্জনের জন্যে কখনো ঐশী উৎসের পাশাপাশি জাহেলিয়াতের উৎসকে গ্রহণ করতে পারে না।

তবু এটা শুধু আমার ব্যক্তিগত মতামত নয়। কেননা বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যক্তি বিশেষ বা কয়েকজনের ব্যক্তিগত অভিমত সম্বল করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। বিশেষত যে ক্ষেত্রে স্বয়ং আল্লাহ তাআলারই নির্ধারিত মানদন্ড রয়েছে, সে ক্ষেত্রে কয়েকজন মুসলমানের মতামতকে প্রাধান্য দান করার প্রশ্নই ওঠে না। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর প্রিয় নবী (সা) আমাদের যে নির্দেশ দিয়েছেন, তদনুসারেই আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সকল বিতর্কমূলক বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশের প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রতিটি মুসলমানেরই কর্তব্য। সে কর্তব্য স্মরণ করেই আমরা আল্লাহ ও রাসূল এ বিষয়ে কি বলেন, তা খুঁজে দেখবো।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইয়াহুদী ও নাসারাদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ
كُفَّارًا ج حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ

الْحَقُّ ج فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○ — البقرة :١٠٩

"আহলে কিতাবদের বেশী সংখ্যক লোকই তোমাদেরকে ঈমানের পথ থেকে পুনরায় কুফরীর পথে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তাদের নিকট সত্য উদঘাটিত হবার পরও তারা শুধু ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে এরূপ করছে। তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তাআলা তাদের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"—আল বাকারা ঃ ১০৯

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلاَ النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ط قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ط وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاۤءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَاۤءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لا مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلاَ نَصِيْرٍ ○ — البقرة : ١٢٠

"যতক্ষণ তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদের মধ্যে শামিল না হয়ে যাবে, ততক্ষণ তারা কখনো তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। বলে দাও যে, আল্লাহ তাআলার হেদায়াতই একমাত্র হেদায়াত। যদি তোমাদের নিকট জ্ঞান এসে যাবার পরও তোমরা তাদেরই কথামত চল, তাহলে আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।"

—আল বাকারা ঃ ১২০

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ○ — ال عمران : ١٠٠

"হে ঈমানদারগণ ! যদি তোমরা আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে কোন উপদলের অনুসরণ কর, তাহলে তারা তোমাদেরকে কুফরী জীবন বিধানের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।"— আলে ইমরান ঃ ১০০

হাফিজ আবুল আলী হযরত জাবের (রা), হাম্মাদ ও শাবীর পরিবেশিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর যে উক্তি উদ্ধৃত করেছেন তা নিম্নরূপ—

لا تسئلوا اهل الكتٰب عن شئ خانهم لن يهدو كم وقد ضلوا وانكم اما ان تصدقوا بباطل و اما ان تكذبوا بحق وانه واللّٰه لو كان موسى حيا بين اظهركم ماحل له الا ان يتبعنى ـ

"কোন বিষয়ে আহলে কিতাবদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করো না। তারা কখনো তোমাকে ভাল পথ দেখাবে না। কারণ, তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট। তাদের প্রভাবে তুমি হয় কোন মিথ্যাকে সত্য বা সত্যকে মিথ্যা হিসেবে মেনে নিবে। আল্লাহর কসম ! যদি মূসা (আ)-ও আজ জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁর জন্যেও আমার অনুসরণ ছাড়া অন্য পথ জায়েয হতো না।"

আল্লাহ তাআলা স্বয়ং ইয়াহূদী ও নাসারাদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেয়ার পরও যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, তারা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, ইসলামী ইতিহাস, মুসলিম সমাজের কাঠামো, ইসলামী রাজনীতির ধরন এবং ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে আমাদের সঠিক শিক্ষাদান করবে, তাহলে সেটা হবে চরম নির্বুদ্ধিতা। কারণ, আমরা তাহলে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদেরকে আমাদের শুভাকাংখী ও কল্যাণকামী অথবা সত্যানুসন্ধিৎসু বিবেচনা করি বলে মনে হবে। অথচ আল্লাহ তাআলা তাদের স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এরূপ প্রকাশ্য ঘোষণার পরও যদি আমরা তাদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করি, তাহলে তা আমাদের বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার চরম অভাবেরই প্রমাণ হবে মাত্র।

স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেছেন— قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى (বল, হে নবী ! আল্লাহর হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত)। এ ঘোষণার মাধ্যমে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, মুসলমান তার সকল বিষয়-আশয়ে একমাত্র আল্লাহ তাআলার দেয়া জ্ঞানের উপর নির্ভর করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। অন্যথায় পথচ্যুতি ছাড়া সঠিক জ্ঞান অন্যত্র কোথাও নেই। তাই অন্য উৎস থেকে সুপথের সন্ধান প্রাপ্তির কোনই আশা নেই। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহর হেদায়াতের বাইরে যা আছে সবকিছুই ভ্রান্ত ও মন্দ সাব্যস্ত হয়ে যায়। এ আয়াতের বক্তব্য বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট এবং এর অন্য কোন অর্থ করা যায় না।

কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যারা আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্থিব স্বার্থই যাদের লক্ষ্য, তাদের সাথে মুসলমানদের কোনই সম্পর্ক রাখা চলবে না। এ জাতীয় লোকদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে কুরআন বলছে যে, তারা শুধু অনুমান সম্বল করেই চলে। তাদের নিকট কোন জ্ঞান নেই বলেও কুরআনে ঘোষণা করেছে—

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۙ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝ ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۙ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ۝ — النجم : ٢٩ـ٣٠

"যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং পার্থিব দুনিয়া ছাড়া যার অন্য কোন লক্ষ্য নেই, তাকে কোন গুরুত্ব প্রদান করো না। এ জাতীয় লোকদের জ্ঞানের সীমা ঐ পর্যন্তই। কে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং কে হেদায়াতপ্রাপ্ত তা আল্লাহ তাআলা ভালভাবেই জানেন।"

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ○ — روم : ٧

"তারা শুধু পার্থিব দুনিয়ার প্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কেই অবগত এবং আখেরাত সম্পর্কে তারা অজ্ঞ।"—আর রুম ঃ ৭

এসব বাহ্যদর্শী, প্রকাশ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপকারী ও প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিগণ আল্লাহর যিক্‌র থেকে উদাসীন এবং পার্থিব জীবনের অস্থায়ী স্বার্থের লিপ্সায় মগ্ন। বর্তমান যুগের সকল বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞদের অবস্থাই এরূপ। তারা যে জ্ঞান অর্জন করেছে সে জ্ঞানের উপর কোন মুসলমানই নিষ্ঠা সহকারে নির্ভরশীল হতে পারে না এবং বিনা দ্বিধায় তাদের নিকট থেকে শুধু কারিগরী বিদ্যা ছাড়া অন্য বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় না। মানব জীবন সম্পর্কিত আকীদা-বিশ্বাস ও সৃষ্টি রহস্য বিষয়ে তাদের প্রতি আস্থাশীল হওয়া কোন মুসলমানের জন্যে বৈধ নয়। কুরআন পুনঃ পুনঃ যে জ্ঞানের প্রশংসা করছে, সে জ্ঞান এটা নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ ط — الزمر :٩

"জ্ঞানী ও অজ্ঞান ব্যক্তি কি সমান হতে পারে?"—আয যুমার ঃ ৯

পূর্বাপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে যারা এ আয়াতের ব্যাখ্যা করে তারা ভ্রান্ত! জ্ঞান সম্পর্কে পরিষ্কার সীমারেখার সন্ধান পাওয়া যায় নিম্নের আয়াতে—

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ ط اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○ — الزمر :٩

"(উপরোল্লিখিত নাফরমানদের চাল-চলন উত্তম অথবা) যে ব্যক্তি অনুগত হয়ে রাত্রিকালে দন্ডায়মান থাকে, সিজদা করে, আখেরাতের ভয়ে ভীত থাকে এবং আল্লাহর রহমাতের আশা পোষণ করে? তাদের জিজ্ঞেস কর,

যে জানে এবং যে কিছুই জানে না তারা কি কখনো সমান হতে পারে ? বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণই নসিহত কবুল করে থাকেন।"—আয যুমার ঃ ৯

রাতের অন্ধকারে যারা আল্লাহ তাআলার দরবারে মস্তক নত করে দণ্ডায়মান অবস্থায় অথবা সিজদায় নিজের রবের সমীপে কাকুতি-মিনতি করে এবং আখেরাতের ভয়ে যাদের অন্তর কম্পিত হয়, তারাই হচ্ছে ঐসব ভাগ্যবান ব্যক্তি যারা জ্ঞান-সম্পদে সমৃদ্ধ। কুরআনের আয়াতে এ জ্ঞানকেই সত্যিকার জ্ঞান আখ্যা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যে জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর সন্ধান দেয়, যে জ্ঞান মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি ও সরলতা জন্মায়, সে জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। আর যে বিদ্যা মানুষের প্রকৃতিকে বিকৃত করে দেয় এবং তাকে নাস্তিকতা ও গুমরাহীর বক্র পথে টেনে নিয়ে যায়, সে বিদ্যা কখনো জ্ঞান নামে আখ্যায়িত হতে পারে না।

জ্ঞানের পরিধি শুধুমাত্র আকীদা-বিশ্বাস, দ্বীনী কর্তব্য এবং শরীয়াতের জ্ঞান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। বরং জ্ঞানের পরিধি আরও অনেক বিস্তৃত। আকীদা-বিশ্বাস, দ্বীনী কর্তব্য ও শরীয়াতের সাথে জ্ঞানের যে পরিমাণ সম্পর্ক ঠিক সে পরিমাণ সম্পর্কই রয়েছে প্রাকৃতিক আইন এবং দুনিয়ার উপর মানুষের খিলাফত প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা সম্পর্কিত সকল বিষয়ে।

যে জ্ঞানের উৎসমূলে ঈমান নেই—কুরআনের সংজ্ঞা অনুসারে সে জ্ঞান কুরআনের প্রশংসিত জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত নয়। যে জ্ঞানের অধিকারীগণ ঈমানের সম্পদ থেকে বঞ্চিত তারা কুরআনের দৃষ্টিতে মোটেই জ্ঞানীদের শ্রেণীভুক্ত নয়।

যেসব বিজ্ঞান সৃষ্টি জগত ও প্রাকৃতিক আইনের চর্চা করে (যথা জ্যোতিষ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, পদার্থ বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র এবং ভূতত্ত্ব) সেগুলোর সাথে ঈমানের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এসব বিদ্যার প্রত্যেকটিই আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে। অবশ্য যাদের চিন্তাধারা বিকৃত হয়ে গেছে, এসব বিদ্যা তাদের আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কিত ধারণা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। ইউরোপেই প্রথম এ জাতীয় দুঃখজনক মনোভাবের জন্ম হয়। সে দেশের ইতিহাসে এক সময় বিজ্ঞানী ও অত্যাচারী ধর্মযাজকদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয় এবং এ বিরোধিতার ফল স্বরূপ ইউরোপে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পুরো আন্দোলনটি আল্লাহ বিরোধী মনোভাব নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এ আন্দোলন ইউরোপীয় জীবনযাত্রার সকল দিক ও বিভাগের উপর সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। আর এর পরিণতি স্বরূপ ইউরোপীয় চিন্তাধারার গতি পরিবর্তিত হয়। তাই শত্রুতা ও বিরোধিতা বিজ্ঞান ও ইউরোপীয় গীর্জার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সামগ্রিকভাবেই সকল

ধর্মের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন হয়ে উঠে এবং ইউরোপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চিন্তা ও গবেষণার সাহায্যে যত সম্পদ সংগ্রহ করেছে, সবই ধর্মদ্রোহিতার পথে অগ্রসর করেছে। অধিবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র, কারিগরি-বিজ্ঞান ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ঐ একই অবস্থা।

পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও বিজ্ঞান এভাবেই ধর্মের প্রতি ঘৃণা বিশেষত ইসলামের প্রতি অধিকতর শত্রুতামূলক মনোভাবের বিষাক্ত প্রভাব নিয়ে গড়ে ওঠে। এ আলোচনার পর ইসলামের প্রতি পাশ্চাত্য জগতের তীব্র ঘৃণা ও বিরোধের কারণ উপলব্ধি করা কঠিন কাজ নয়। তাদের পক্ষ থেকেই পরিকল্পিত উপায়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য প্রচারণা চালানো হয়। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসকে দুর্বল করে দেয়া পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামী সমাজের গোটা কাঠামোটির ধ্বংস সাধনই এরূপ প্রচারণার উদ্দেশ্য।

এসব বিষয় অবগত হবার পরও যদি আমরা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার উপর নির্ভর করি ; তাহলে সেটা হবে আমাদের ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। অবশ্য নিছক কারিগরি বিজ্ঞান শিক্ষা করার জন্যে বর্তমান সময়ে আমাদের পাশ্চাত্য জ্ঞানের দ্বারস্থ না হয়ে উপায় নেই। কিন্তু তবুও এসব বিদ্যা শিক্ষাকালে আমাদের সতর্কতার সহিত কাল্পনিক ও দার্শনিক তথ্যাবলী পরিহার করতে হবে। কারণ, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দর্শন ও কল্পনা ইসলামের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মানসিকতা থেকে জন্ম নিয়েছে। তাই তাদের প্রভাবে ইসলামী জীবনাদর্শের পবিত্র প্রস্রবণটি ঘোলাটে হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

মুসলমানদের জাতীয়তা

ইসলাম যেদিন থেকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে নতুন ধ্যান-ধারণা এবং তা অর্জনের উপায়-পন্থা প্রদর্শন করেছে, সে দিন থেকেই সে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্যেও নতুন পদ্ধতি শিখিয়েছে। দুনিয়ায় ইসলাম এসেছেই মানুষের সাথে তার রবের সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যে এবং একথা শেখানোর জন্যে যে, গ্রহণ ও বর্জনের মানদন্ড ও সকল বিষয়ের মূল্যায়ণের নীতি একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট থেকেই গ্রহণ করতে হবে। অনুরূপভাবে ইসলাম একথাও ঘোষণা করেছে যে, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মূলনীতি আল্লাহ তাআলাই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমরা তারই ইচ্ছায় জন্মলাভ করেছি এবং তাঁর সমীপেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। ইসলাম দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে একটি মাত্র বন্ধনই মানুষকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে দেয় এবং এ বন্ধন দৃঢ় হলে রক্তের বন্ধন ও অন্যান্য যোগসূত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ط — المجادلة : ٢٢

"যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তাদের তুমি কখনো আল্লাহর শত্রুদের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করতে দেখবে না। হোক না তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই ও নিকট আত্মীয়।"

—মুজাদালা ঃ ২২

দুনিয়াতে আল্লাহর দল শুধু একটিই। এ একটি ব্যতীত অপর সকল দলই শয়তান এবং তাগুতের দল।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ج اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ○ — النساء : ٧٦

"যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে। আর যারা কাফের তারা সংগ্রাম করে তাগুতের পথে। সুতরাং শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাও। শয়তানের সকল চক্রান্তই দুর্বল।"— আন নিসা ঃ ৭৬

আল্লাহর দরবারে পৌঁছার পথ মাত্র একটি। আর এ একটি ছাড়া অপর সকল পথই আল্লাহ থেকে দূরে নিয়ে যায়।

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ج وَلاَ تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ط — الانعام : ١٥٣

"এটাই আমার সহজ সরল পথ সুতরাং এ পথ ধরেই চল। অন্য পথে যাবে না। তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।"—আল আনআম ঃ ১৫৩

মানুষের জন্য একটি মাত্র জীবন বিধান রয়েছে। আর সেটি হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম ব্যতীত যত জীবন বিধান রয়েছে সবগুলোই জাহেলিয়াত।

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ط وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○ — المائدة : ٥٠

"তারা কি তবে জাহেলিয়াতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চায় ? প্রকৃতপক্ষে যারা আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনকারী তাদের জন্যে আল্লাহর সিদ্ধান্তের চেয়ে উত্তম অন্য কোন সিদ্ধান্তই নেই।"—আল মায়েদা ঃ ৫০

একটি মাত্র শরীয়াতই মেনে চলার যোগ্য এবং তা হচ্ছে ইসলামী শরীয়াত। আল্লাহ প্রদত্ত এক শরীয়াত ছাড়া আর যত শরীয়াত আছে সবগুলোই নফসের খাহেস থেকে প্রণীত।

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ ○ — الجاثية : ١٨

"(হে নবী !) আমি অতপর তোমাকে একটি স্পষ্ট শরীয়াতের উপর কায়েম করেছি। তুমি আমার প্রণীত এ শরীয়াত মেনে চল এবং অজ্ঞ লোকদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।"—জাসিয়া ঃ ১৮

দুনিয়ায় একটি মাত্র সত্য পথ রয়েছে এবং তা অবিভাজ্য। আর এ সত্য পথ ছাড়া সকল পথই বিভ্রান্তি বা গুমরাহীর পথ।

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلاَّ الضَّلٰلُ ج فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ○ — يونس : ٣٢

"সত্যের বহির্ভূত গুমরাহী ছাড়া আর কি হতে পারে ? তোমরা পথহারা হয়ে কোথায় ঘুরাফেরা করছ ?"—ইউনুস ঃ ৩২

দুনিয়ার মধ্যে একটি মাত্র ভূখণ্ডই দারুল ইসলাম নামে পরিচিত হবার যোগ্য এবং সেটি হচ্ছে এমন একটি ইসলামী রাষ্ট্র যেখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত, আল্লাহর শরীয়াত প্রতিপালিত এবং মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সকল সমষ্টিগত বিষয় পরিচালিত হয়। এ রাষ্ট্র ব্যতীত সকল ভূখন্ডই দারুল হারব (কুফরী রাষ্ট্র)। মুসলমান দারুল হারবের সাথে দু' ধরনের সম্পর্ক রক্ষা করতে পারে। যুদ্ধ অথবা সুনির্দিষ্ট শর্তাধীনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে কৃত শান্তিচুক্তি। এরূপ চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র কখনো দারুল ইসলামের পর্যায়ভুক্ত হবে না।

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْ وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَالَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ج وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ط اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ○ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ط لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ○ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ط

"যারা ঈমান আনয়ন করেছে, হিজরাত করেছে, আল্লাহর পথে ধন-প্রাণ দিয়ে লড়াই করেছে, যারা হিজরাতকারীদের আশ্রয় দিয়েছে এবং তাদের সাহায্য করেছে তারা সকলেই পরস্পরের পৃষ্ঠপোষক। আর ঈমান আনয়ন করেছে অথচ হিজরাত করে (দারুল ইসলামে) আসেনি তাদের সাথে তোমাদের বন্ধুত্বের কোন কারণ নেই যতক্ষণ না তারা হিজরাত করে আসে। তবে যদি দ্বীনী বিষয়ে তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থী হয় তাহলে

তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। আবার যেসব জাতির সাথে তোমাদের শান্তিচুক্তি হয়ে গেছে তাদের বিরুদ্ধে কোন সাহায্য করা যাবে না। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্ তাআলা দেখতে পান। যারা কাফের তারা পরস্পরের সহায়ক। তোমরা (ঈমানদারগণ) যদি পরস্পরের সহায়তা না কর, তাহলে দুনিয়াতে ফিতনা ও বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে। আর যারা ঈমান আনয়ন করেছে, আল্লাহর পথে হিজরাত ও জিহাদ করেছে, আর যারা তাদের আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারা সকলেই খাঁটি মু'মিন। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও উত্তম রিয্ক। আর যারা পরবর্তীকালে ঈমান আনয়ন করেছে এবং হিজরাত করে এসে তোমাদের সাথে জিহাদেও অংশ নিয়েছে, তারা তোমাদেরই দলভুক্ত।"

—আনফাল ঃ ৭২-৭৫

ইসলাম উপরোক্ত ধরনের পূর্ণ হেদায়াত ও সিদ্ধান্তকারী নির্দেশাবলী নিয়ে দুনিয়ায় এসেছে। মানুষকে ধূলাবালি ও রক্তমাংসের বন্ধন থেকে মুক্ত করে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছে। যে ভূখন্ডে আল্লাহ্ প্রদত্ত শরীয়াত বাস্তবায়িত হয়েছে এবং যে দেশের বাসিন্দাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মানদন্ডের ভিত্তি আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্কের মানদন্ডে যাচাই করা হয়ে থাকে, সে দেশই মুসলমানদের স্বদেশ। মুসলমানদের ঈমান ও ঈমানের বন্ধন ব্যতীত অন্য কোন জাতীয়তা নেই। এ ঈমানের বলেই তারা দারুল ইসলামের সদস্য হতে পারে—অন্য কোন যোগ্যতার বিচারে নয়। মুসলমানের ঈমান ও আকীদার বন্ধন ব্যতীত অন্য কোন আত্মীয়তা বা নৈকট্য নেই। ঈমান-আকীদার ভিত্তিতে গ্রথিত ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও দৃঢ় হয়ে গড়ে উঠে। মা, বাপ, ভাই, স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়গণ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ব্যতীত মুসলমানের স্বজন হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط — النساء : ١

"হে মানুষ ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর—যিনি তোমাদেরকে একটি মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং এ একজন থেকেই তার জোড়া এবং জোড়া থেকে অসংখ্য পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন। যে আল্লাহর দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের অধিকার দাবী কর, তাঁকে ভয় কর এবং আত্মীয়-স্বজনের অধিকার সম্পর্কে সতর্ক থাক।"—আন নিসা ঃ ১

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর সম্পর্ক মানুষকে ভিন্ন মতাবলম্বী মাতা-পিতার সাথে সদয় ব্যবহার ও সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করতে নিষেধ করে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ইসলামী আন্দোলনের শত্রু পক্ষের প্রথম সারিতে স্থান গ্রহণ করে। যদি তারা প্রকাশ্যে কুফরী শক্তির পক্ষাবলম্বন করে ; তাহলে মুসলমানদের ঐ মাতা-পিতার সাথে আত্মীয়তা ও সহৃদয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। মুসলমান ইসলামের শত্রুতাকারী মাতা-পিতার সাথে সদয় ব্যবহার করতে বাধ্য নয়। মদীনায় মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাইর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রা) আমাদের জন্য অতি উজ্জ্বল নমুনা স্থাপন করে গেছেন।

ইবনে জিয়াদের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর নবী আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রা)-কে ডেকে বলেন—"তুমি কি জান, তোমার পিতা কি কি বলেছে ?"

হযরত আবদুল্লাহ বললেন, "আমার পিতা-মাতা আপনার জন্যে কুরবান হোক—তিনি কি কি বলেছেন ?"

হুজুর (স) বললেন, "সে বলে, মদীনা ফিরে যাবার পর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা লাঞ্ছিত ব্যক্তিদেরকে তাড়িয়ে দেবে।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল (স) ! আল্লাহর কসম, তিনি যথার্থ কথাই বলেছেন। আল্লাহ সাক্ষী ! আপনিই সম্ভ্রান্ত। মদীনাবাসী অবগত আছে যে, আপনি এ শহরে আগমন করার আগে আমি আমার পিতার অত্যন্ত অনুগত ছিলাম। আমার চেয়ে বেশী অনুগত কেউ ছিল না। কিন্তু আজ আমি স্বহস্তে আমার পিতার শিরচ্ছেদ করলে যদি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (স) সন্তুষ্ট হন, তাহলে আমি এক্ষুণি তা করতে রাজি আছি।"

রাসূল (স) বলেন, "না, এরূপ করো না।"

মুসলিম সেনাবাহিনী মদীনায় প্রবেশ করার সময় আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রা) উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে পিতার গতিরোধ করে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "তুমি কি বলেছিলে যে, এবার মদীনায় ফিরে যাবার পর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ লাঞ্ছিতদেরকে তাড়িয়ে দেবে ? আল্লাহর কসম ! তুমি এক্ষুণি বুঝতে পারবে, তুমি সম্ভ্রান্ত না আল্লাহর রাসূল (স) সকল মানুষের চেয়ে অধিক সম্মানিত। আল্লাহর শপথ করে বলছি—আল্লাহর রাসূল (স) অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। আর আমার হাত থেকেও তোমার রেহাই নেই।"

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই দু'বার চীৎকার করে বললো, "হে খাজরায গোত্রের লোকেরা ! দেখ আমার পুত্রই আমাকে নিজের বাড়ীতে ফিরে যেতে

দিচ্ছে না।" তার চীৎকার সত্ত্বেও হযরত আবদুল্লাহ (রা) বার বার বলতে থাকেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স) অনুমতি না দেবেন, ততক্ষণ তোমাকে কিছুতেই মদীনায় প্রবেশ করতে দেবো না—আল্লাহর কসম !" কিছু সংখ্যক লোক হযরত আবদুল্লাহকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ (রা) একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। অবশেষে কিছু সংখ্যক লোক নবী (স)-কে এ বিষয়ে খবর দেন এবং সব কথা শুনে তিনি সংবাদ বাহকদেরকে বলেন, "যাও আবদুল্লাহকে গিয়ে বল, তার পিতাকে যেন ঘরে ফিরে যেতে বাধা না দেয়।" এ খবর আবদুল্লাহর নিকট পৌঁছে দেয়ার পর তিনি বলেন, "হাঁ, যদি আল্লাহর নবী অনুমতি দিয়ে থাকেন তাহলে সে মদীনায় প্রবেশ করতে পারে।"

ঈমানের সম্বন্ধ স্থাপিত হবার পর রক্তের সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও মানুষ পরস্পরের সাথে গভীর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং এ সম্পর্ক এতদূর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে যে, সকল মুসলমান নিজেদেরকে একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমতুল্য বিবেচনা করে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ

"সকল মু'মিন পরস্পরের ভাই।"—হুজুরাত ঃ ১০

একথা সংক্ষিপ্ত হলেও সম্পর্ক নির্ণয়ের এক স্থায়ী মানদন্ড দান করেছে। তিনি আরও বলেন—

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ط — الانفال : ٧٢

"যারা ঈমান আনয়ন করেছে, আল্লাহর পথে বাড়ী-ঘর পরিত্যাগ করেছে এবং জান-মাল দিয়ে জিহাদ করেছে, আর যারা তাদের আশ্রয় ও সাহায্য দান করেছে, তারা পরস্পরের পৃষ্ঠপোষক।"—আনফাল ঃ ৭২

উপরের আয়াতে যে পারস্পরিক পৃষ্ঠপোষকতার উল্লেখ করা হয়েছে তা শুধু সমসায়িক নর-নারী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং এ সম্পর্ক পরবর্তী বংশধরদের মধ্যেও বহাল থাকা বাঞ্ছনীয়। মোটকথা, মুসলমান উম্মাতের অগ্রবর্তীগণ পরবর্তীদের এবং পরবর্তীদের জন্যে মনে মনে ভালবাসা ও আন্তরিক প্রীতির ভাব পোষণ করে।

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ط وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ جَاءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○ — الحشر : ٩ ـ ١٠

"মুহাজিরদের আগমনের আগে থেকেই যারা মদীনার বাসিন্দা ছিল এবং ঈমান আনয়ন করেছিল (অর্থাৎ আনসার) তারা হিজরাতকারীদেরকে ভালোবাসতো এবং মুহাজিরদের মধ্যে গনীমাতের মাল বন্টন করা হলে তারা নিজেদের মনে এ সম্পদ প্রাপ্তির কোন আকাংখা পোষণ করতো না বরং নিজেরা আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও মুহাজির ভাইদেরকে প্রাধান্য দান করতো। আর যারা নিজেদের অন্তরকে কৃপণতা থেকে মুক্ত রেখেছে তারা কল্যাণ লাভ করার অধিকারী। যারা পরবর্তীকালে আসবে তারা বলবে, পরওয়ারদিগার ! আমাদের এবং আমাদের আগে যারা ঈমান আনয়ন করেছিল তাদের অপরাধগুলো মাফ করে দাও। আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোন মন্দ ধারণা জন্মাতে দিও না। হে প্রতিপালক ! তুমি অবশ্যই দয়ালু ও মেহেরবান।"—হাশর ঃ ৯-১০

ঈমানই ঐক্যের ভিত্তি

আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র গ্রন্থে মহান পয়গাম্বরদের দ্বারা গঠিত পবিত্র দলগুলোর কাহিনী বর্ণনা করে মু'মিনদের জন্যে কতিপয় উদাহরণ তুলে ধরেছেন। এসব আম্বিয়ায়ে কেরাম বিভিন্ন যুগে আগমন করেন এবং নিজ নিজ সময়ে ইসলামী কাফেলার নেতৃত্ব দান করেন। বর্ণিত উদাহরণগুলোতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, প্রত্যেক নবীই ঈমান ও আকীদার সম্পর্ককেই একমাত্র সম্পর্ক বিবেচনা করতেন এবং এ সম্পর্ক পরিত্যাগ করে অন্য কোন ধরনের সম্পর্কই কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক হতে পারে না।

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ○ قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ج

اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ق فَلاَ تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ط اِنِّىۤ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○ قَالَ رَبِّ اِنِّىۤ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ ط وَاِلاَّ تَغْفِرْلِىْ وَتَرْحَمْنِىۤ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ○- هود :٤٥-٤٧

"এবং নূহ তাঁর রবকে বললেন, পরওয়ারদিগার ! আমার পুত্র অবশ্যই আমার পরিবারভুক্ত, আর আপনার ওয়াদা সত্য এবং আপনি মহাজ্ঞানী। প্রত্যুত্তরে আল্লাহ বললেন, নূহ, সে তোমার পরিবার ভুক্ত নয়, কারণ তার কার্যকলাপ সৎলোকদের মত নয়। আর তুমি যে বিষয়ের তাৎপর্য অবগত নও সে বিষয়ে আমার নিকট কোন আবেদন করো না। নূহ বললেন, পরওয়ারদিগার ! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে আবেদন পেশ করা থেকে আপনার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমার প্রতি সদয় না হন তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হবো।"—হূদ ঃ ৪৫-৪৭

وَاِذِ ابْتَلٰىۤ اِبْرٰهِمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ط قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ط قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ط قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ○- البقرة : ١٢٤

"স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমকে তাঁর রব কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করেন তখন তিনি সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আল্লাহ বলেন, আমি তোমাকে মানবজাতির জন্যে ইমাম নিযুক্ত করছি। তিনি প্রশ্ন করলেন, আর আমার বংশধরদের মধ্য থেকে ? উত্তর দেয়া হলো, যালিমদের প্রতি আমার কোন ওয়াদা বর্তায় না।"— আল বাকারা ঃ ১২৪

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلاً ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○- البقرة : ١٢٦

"আর যখন ইবরাহীম দোয়া করলেন, হে প্রভু ! এ শহরকে শান্তির শহরে পরিণত কর আর এ শহরের বাসীন্দাদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান আনয়ন করে তাদের উত্তম শস্য ও ফলমূল দ্বারা রিয্‌ক দান কর। তখন আল্লাহ বললেন, আর যারা অমান্যকারী তাদেরও আমি দুনিয়ায় স্বল্প সংখ্যক দিনের জন্যে কিছুটা রিয্‌ক দান করবো। তবে পরিণামে এদের দোযখে নিক্ষেপ করবো এবং দোযখ অত্যন্ত মন্দ ঠিকানা।"— আল বাকারা ঃ ১২৬

হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর পিতা ও স্বগোত্রীয়দের গুমরাহীর পথে কায়েম থাকার মনোভাব দেখে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন এবং বলেন—

وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّىْ ز عَسٰٓى اَلاَّ اَكُوْنَ بِدُعَاۤءِ رَبِّىْ شَقِيًّا ○ - مريم :٤٨

"আমি আপনাদেরকে পরিত্যাগ করছি এবং আল্লাহকে ছেড়ে আপনারা যাদেরকে ডাকেন তাদেরকেও পরিত্যাগ করছি। আমি তো আমার রবকেই ডাকতে থাকবো। আশা করি আমার রবকে ডেকে বিফল হবো না।"— মরিয়াম ঃ ৪৮

আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর স্বগোত্রীয়দের কাহিনী বর্ণনাকালে মু'মিনদের সামনে এ বিষয়গুলো বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। তা অনুধাবন করা উচিত।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ج اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ز كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاۤءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ - الممتحنة : ٤

"তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তাঁরা যখন তাদের জাতিকে বললেন—তোমাদের এবং তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের বন্দেগী কর তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের ঐসব উপাস্যদের মোটেই মানি না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন না করবে।"

আসহাবে কাহাফ নামে পরিচিত যৌবনোদ্দীপ্ত সাহসী ব্যক্তিগণ যখন দেখতে পেলেন যে, তাঁদের দ্বীন ও ঈমানের অমূল্য সম্পদ নিয়ে নিজেদের দেশ, আত্মীয়-স্বজন, গোত্র ও পরিবারে বাস করার কোন অবকাশ নেই, তখন তাঁরা নিজেদের পরিবার-পরিজন ও স্ববংশীয় লোকদের পরিত্যাগ করলেন। তাঁরা নিজেদের জন্মভূমি থেকে হিজরাত করে ঈমানের সম্পদ নিয়ে নিজেদের পরওয়ারদিগারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন যেন ঈমানের দাবী অনুসারে একমাত্র আল্লাহর বান্দা হয়ে কোথাও বাস করার সুযোগ করে নেয়া যায়।

اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ۝ وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَآ اِذًا شَطَطًا ۝ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ط لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ ط فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۝ وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗٓا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْلَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ۝ -الكهف : ١٣-١٦

"তারা ছিল কয়েকজন যুবক। নিজেদের রবের উপর ঈমান এনেছিলো তারা। আর আমি তাদেরকে আরও হেদায়াত দান করেছিলাম। তারা সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলো, আকাশ ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী যিনি তিনিই আমাদের রব। আমরা তাঁকে ছেড়ে অন্য কোন মাবুদকে ডাকবো না। যদি তা করি তাহলে সেটা হবে খুবই অযৌক্তিক ব্যাপার। আর এ ঘোষণার সময় আমি তাদের অন্তরে শক্তি যুগিয়েছিলাম। (তারা) তারপর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, আমাদের স্বজাতি তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালককে ছেড়ে অন্য ইলাহ গ্রহণ করে বসে আছে। তারা তাদের আকীদা-বিশ্বাসের স্বপক্ষে কোন স্পষ্ট প্রমাণ কেন পেশ করছে না ? আল্লাহ সম্পর্কে যারা মিথ্যা উক্তি করে, তাদের চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে ? এখন চল তাদের এবং তাদের ইলাহদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর আমরা পর্বত গুহায় গিয়ে আশ্রয় নেই। তোমাদের রব তোমাদের প্রতি নিজের রহমাতের হাত প্রসারিত করবেন এবং তোমাদের জন্যে প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণও সরবরাহ করবেন।"—আল কাহাফ ঃ ১৩–১৬

হযরত নূহ (আ) ও হযরত লূত (আ)-এর বিবিদের কাহিনীও কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দু'জন মহান নবীর বিবিগণ ভিন্ন আকীদা পোষণ করতেন এবং শির্‌কে লিপ্ত ছিলেন। সেজন্যে উভয় পয়গাম্বরই তাঁদের বিবিদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ط كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ○ - التريم : ٦٦

"কাফিরদের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে আল্লাহ্ তাআলা নূহ ও লূতের বিবিগণের উদাহরণ পেশ করেছেন। এ দু'জন নারী আমার দু'নেক বান্দার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু তারা খেয়ানত করেছিল। তাই তাদের স্বামীগণও তাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারেনি। উভয় নারীকে আদেশ দেয়া হয়, যাও অন্যান্যদের সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর।"—আত তাহরীম ঃ ১০

সাথে সাথে মিসরের অত্যাচারী ও আল্লাহদ্রোহী বাদশা ফিরাউনের বিবির কাহিনীও ঈমানদারদের নমুনা হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ م اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۞ - التحريم : ١١

"ঈমানদারদের নসিহত করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা ফিরাউনের স্ত্রীর বিষয় উল্লেখ করেছেন। তিনি দোয়া করেছিলেন, পরওয়ারদিগার ! বেহেশতে তোমার নিকটে আমার জন্যে একখানা ঘর তৈরী কর, আমাকে ফিরাউন ও তার সকল অপকর্মের পরিণাম থেকে মুক্তি দাও এবং যালেমদের অনিষ্টকারিতা থেকেও আমাকে নিরাপদ রাখ।"

—আত তাহ্‌রীম ঃ ১১

এভাবেই কুরআন সকল ধরনের আত্মীয়তার উদাহরণ পেশ করেছে। হযরত নূহ (আ)-এর কাহিনীতে পিতৃ সম্পর্কের উদাহরণ রয়েছে। আবার হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনীতে পুত্র ও জন্মভূমির সম্পর্কের উদাহরণ

পেশ করা হয়েছে। আসহাবে কাহাফের কাহিনীতে আত্মীয়-স্বজন, গোত্র-বংশ, পরিবার-পরিজন, দেশ ও জন্মভূমির পরিপূর্ণ উদাহরণ এক সাথেই পেশ করা হয়েছে। হযরত নূহ (আ), লূত (আ) ও ফিরাউনের কাহিনীতে দাম্পত্য সম্পর্কের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। কুরআনের দৃষ্টিতে অতি নিকটাত্মীয়গণও ঈমানের পথ পরিত্যাগ করার পর মু'মিনের আত্মীয় থাকে না।

মধ্যবর্তী উম্মাত

মহান পয়গাম্বরগণ এবং তাঁদের সম্পর্ক ও আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে আলোচনা করার পর আমরা মধ্যবর্তী উম্মাত আখ্যাপ্রাপ্ত দলের অবস্থা পর্যালোচনা করবো। আমরা এ উম্মাতের মধ্যেও অগণিত দৃষ্টান্ত ও নমুনার সন্ধান পাই। আল্লাহ্ তাআলা মানুষের জন্যে আদিকাল থেকে যে জীবন বিধান নাযিল করেছেন সে পথ ধরেই আমাদের এ মধ্যবর্তী উম্মাত চলা শুরু করেছে। যখনই কোন নিকটাত্মীয়ের সাথে ঈমানের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে—অন্য কথায় মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ঐক্য সূত্রই ছিন্ন হয়ে গেছে ; এখন একই গোত্র, একই বংশ ও একই পরিবারের লোকেরা ঈমানের দাবী মুতাবিক পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা মু'মিনদের পরিচয় বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَاۤدُّوْنَ مَنْ حَاۤدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْۤا اٰبَاۤءَهُمْ اَوْ اَبْنَاۤءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْعَشِيْرَتَهُمْ ط اُولٰۤئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ط وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط اُولٰۤئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ط اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ○ المجادلة :٢٢

"যারা আল্লাহ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাসী তাদেরকে তুমি আল্লাহর দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে দেখবে না। যদিও ঐসব ব্যক্তি তাদের বাপ, ভাই ও পুত্র অথবা নিকটাত্মীয় হয়। তারাই হচ্ছে ঐসব লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ্ তাআলা ঈমান প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর গোপন হস্তে তাদের সাহায্য করেছেন এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যেখানে প্রবাহিত রয়েছে স্রোতস্বিনী এবং যেখানে তারা চিরকাল

থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি তারাও সন্তুষ্ট। তারাই হচ্ছে আল্লাহর দলভুক্ত। আর আল্লাহর দলই কল্যাণ লাভ করবে।"— মুজাদিলা ঃ ২২

আমরা দেখতে পেয়েছি হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর সাথে তাঁর চাচা আবু লাহাব এবং তাঁর গোত্রীয় আত্মীয় আমর বিন হিশামের (আবু জাহেল) সাথে রক্তের সকল বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। মক্কা থেকে আগত মুহাজিরগণ তাঁদের নিকটাত্মীয় ও স্বগোত্রীয়দের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং বদরের যুদ্ধে তাঁরাই প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করে যান। অপর দিকে মক্কার মুহাজির ও মদীনার আনসারগণের মধ্যে ঈমানের ভিত্তিতে মযবুত সম্পর্ক কায়েম হয়ে যায়। তাঁদের সম্পর্ক সহোদর ভাইয়ের মতই হয়ে যায় এবং রক্ত ও বংশগত আত্মীয়ের চেয়েও বেশী দৃঢ় প্রমাণিত হয়। এ নতুন সম্পর্ক মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। আরব অনারব নির্বিশেষে সকল মুসলমানই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সোহাইব রুমী, বিলাল হাবশী (আবিসিনিয়ার অধিবাসী) ও সালমান ফারসী (পারস্য দেশীয়) নিজেদের জন্মভূমি, মাতৃভাষা এবং গোত্রবর্ণের পার্থক্য ভুলে যান। তাদের গোত্রীয় বিরোধ, বংশ কৌলিন্য, জন্মস্থান ও জাতীয় গৌরবের অনুরাগ শূন্যে বিলীন হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার প্রিয় নবী (সা) তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, (এসব পরিত্যাগ করো এগুলো এখন দুর্গন্ধময় লাশে পরিণত হয়েছে)। তিনি আরও এরশাদ করেন—

ليس منا من دعا الى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية -

"যে ব্যক্তি জাহেলী যুগের বিদ্বেষ ও বিভেদের প্রতি আহবান জানায় ; সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে বিদ্বেষ ও বিভেদের ভিত্তিতে সংগ্রাম করে সেও আমাদের দলভুক্ত নয় এবং যে বিদ্বেষ ও বিভেদ সৃষ্টির আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সেও আমাদের দলভুক্ত নয়।"

দারুল ইসলাম ও দারুল হরব

মোদ্দাকথা, ইসলামের সংস্পর্শে বিদ্বেষ ও বিভেদের সকল শ্লোগান বন্ধ হয়ে যায়। বংশ, গোত্র ও আঞ্চলিক পার্থক্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট জাতীয়তা দুর্গন্ধময় লাশ হিসেবে পরিত্যক্ত হয়। দেশ, মাটি, রক্ত ও মাংসের সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করে মানুষের দৃষ্টি উর্ধমুখী হয়। যেদিন থেকে মুসলমানের দৃষ্টিভংগী সংকীর্ণতার গন্ডী ভেঙ্গে দিয়ে দিগন্ত রেখা পর্যন্ত প্রসারিত হয়, সে দিনই মুসলমানদের আবাসভূমি নাম ধারণ করে। কারণ সেখানে ঈমানের শাসন

প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াতের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃতি লাভ করে। ইসলামের এ সুশীতল ছায়াতলে যারা বসবাস করেন, তাঁরাই এ দেশের নিরপত্তা বিধান করেন। এ দেশের প্রতিরক্ষা ও ইসলামী শাসনাধীন এলাকার সীমানা সম্প্রাসারণের প্রচেষ্টায় যাঁরা প্রাণত্যাগ করেন, তাঁরাই হন শহীদ। যাঁরাই ইসলামী আকীদার রত্নহার নিজেদের গলায় পরিধান করেন এবং ইসলামী শরীয়াতকে তাঁদের জীবনের প্রতিপালনীয় বিধান হিসেবে মেনে নেন, তাঁদের সকলেরই আশ্রয়স্থল হচ্ছে দারুল ইসলাম। এমন কি যারা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ না করেও ইসলামী শরীয়াতের শাসন ব্যবস্থা মেনে নেয় তারাও জিম্মি হিসেবে এ রাষ্ট্রের সকল সুখ-সুবিধা ভোগ করতে পারে। কিন্তু যে দেশে ইসলামী শাসনের পতাকা উত্তোলন করা হয়নি এবং যেখানে ইসলামী শরীয়াত বাস্তবায়িত নয়, সে দেশে মুসলিম ও জিম্মি উভয়ের জন্যেই দারুল হরব। মুসলমান সর্বদায়ই দারুল হরবের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে প্রস্তুত থাকবে। এ দারুল হরব যদি তার জন্মভূমিও হয়, সেখানে যদি তার আত্মীয়-স্বজন বসবাস করে এবং মুসলমানদের ধন, সম্পত্তি বা অন্যবিধ পার্থিব বিষয়ে যদি এ দারুল হরবের সাথে কোন প্রকারের স্বার্থ জড়িত থাকে, তবুও প্রয়োজনবোধে সে দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে মুসলমান কখনো পশ্চাদপদ হবে না। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। অথচ মক্কা ছিল তাঁর পবিত্র জন্মভূমি। তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও স্ববংশের লোকেরা সেখানেই বসবাস করছিল। তিনি ও তাঁর প্রিয় সহচরগণের বাড়ী-ঘর ও ক্ষেত-খামার মক্কাতেই ছিল। মদীনা অভিমুখে হিজরাত করার সময় তাঁরা এসব বিষয় সম্পত্তি ছেড়ে গিয়েছিলেন। তথাপি ইসলামের সামনে নতি স্বীকার করে আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াতের শাসন মেনে না নেয়া পর্যন্ত মক্কার মত পবিত্র শহরও দারুল ইসলামে পরিণত হয়নি।

এটাই হচ্ছে ইসলাম। মুখে কিছু শব্দ উচ্চারণ, বিশেষ কিছু অনুষ্ঠান পালন অথবা বিশেষ কোন বংশে বা দেশে জন্ম গ্রহণের নাম ইসলাম নয়।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○ - النساء : ٦٥

"না (হে মুহাম্মাদ !) তোমার রব-এর কসম। তারা কখনো মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের সকল বিতর্কমূলক বিষয়ে তোমাকেই একমাত্র মীমাংসাকারী হিসেবে গ্রহণ করে নেয় এবং তোমার

সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অন্তরে কোন দ্বিধা-সংশয় পোষণ না করে বরং সন্তুষ্টচিত্তে তোমার প্রদত্ত রায় গ্রহণ করে নেয়।"— আন নিসা ঃ ৬৫

এ আদর্শেরই নাম ইসলাম এবং এ আদর্শে পরিচালিত রাষ্ট্রই দারুল ইসলাম। কোন দেশের মাটি, কোন বিশেষ গোত্র, কোন বিশেষ বংশ বা পরিবারের নাম ইসলাম বা দারুল ইসলাম নয়।

ইসলাম মানবতাকে সকল শিকলের বন্ধন মুক্ত করে দিয়েছে। এসব শিকল মানুষকে নিম্নমুখী করে বেঁধে রেখেছিল। বন্ধন মুক্তির ফলে সে আকাশের ঊর্ধে আরোহণ করার ক্ষমতা লাভ করেছে। ইসলাম রক্তের বাঁধন ও পশু প্রবৃত্তির তাড়না থেকে মানবতার মুক্তি দিয়ে তাকে ফেরেশতার চেয়েও উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে যে, মুসলমান যে মাতৃভূমিকে ভালবাসবে এবং যার প্রতিরক্ষার জন্যে জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকবে—তা নিছক একখন্ড ভূমি নয়। যে জাতীয়তা মুসলমানের পরিচয় ঘোষণা করবে, তা কোন গভর্নমেন্ট প্রদত্ত সংজ্ঞা মুতাবিক গঠিত জাতি নয়। মুসলমানের আত্মীয়তা ও ঐক্যসূত্র রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠে না। যে পতাকাকে সমুন্নত রাখার জন্যে মুসলমান জীবন দান করতেও গৌরববোধ করবে ; তা কোন নির্দিষ্ট দেশের প্রতীক নয়। যে বিজয়ের জন্যে মুসলমান সর্বদা সচেষ্ট থাকবে এবং যা অর্জিত হলে মুসলমান আল্লাহর দরবারে মাথা নত করবে, তা নিছক সামরিক বিজয় নয় বরং তা হবে মহাসত্যের বিজয়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন—

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۙ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۙ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝ - النصر

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, তখন তুমি জনগণকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে। সে সময় নিজের রবের প্রশংসা ও গুণকীর্তন কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও। নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুলকারী।"— নাসর

এ বিজয় শুধু ঈমানের পতাকা তলেই অর্জিত হয়। অপরাপর পতাকার বিদ্বেষাত্মক শ্লোগান এখানে ব্যবহৃত হয় না। আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও তাঁরই শরীয়াতের বাস্তবায়নের জন্যে এখানে জিহাদ অনুষ্ঠিত হয়। অন্য কোন স্বার্থ বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে নয়। উপরে যে দারুল ইসলামের পরিচয় পেশ করা

হয়েছে তারই প্রতিরক্ষার জন্যে জিহাদের প্রয়োজন—জন্মভূমি বা জাতির মর্যাদা রক্ষা করার মনোভাব নিয়ে নয়। বিজয়ের পর বিজয়ী সেনাবাহিনী শুধু গনিমাতের সম্পদ হস্তগত করণের জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে না।

পার্থিব খ্যাতি অর্জন বা বীরত্ব প্রদর্শনও এ বিজয়ের উদ্দেশ্য নয়। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই মু'মিনের পরম কাম্য। এ জন্যে, বিজয়ী বাহিনী তাসবীহ ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে পরম করুণাময় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে অতিমাত্রায় ব্যগ্র হয়ে উঠে। দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ জিহাদের প্রেরণা জাগ্রত করে না। পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদির নিরাপত্তা বিধানও জিহাদের লক্ষ্য নয়। তবে দেশ, জাতি, পরিবার ও সন্তানদেরকে বাতিল আদর্শের আক্রমণ থেকে মুক্ত করা এবং তাদের দ্বীন ও ঈমানের নিরাপত্তা বিধানের জন্যে জিহাদ অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "এক ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে লড়াই করে, অপর এক ব্যক্তি মর্যাদা লাভের জন্যে। আবার কেহবা লোক দেখানোর জন্যে। বলুন তো, এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে লড়ছে ?" উত্তরে তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে উচ্চমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে লড়াই করে, একমাত্র সে-ই আল্লাহর পথে লড়ছে।"

শুধু আল্লাহর পথে লড়াই করার মাধ্যমেই শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করা যেতে পারে। অন্য কোন উদ্দেশ্যে লড়াই করে এ মর্যাদা হাসিল করা যায় না।

যে দেশ মুসলমানদের ঈমান-আকীদার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যায়, দ্বীনি আদেশ নিষেধ প্রতিপালনে বাধা দেয় এবং যে দেশে আল্লাহর শরীয়াত পরিত্যক্ত হয়েছে, সে দেশ দারুল হরব।

এ দেশে যদি মুসলমানদের আত্মীয়-স্বজন, পরিবার ও বংশের লোকজন বাস করে, সেখানে যদি মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা জায়গা-জমি থাকে এবং এ দেশের নিরাপত্তার সাথে যদি মুসলমানদের আর্থিক স্বার্থের প্রশ্নও জড়িত থাকে তথাপি তার দারুল হরবের চরিত্র পরিবর্তন করা যাবে না। পক্ষান্তরে যে দেশে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা সর্বপ্রকার চাপমুক্ত ও তার প্রাধান্য স্বীকৃত এবং যে দেশে ইসলামী শরীয়াত বাস্তবে রূপ লাভ করে, সে দেশ দারুল ইসলাম আখ্যা লাভ করবে। সে দেশে মুসলমানগণ তাদের পরিবার-পরিজনসহ বসবাস না করুক, তাদের বংশ ও গোত্রের লোক সেখানে না থাকুক এবং সে দেশের সাথে মুসলমানদের ব্যবসা বাণিজ্য বা অন্য কোন অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত না থাকুক, তবুও সে দেশ দারুল ইসলাম।

যে দেশে ইসলামী আকীদার শাসন চলে, ইসলামই যে দেশে জীবন বিধানরূপে স্বীকৃতি লাভ করে এবং আল্লাহর শরীয়াত যে দেশে কার্যকর হয়, সে দেশই মুসলমানদের স্বদেশ। স্বদেশের এ অর্থই মানবতার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। অনুরূপভাবে আকীদা-বিশ্বাস এবং জীবন বিধানের ভিত্তিতেই ইসলামী জাতীয়তা গড়ে উঠে এবং মানুষের মুনষ্যত্বকেই সেখানে বিকশিত করে তোলা হয়।

পরিবার, গোত্র, জাতি, বংশ, বর্ণ ও ভৌগলিক অঞ্চলের ভিত্তিতে ঐক্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা ছিল অন্ধকার যুগের চিন্তাধারা। যে সময় মানুষের আধ্যাত্মিকতা অত্যন্ত নিম্নস্তরে ছিল, তখন তারা এসব বিষয়কে ঐক্য সূত্র হিসেবে বিবেচনা করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) এগুলোকে দুর্গন্ধময় গলিত লাশ আখ্যা দিয়েছেন। ইয়াহুদী সম্প্রদায় নিজেদের বংশগত জাতীয়তার ভিত্তিতে আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় হবার দাবী পেশ করেছিল। আল্লাহ্ তাআলা তাদের এ দাবী প্রত্যাখ্যান করে তাদের মুখের উপরই নিক্ষেপ করেন এবং বলেন যে, সকল যুগ, সকল বংশ, সকল গোত্র এবং সকল স্থানের জন্যেই আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য, মর্যাদা ও সম্ভ্রম লাভ করার একটি মাত্র মানদন্ড রয়েছে এবং তা হচ্ছে ঈমান বিল্লাহ। এরশাদ হচ্ছে—

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ط قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ
حَنِيْفًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○ قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ
اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ
وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ
رَّبِّهِمْ ج لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ز وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○
فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ج وَاِنْ تَوَلَّوْا
فَاِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ ج فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ج وَهُوَ
السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ صِبْغَةَ اللّٰهِ ج وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ
صِبْغَةً ز وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ○ - البقرة : ١٣٥-١٣٦

"ইয়াহুদী ও নাসারা সম্প্রদায় বলে, ইয়াহুদী অথবা নাসারা হয়ে যাও তাহলে সুপথ লাভ করবে। তাদের বল, না, সব কিছু ছেড়ে ইবরাহীমের

মিল্লাতভুক্ত হয়ে যাও। আর ইবরাহীম মুশরিক ছিলেন না। বল, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি আর তার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁদের বংশধরদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদের যা যা দেয়া হয়েছে সেসব বিষয়ের প্রতিও ঈমান আনয়ন করেছি। আমরা তাদের কোন একজনের মধ্যেও কোন পার্থক্য করি না—আমরা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পিত। তারপর তারা যদি এসব বিষয়ের প্রতি তোমাদেরই মত ঈমান আনয়ন করে, তাহলে হেদায়াত লাভ করবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তারা হঠধর্মী হয়ে গেছে। এ অবস্থায় আল্লাহ-ই তোমাদের জন্যে যথেষ্ট। তিনি সবকিছুই জানেন ও শুনেন। আল্লাহর রঙে নিজেকে রঞ্জিত কর। তাঁর রঙের চেয়ে উত্তম রঙ আর কি হতে পারে? আর আমরা তাঁরই বন্দেগী করে থাকি।"

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হচ্ছে মুসলিম উম্মাত। কারণ তারা গোত্র, বর্ণ, জাতি ও ভৌগলিক এলাকার পার্থক্য ভুলে গিয়ে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর পতাকাতলে সমবেত হয়েছে।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط - ال عمران : ١١٠

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত। মানবজাতির পথ প্রদর্শনের ও নেতৃত্বদানের জন্যে তোমাদের গঠন করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের ও নেকীর আদেশ দাও এবং মন্দ ও গুনাহের কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখ এবং নিজেরা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ।"— আলে ইমরান ঃ ১১০

আল্লাহর বান্দাদের নিয়ে গঠিত এ বিপ্লবী বাহিনীর প্রথম সারিতে আরবের সম্ভ্রান্ত বংশজাত হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) রয়েছেন, ইথিওপিয়ার হযরত বেলাল (রা), রোমের হযরত সোহাইব (রা) এবং পারস্যের হযরত সালমান (রা) সকলেই সমান মর্যাদা ও অধিকারের ভিত্তিতে এ দলের সদস্য হিসেবে শামিল রয়েছেন। পরবর্তীকালেও এ উম্মাত বংশ, গোত্র, বর্ণ ও অঞ্চল নির্বিশেষে এক আশ্চর্যজনক ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। তাঁদের জাতীয়তা ছিল তাওহীদ। তাদের মাতৃভূমি ছিল দারুল ইসলাম। আল্লাহর সার্বভৌমত্বই ছিল তাদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং কুরআন ছিল তাদের শাসনতন্ত্র।

দেশ ও জাতিবিদ্বেষ তাওহীদের পরিপন্থী

মাতৃভূমি, জাতীয়তা এবং পারস্পরিক সম্পর্কের উপরোক্ত ধারণা-বিশ্বাসনয়ায় ইসলামের দিকে আহবানকারীদের মস্তিষ্কে অংকিত হয়ে যাওয়া খুবই প্রয়োজন।

তাদের নিজেদের অন্তর থেকে জাহেলিয়াতের সকল প্রভাব মুছে ফেলতে হবে। মহাসত্যের অনুসারী দলের সদস্যদের মন-মস্তিষ্ক জাহেলিয়াতের সকল প্রকার প্রভাব এবং বর্তমান দুনিয়ার জাতি পূজা, মাতৃভূমির পূজা, পার্থিব স্বার্থের পূজা ইত্যাদির আকারে প্রচলিত সকল প্রকারের শির্ক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে। শিরকের সকল উল্লেখযোগ্য নমুনাগুলোকে আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফের একই আয়াতে একত্রিত করে দিয়েছেন এবং এগুলোকে পাল্লার একদিকে রেখে অপরদিকে ঈমান ও ঈমানের দাবীগুলোকে রেখেছেন এবং মানুষকে এ দুয়ের মধ্যে যেকোন একটি বাছাই করে নেয়ার স্বাধীনতা দান করেছেন।

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ۨ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○ - التوبة : ٢٤

"হে নবী ! বলে দাও, তোমাদের পিতা, পুত্র, ভাই, স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজন এবং সঞ্চিত ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সুখের বাসভবনটি কি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদের তুলনায় অধিকতর প্রিয় ? যদি তাই হয় তাহলে আল্লাহর সিদ্ধান্তের অপেক্ষা কর। আল্লাহ কখনো পথভ্রষ্টদেরকে হেদায়াত দান করেন না।"

কাজেই দ্বীনের প্রতি আহবানকারীদের অন্তরে ইসলাম ও জাহেলিয়াত এবং দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের প্রকৃতি ও পরিচয় সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকা উচিত নয়। কারণ সন্দেহের পথ ধরেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। যে দেশে ইসলামের প্রধান্য নেই, যেখানে ইসলামী শরীয়াত বাস্তবায়িত হয়নি এবং যে ভূখন্ডের আইন-কানুন ও শাসন ব্যবস্থা ইসলামের নির্দেশানুযায়ী পরিচালিত হয় না, তা দারুল ইসলাম নয়। ঈমানের বহির্ভূত যা কিছু আছে তাই কুফর এবং ইসলামের বাইরে যা আছে তা শুধুই জাহেলিয়াত এবং সত্যের বিপরীত সবকিছুই মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়।

দশম অধ্যায়

সুদূর প্রসারী পরিবর্তনের প্রয়োজন

কিভাবে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে হবে

মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে আহবান করার সময় প্রতিপক্ষ মুসলমান হোক কিংবা অমুসলমান, আমাদের একটি বিষয় সর্বদাই মনে রাখতে হবে। এ বিষয়টি ইসলামের প্রকৃতির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ইসলামের ইতিহাস থেকেও বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। সংক্ষেপে বিষয়টি হচ্ছে এই যে, ইসলাম মানব জীবন ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে যে ধারণা দেয় তা ব্যাপক এবং অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ ধারণা বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত জীবন বিধান তার সকল শাখা প্রশাখা সহ অন্যান্য জীবনাদর্শ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জীবন সম্পর্কিত ইসলামী ধারণা-বিশ্বাস প্রাচীন ও আধুনিক সকল প্রকার জাহেলিয়াতের বিরোধী। অবশ্য জীবন বিধানের ভিত্তিতে বিস্তারিত ব্যবস্থা প্রণয়নের সময় জাহেলিয়াতের কোন কোন বিষয় ইসলামের কোন কোন বিষয়ের সাথে সাদৃশাত্মক হতে পারে। কিন্তু যে মৌলিক ধারণা-বিশ্বাস থেকে এসব বিস্তারিত বিধান রচনা করা হয় তা বরাবরই জাহেলিয়াতের সম্পূর্ণ বিপরীত। মানুষের জ্ঞাত সকল প্রকার জীবনাদর্শই ইসলামী জীবন দর্শনের দৃষ্টিতে জাহেলিয়াত।

ইসলামের প্রথম কাজ হচ্ছে তার নিজস্ব ঈমান-আকীদার ভিত্তিতে মানুষের জীবন যাত্রার পরিবর্তন সাধন করে নিজস্ব ছাঁচে গড়ে তোলা, আল্লাহ তাআলার দেয়া একটি বাস্তবমুখী জীবন বিধান অনুসারে মানব সমাজের চলার পথ নির্দেশ করা। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাতকে মানব সমাজের জন্যে এক বাস্তব নমুনা হিসেবে পেশ করেছেন। তিনি বল্লেন—

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط - ال عمران : ١١٠

"তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মাত—মানব সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্যে তোমাদের উত্থিত করা হয়েছে। তোমরা নেকীর আদেশ দাও এবং অন্যায় থেকে মানুষকে বিরত রাখ। আর নিজেরা আল্লাহর উপর ঈমান রাখ।"

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ
وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط -الحج : ١٤

"(এরা হচ্ছে ঐ দল) যাদেরকে ভূপৃষ্ঠে ক্ষমতাদান করলে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, সৎকাজের আদেশ দান করে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে।"—আল হাজ্জ ঃ ৪১

ইসলাম দুনিয়ায় প্রচলিত জাহেলিয়াতের সাথে কোন আপোষ রফা অথবা জাহেলিয়াতের পাশাপাশি সহঅবস্থানের নীতি গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। দুনিয়ায় যেদিন সে প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল সেদিনই সে জাহেলিয়াতের সাথে আপোষ বা সহঅবস্থান করতে রাযী হয়নি—আজকের দুনিয়াতেও রাযী নয় এবং ভবিষ্যতেও কখনো রাযী হবে না। জাহেলিয়াত যে যুগেরই হোক না কেন, তা জাহেলিয়াত ছাড়া আর কিছুই নয়। আর জাহেলিয়াতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বন্দেগী পরিহার এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করা। আল্লাহর পরিচয়হীন অন্ধকার উৎস থেকে জীবন যাপনের রীতিনীতি, আইন-কানুন ও ব্যবস্থা পত্র গ্রহণ করাই জাহেলিয়াতের ধর্ম। অপরদিকে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ এবং জাহেলিয়াত পরিত্যাগ করে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের দিকে ছুটে আসার জন্যে আহবান জানানোই ইসলামের প্রকৃতি।

ইসলাম কোন যুগ ও কালের গন্ডীতে আবদ্ধ নয়---বরং সকল যুগ ও সকল কালেই এ জীবন বিধান মানুষের জন্যে কল্যাণকর। মানুষকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোকজ্জল হেদায়াতের পথে টেনে নিয়ে আসাই ইসলামের উদ্দেশ্য। আরও স্পষ্ট ভাষায় বলতে হয়, নিজেদেরই ইচ্ছা মত মানুষের বন্দেগী করতে রাযী হয়ে যাওয়াই জাহেলিয়াত। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক শক্তিশালী লোক গায়ের জোরে আল্লাহর দেয়া বিধান পরিত্যাগ পূর্বক নিজেদের খেয়াল খুশী মোতাবিক আইন-কানুন রচনা করে সমাজের উপর চাপিয়ে দেয় এবং সমাজ তা মেনে নিয়ে আইন প্রণেতাদের বান্দা হয়ে যায়। ইসলাম বলে, সমগ্র মানব গোষ্ঠী এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর বন্দেগী করবে এবং সকল আকীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, আইন-কানুন, গ্রহণ ও বর্জনের মানদন্ড ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহরই নিকট থেকে গ্রহণ করবে। সৃষ্ট জীবের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে শুধু আল্লাহরই অধীন হয়ে জীবন যাপন করবে।

ইসলামের প্রকৃতিই এরূপ। দুনিয়ায় ইসলাম যে ভূমিকা পালন করছে তা থেকেই আমাদের একথার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভবিষ্যতেও সে একই

ভূমিকা পালন করবে। আমরা মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে যাদের সামনেই ইসলামের বাণী পেশ করবো, তাদের নিকট ইসলামের উপরোক্ত ভূমিকাও অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরবো।

আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হোক অথবা জীবন-বিধানের ক্ষেত্রে ; ইসলাম জাহেলিয়াতের সাথে কোন আপোষ-রফা করতে প্রস্তুত নয়। এক সাথে এক স্থানে, হয় ইসলাম থাকবে অন্যথায় জাহেলিয়াত। অর্ধেক ইসলাম ও অর্ধেক জাহেলিয়াত মিলেমিশে থাকার কোন ব্যবস্থাই ইসলামে নেই। এ ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে যে, মহাসত্য একটি অবিভাজ্য একক। যেখানে মহাসত্যের ধারক-বাহক কেহই নেই সেখানে মিথ্যা বা জাহেলিয়াত রয়েছে। সত্য ও মিথ্যা অথবা হক ও বাতিলের সংমিশ্রণ, আপোস অথবা সহ-অবস্থানের কোনই অবকাশ নেই। হয় আল্লাহর আদেশ মেনে চলতে হবে, না হয় জাহেলিয়াতের—হয় আল্লাহর শরীয়াত সমাজে বাস্তবায়িত হবে অন্যথায় মানুষের খেয়াল-খুশি ও স্বেচ্ছাচারের রাজত্ব চলবে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ط

"(হে নবী !) আল্লাহর নাযিল করা বিধান মুতাবিক তাদের মধ্যে বিচার ফায়সালা কর এবং তাদের খেয়াল খুশির প্রতি কোন গুরুত্ব দিও না। তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাক, অন্যথায় তারা তোমাকে আল্লাহর নাযিল করা বিধান থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করবে।"

—মায়েদা ঃ ৪৯

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ج وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ج وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ج

"এ সত্যের প্রতি তাদের আহবান করে যাও এবং তোমাদের যেরূপ আদেশ করা হয়েছে তদনুসারে অটল হয়ে থাক এবং তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।"—শুরা ঃ ১৫

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ط وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ لاَيَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○ - القصص : ٥٠

"যদি তারা তোমার ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে জেনে রাখো, তারা নিজেদের খেয়াল-খুশিরই অনুসরণ করছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর হেদায়াতের পরোয়া না করে নিজেদের খাহেশের অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? আল্লাহ কখনো যালিমদের হেদায়াত দান করেন না।"— আল কাসাস ঃ ৫০

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ط وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ج وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ○ - الجاثية : ١٨-١٩

"(হে নবী!) আমি তোমাকে একটি স্পষ্ট শরীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং এ শরীয়াত মেনে চল এবং অজ্ঞ লোকদের খেয়াল-খুশির অনুকরণ করো না। আল্লাহর অসন্তুষ্টির মুখে তারা তোমার কোন উপকারেই আসবে না। অবশ্যই যালিমরা পরস্পরের বন্ধু আর আল্লাহ পরহেযগারদের পৃষ্ঠপোষক।"— আল জাসিয়া ঃ ১৮–১৯

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ط وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○ - المائدة : ٥٠

"তারা কি জাহেলিয়াতের বিচার-ফায়সালা চায়। অথচ আল্লাহর প্রতি যারা ঈমান আনয়ন করেছে তাদের জন্যে আল্লাহর চেয়ে উত্তম সিদ্ধান্তকারী কে হতে পারে?"— আল মায়েদা ঃ ৫০

এসব আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, পথ মাত্র দু'টিই রয়েছে। তৃতীয় কোন পথ নেই। হয় আল্লাহ ও রাসূল (সা)-এর নির্দেশ মেনে নিতে হবে। অন্যথায় নফসের খাহেশ মুতাবিক জীবন যাপন করতে হবে। হয় আল্লাহর ফায়সালা মেনে নিতে হবে অন্যথায় জাহেলিয়াতের সামনে মাথা নত করতে হবে। আল্লাহর নাযিল করা বিধানকে সকল বিষয়ে মীমাংসার মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ না করার অনিবার্য পরিণতি হবে আল্লাহর নির্দেশ পরিহার ও অমান্য করা। আল্লাহর কিতাবে উপরোক্ত আয়াতগুলোর উল্লেখ থাকার ফলে এ বিষয়ে আর কোন বিতর্কের অবকাশ মাত্র নেই।

ইসলামের প্রকৃত লক্ষ্য

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে, দুনিয়ায় ইসলামের প্রধান কাজ হচ্ছে মানব সমাজের নেতৃত্ব থেকে জাহেলিয়াতের উচ্ছেদ সাধন করে নেতৃত্বের রশি নিজ হাতে গ্রহণ করা এবং ক্রমে ক্রমে তার বৈশিষ্ট্যময় স্বাতন্ত্রের অধিকারী নিজস্ব জীবন বিধান কার্যকরী করা। এ সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবতার কল্যাণ সাধন ও উন্নয়ন। স্রষ্টার নিকট নতি স্বীকার এবং মানুষ ও সৃষ্টজগতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের মাধ্যমেই এ উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে। এ দ্বীনের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে আল্লাহ তাআলার বাঞ্ছিত উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দেয়া এবং তাকে নফসের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা। হযরত রাবী বিন আমর (রা) পারস্য সেনাপতি রুস্তুমের প্রশ্নের জবাব দান প্রসঙ্গে এ লক্ষ্যের বিষয়ই উল্লেখ করেছিলেন। রুস্তুম জিজ্ঞেস করেছিলো, "তোমরা এখানে কেন এসেছ?" রাবী (রা) বলেছিলেন, "আল্লাহ তাআলা এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যেন আমরা মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর বন্দেগীতে নিয়োজিত করতে পারি। দুনিয়ার সংকীর্ণ স্বার্থের গোলামী থেকে মানুষকে বের করে নিয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রশস্ত ক্ষেত্রের সন্ধান দান করতে পারি। আর মানুষের রচিত জীবন বিধানের কঠোর বন্ধন ছিন্ন করে যেন তাদের ইসলামী ন্যায়-নীতির সুফল ভোগ করার সুযোগ করে দিতে পারি।"

মানুষ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মতবাদ ও ভাবধারার আকারে নিজের প্রবৃত্তির বাসনাকে তুলে ধরে। ইসলাম এসব অজ্ঞতাপ্রসূত মতবাদ ও ভাবধারার সমর্থন যোগানোর জন্যে নাযিল হয়নি। ইসলামী দাওয়াতের সূচনাতেই এ জাতীয় মতবাদ ও দৃষ্টিভংগী বিরাজমান ছিল। আজকের দুনিয়ায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় অঞ্চলেই মানব প্রবৃত্তি রচিত মতবাদ বিরাজ করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। ইসলাম কখনো স্বার্থপর মানুষের রচিত এসব মতবাদ সমর্থন করে না। বরং আল্লাহ প্রদত্ত এ জীবন বিধান মানব রচিত ধ্যান-ধারণা, আইন-কানুন ও রীতিনীতির মূলোচ্ছেদ করে মানব জীবন সম্পর্কে নতুন আকীদা-বিশ্বাস গড়ে তোলার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সমীপে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ভিত্তিতে এক নতুন জগত সৃষ্টি করতে এসেছে। কোন কোন সময় ইসলামের বিশেষ কোন অংশকে জাহেলিয়াতের সাথে সঙ্গতিশীল মনে হয়। কিন্তু আসলে সে অংশগুলো জাহেলিয়াত অথবা জাহেলিয়াতের অংশ নয়। ছোটখাট বিষয়ে এ ধরনের সাদৃশ্য নেহায়েতই আকস্মিক ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে উভয় আদর্শের উৎসমূল পরস্পর বিরোধী। ইসলামরূপী বিশাল বৃক্ষটির বীজ বপন, অংকুরোদগম ও ক্রমবিকাশের মাধ্যমে পূর্ণত্ব লাভ ঘটেছে আল্লাহর জ্ঞানের উৎস থেকে। পক্ষান্তরে জাহেলিয়াতের জন্ম হয়েছে মানুষের স্বার্থপর মানসিকতার আবর্জনাময় স্থানে।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِيْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ط - الاعراف : ٥٨

"ভাল জমি আল্লাহর অনুমতিক্রমে উত্তম ফসল উৎপন্ন করে। পক্ষান্তরে খারাপ জমিতে অতি সামান্যই ফসল জন্মে।"— আরাফ ঃ ৫৮

আধুনিক কিংবা প্রাচীন যাই হোক না কেন, জাহেলিয়াত অপবিত্র ও বিভ্রান্তিকর। বিভিন্ন যুগে তার রূপ ও বেশ ভূষা পরিবর্তিত হলেও তার মূল সর্বদা-ই স্বার্থপর মানুষের খেয়াল-খুশির আবর্জনায় প্রোথিত। জাহেলিয়াত কখনো অজ্ঞতা ও ব্যক্তি স্বার্থের গন্ডী থেকে বের হতে পারে না। খুব বেশী হলে সে মুষ্টিমেয় মানুষ, বিশেষ শ্রেণী, বিশেষ গোত্র অথবা বিশেষ জাতির স্বার্থরক্ষার আবর্তেই ঘুরপাক খেতে বাধ্য হয়। ফলে, সত্য ও ন্যায়-নীতি, সুবিচার ও শুভেচ্ছার উপর স্বার্থপরতা প্রাধান্য বিস্তার করে। কিন্তু আল্লাহর দেয়া আইন এসব স্বার্থপরতার শিকড় ছিন্ন করে দিয়ে পক্ষপাতহীন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। মানুষের অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। কোন দল, শ্রেণী বা গোত্রীয় স্বার্থ লিপ্সা ইসলামী আইনের নিকটবর্তী হতেও পারে না।

আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা ও মানব রচিত বিধানের মৌলিক পার্থক্য এখানেই। তাই এ পরস্পর বিরোধী আদর্শের একত্রে অবস্থান সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং আংশিক ইসলাম ও আংশিক জাহেলিয়াতের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন কোন মতবাদ সৃষ্টি করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। আল্লাহ তাঁর নিজের সত্তার সাথে শিরক করার অপরাধ যেমন ক্ষমা করতে রাযী নন, তেমনিভাবে তিনি তাঁর দেয়া জীবন বিধানের সাথে অন্য কোন মানবরচিত বিধানের সংমিশ্রণও পসন্দ করেন না। এ উভয় অপরাধ তাঁর দৃষ্টিতে সমান। আর সত্য কথা এই যে, উভয় ধরনের মনোবৃত্তি একই উৎস থেকে জন্ম নেয়।

ইসলামের প্রতি মানুষকে আহবান জানানোর সময় আমাদের মন-মগযে ইসলাম সম্পর্কে উপরোল্লিখিত ধারণা ও বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে যেতে হবে। কারণ, ইসলামের দাওয়াত পেশ করার সময় আমাদের জিহবায় কোন প্রকারের জড়তা, আমাদের মনে কোন দ্বিধা-সংকোচের ভাব অথবা কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকা চলবে না। বরং দৃঢ় মনোবল সহকারে প্রতিপক্ষকে স্বীকার করিয়ে নিতে হবে যে, ইসলামী জীবন বিধান গ্রহণ করার পর মানব জীবন নতুন রূপ ধারণ করবে। ইসলাম তাদের আকীদা-বিশ্বাস, চাল-চলন, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ও চিন্তা-ভাবনা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করে দেয়। এ পরিবর্তনের ফলে তারা অপরিমিত কল্যাণ লাভ

করবে। মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, ইসলাম তাদের ধ্যান-ধারণা ও আচার-ব্যবহারকে মার্জিত করে তাদেরকে মানবসুলভ উচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবার পর ছোটখাট দু' একটি বিষয় ছাড়া জাহেলিয়াতের কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ঘটনা চক্রে যে দু' একটি নগণ্য ধরনের বিষয় ইসলামী আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিবেচিত হয় শুধু সেগুলোই টিকে থাকবে মাত্র। তবে এগুলোও হুবহু আগের মতই বহাল থাকবে না। বরং ইসলামী আদর্শের সাথে সংযুক্ত হবার ফলে এদের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তখন ঐসব বিষয় সমাজে জাহেলিয়াত বিস্তারের সহায়তা করবে না। মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চিন্তা-গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা যা কিছু হাসিল করেছে, ইসলাম তা বাতিল করে দেবে না। বরং এসব বিষয়ে আরও উন্নতি সাধনের চেষ্টা করবে। জনসমক্ষে বক্তব্য পেশ করার সময় ইসলামের বাণীবাহকদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন মানুষ ইসলামকেও একটি মানব রচিত জীবন বিধান বিবেচনা করার ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত না হয়। তারা যেন মনে না করে যে, বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশকারী মানব রচিত জীবন বিধানগুলোর মত ইসলামও একটি মানব রচিত আদর্শ মাত্র। বরং একথা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে যে, ইসলাম স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একটি স্বতন্ত্র জীবন বিধান। এ জীবন বিধানের আছে নিজস্ব আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা, রয়েছে তার স্বতন্ত্র জীবন যাত্রা প্রণালী। ইসলাম মানবতাকে যে কল্যাণ দান করতে চায়, তা মানবের স্বকপোলকল্পিত জীবন বিধানগুলোর তুলনায় অনেক বেশী মূল্যবান। ইসলাম মহান, উজ্জ্বল, নির্ভেজাল ও ন্যায়নীতি ভিত্তিক জীবন বিধান। মহান আল্লাহ তাআলার অসীম জ্ঞান ভান্ডার হচ্ছে তার উৎস।

আমরা যখন ইসলামের সারকথা সঠিকভাবে উপলব্ধি করবো, তখন এ উপলব্ধিই আমাদের মনে পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস ও ধৈর্য সৃষ্টি করবে। আমরা ইসলামের প্রতি মানুষকে আহবান করার সময় তাদের প্রতি পরিপূর্ণ মাত্রায় সহানুভূতিশীল হতে পারবো। আমাদের আত্মবিশ্বাস হবে এমন এক ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস যার এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে যে, ইসলামই সত্য এবং ইসলাম বহির্ভূত সবকিছুই ভ্রান্ত। মানুষকে বিভ্রান্তি ও দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় দেখে আমাদের মনে তাদের জন্যে সহানুভূতি ও কৃপার মনোভাব সৃষ্টি হবে। মানুষকে ভুল পথে জীবন যাপন করতে দেখে তাদের জন্যে আমাদের মনে করুণার উদ্রেক হবে। কারণ আমরা তাদের উদ্ধারের উপায় অবগত আছি।

ইসলামের প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি হাসিল করার পর পথভ্রষ্ট মানুষের রুচি ও ধারণার সাথে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্যে ইসলামী নীতির কোন

রদ-বদল করার প্রয়োজন নেই। আমরা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় মানুষকে বলবো, "তোমরা যে জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত রয়েছ তা অপবিত্র। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে চান। তোমরা যে পরিবেশে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছ তা অত্যন্ত বিষাক্ত ; আল্লাহ এ পরিবেশকে নির্মল করতে চান। পার্থিব ভোগ-লিপ্সায় লিপ্ত তোমাদের বর্তমান জীবন। অত্যন্ত অধপতিত জীবন। আল্লাহ তাআলা তোমাদের অনেক উচ্চ মর্যাদা দান করতে ইচ্ছুক। তোমরা দিবা-রাত্র লাঞ্ছনা ও অপমানজনক অবস্থায় কাটাচ্ছ। আল্লাহ তাআলা তোমাদের জীবন যাত্রাকে সহজ-সরল ও সৌভাগ্যমন্ডিত করতে চান। ইসলাম তোমাদের মতবাদ ও দৃষ্টিভংগী পরিবর্তন করবে এবং তোমাদের বাস্তব জীবনেও পরিবর্তন আনয়ন করবে। তোমরা ইসলামের সংস্পর্শে নতুন মূল্যবোধ লাভ করবে। তোমাদের জীবন যাত্রার মান এমন উন্নত পর্যায় পৌঁছে যাবে যে, তোমরা নিজেরাই বর্তমান জীবন যাত্রার অসারতা ও হীনতা উপলব্ধি করতে পারবে। তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসার পর দুনিয়ার হাল-হকিকতের প্রতি তোমাদের মনে ঘৃণার উদ্রেক হবে। ইসলাম তোমাদের যে সভ্যতার সাথে পরিচিত করাবে তার সংস্পর্শে আসার পর বর্তমান দুনিয়ায় প্রচলিত তথাকথিত সভ্যতার কাঠামোকে মানব সমাজে জারী রাখা অত্যন্ত কলংকজনক বিবেচনা করবে। দুর্ভাগ্যজনক কারণে তোমরা ইসলামের প্রকৃতরূপ চোখে দেখতে পাচ্ছ না। কারণ ইসলামের শত্রুগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। এসো, আমরা তোমাদের ইসলামী আদর্শের সত্যিকার রূপের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে আমাদের অন্তর রাজ্যে ইসলামী আদর্শের পূর্ণ চিত্র অংকিত হয়ে রয়েছে। আমরা কুরআন, শরীয়াত ও ইতিহাসের গবাক্ষ পথে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেখতে পেয়েছি। উজ্জল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই।"

ইসলামের বাণী পেশ করার সময় আমাদের উপরোক্ত ধরনেই কথা বলতে হবে। ইসলামের প্রকৃতি ও গতিধারাই এরূপ। এভাবেই প্রথম যুগে ইসলাম মানুষের সামনে এসেছিল। আরব উপদ্বীপ, পারস্য, রোম ও যেসব ভূখন্ডেই ইসলাম প্রবেশ করেছে, সেখানেই উপরোক্ত ভংগীতে তার দাওয়াত পেশ করা হয়েছিল।

ইসলাম অতি উচ্চস্থান থেকে মানব সমাজের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। কারণ প্রকৃতপক্ষেই তার স্থান উচ্চে। ইসলাম দরদভরা সুরে মানুষের সামনে বক্তব্য রেখেছে। কারণ তার স্বভাবেই মানবতার প্রতি দরদ রয়েছে। ইসলাম অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় মানুষকে সকল বিষয় বুঝিয়ে দিয়েছে। তার উপস্থাপিত

বাণীতে কোন অস্পষ্টতা ছিল না। সে কখনো মানুষকে এ মিথ্যা আশ্বাস দেয়নি যে, ইসলাম গ্রহণের পর তাদের জীবন পরিবর্তিত হবে না। তাদের চাল-চলন, উঠা-বসা, রীতিনীতি, ধারণা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধ পূর্বের মতই বহাল রেখে সামান্য রদ-বদল করলেই চলবে বলে কখনো বলা হয়নি। সমাজে প্রচলিত অন্যান্য মতবাদের সাথে ইসলাম কখনো নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার প্রস্তাবও পেশ করেনি। আজকাল 'ইসলামী গণতন্ত্র' 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' ইত্যাদি নাম ব্যবহার করে অথবা প্রচলিত অর্থনীতি, রাজনীতি ও আইন-কানুন অপরিবর্তিত রেখে যারা ইসলাম প্রবর্তনের ধূয়া তুলেছে তারা প্রকৃতপক্ষে ভ্রান্ত মতাদর্শে বিশ্বাসী লোকদের খেয়াল-খুশীর সাথে ইসলামের আপোষ করে নেয়ার কথাই বলছে।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের আদর্শ। সমগ্র দুনিয়ার বিরাজমান জাহেলিয়াতের মূলোচ্ছেদ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে সুদূর প্রসারী ও ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়োজন। প্রাচীন ও আধুনিক যুগে প্রচলিত সকল ধরনের জাহেলিয়াতই ইসলামী আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। বর্তমান যুগে মানুষ যে দুরবস্থায় জীবন যাপন করছে, তা থেকে তাদের উদ্ধার করা খুব সহজ সাধ্য কাজ নয়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মামুলী ধরনের রদ-বদল করে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। লাঞ্ছিত ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে মানবতার উদ্ধার সাধনের জন্যে ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী বিপ্লব প্রয়োজন। মানুষের রচিত সকল জীবনাদর্শের মূলোৎপাটন করে দুনিয়ার বুকে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিধান জারী করতে হবে। মানুষকে মানুষের শাসন থেকে উদ্ধার করে বিশ্ব স্রষ্টার শাসনাধীনে আনয়ন করতে হবে। এটাই হচ্ছে মুক্তির সঠিক উপায়, একথা আজ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতে হবে। এ বিষয়ে মানুষের মনে কোন সন্দেহ-সংশয়ের লেশমাত্র থাকা চলবে না।

সূচনায় এ ধরনের স্পষ্ট ঘোষণার ফলে মানুষ কিছুটা অসন্তুষ্ট হতে পারে—ইসলাম সম্পর্কে তাদের মনে কিছুটা ভয় সৃষ্টি হওয়া এবং এ জন্যে তাদের কিছুটা দূরে সরে থাকাও বিচিত্র নয়। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কালে এরূপ হয়েছিল। মানুষ ইসলামের বাণী শুনে ভয় পেয়েছিল। এ দাওয়াতের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে দূরে সরে গিয়েছিল। তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কারণ তিনি তাদের আকীদা-বিশ্বাসের সমালোচনা করতেন, তাদের দেব-দেবীদের বিরোধিতা করতেন, তাদের রীতিনীতিগুলোকে বাতিল করে দেন এবং তাদের সামাজিক আচার-আচরণ পরিত্যাগ করে তিনি নিজের ও তাঁর অনুসারীদের জন্যে সমাজে প্রচলিত রীতিনীতির বিরোধিতা করে নতুন ধরনের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ও মূল্যবোধ নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন।

পরিণামে কি হয়েছিল ? যারা প্রথমে মহাসত্যের বাণী শুনে দূরে সরে গিয়েছিল, তারাই ফিরে এসে শান্তির নীড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের পলায়ন ছিল কুরআনে বর্ণিত সিংহের ভয়ে গর্দভের পলায়নেরই মত।

كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ○ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ○

"তারা যেন ভয়প্রাপ্ত গর্ধভ, সিংহের ভয়ে দ্রুত ধাবমান।"

—মুদ্দাস্‌সির ঃ ৫০-৫১

এ দাওয়াতের বিরোধিতায় তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। যারা ইসলামকে মেনে নিয়েছিল তাদের জন্যে মক্কায় বসবাস করা অসম্ভব করে তুলেছিল। নিত্য-নতুন অত্যাচার ও নিষ্ঠুর আচরণে তাদের জীবন দুর্বিসহ করে দিয়েছিল এবং মদীনায় হিজরাত করার পর মুসলমানদেরকে ক্রমশ শক্তিশালী হতে দেখে বিরোধী মহল আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল।

সাফল্যের চাবিকাঠি

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে ইসলামী আন্দোলনকে যে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা আজকের তুলনায় মোটেই কম ছিল না। ইসলামের বাণী সে যুগের লোকদের নিকট অদ্ভুত মনে হয়েছিল। তাই তারা সাথে সাথেই এ মতবাদকে প্রত্যাখান করেছিল। ইসলামকে মক্কার পাহাড়ী উপত্যকায় অন্তরীণ করা হয়েছিল। প্রভাবশালী ব্যক্তিরা আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা শুরু করেছিল। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের ঘোরতর বিরোধী অত্যাচারী শাসকবৃন্দ আরবের চতুর্দিকে জেঁকে বসেছিল। কিন্তু তবু ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে ছিল এক আকর্ষণীয় শক্তি। আজও তা পূর্বের মতই শক্তিশালী আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এ দাওয়াতের মূলশক্তি তার ঈমানের মধ্যেই লুক্কায়িত রয়েছে। এ জন্যেই ঘোরতর বিরোধিতা এবং শত্রুতার মুখেও এ দ্বীনের দাওয়াত অব্যাহত গতিতে এগিয়ে যায়। ইসলামের সহজ-সরল আলোকোজ্জ্বল বাণীই তার শক্তির উৎস।

মানুষের প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ আকীদা-বিশ্বাসই হচ্ছে তার সাফল্যের চাবিকাঠি। অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক এবং বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে মানুষ যে পরিমাণ পশ্চাদপদই থাকুক না কেন, ইসলাম তাদেরকে নিজ নিজ স্তর থেকেই ক্রমোন্নয়নের পথ দেখিয়ে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেয়। তার অলৌকিক ক্ষমতা বলে ইসলাম জাহেলিয়াতের বিভ্রান্তিকর মতাদর্শ ও তার বৈষয়িক শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে এবং নিজের জীবনাদর্শ থেকে

একটি বর্ণও পরিবর্তন করতে সম্মত হয় না। সে জাহেলিয়াতের সাথে কখনও কোন আপোষ করে না এবং কোন খোঁড়া যুক্তির আশ্রয় নিয়ে বাতিলের সাথে সহঅবস্থানের নীতি অবলম্বন করে না। সে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তার পরিপূর্ণ বক্তব্য সমাজের সম্মুখে এক সাথেই পেশ করে দেয় এবং তাদের জানিয়ে দেয় যে, এ দ্বীনের বাণীতে রয়েছে কল্যাণ, রহমাত ও বরকত।

আল্লাহ্ তাআলা মানুষের স্রষ্টা। তাই তিনি তাদের মন-মগয ও অন্তরের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত আছেন। তিনি জানেন যে, সত্যের এ মহান বাণী বিনা দ্বিধায়, স্পষ্ট ভাষায় এবং বলিষ্ঠ পদ্ধতিতে মানুষের সমাজে পেশ করে দিলেই তা সরাসরি তাদের অন্তরে স্থান দখল করে নেয়।

মানুষ এক ধরনের জীবনযাত্রা ছেড়ে অন্য ধরনের জীবনযাত্রা গ্রহণ করে নেয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন এক সৃষ্টি এবং আংশিক পরিবর্তনের তুলনায় পরিপূর্ণ জীবনযাত্রা পরিবর্তন করে নেয়া তার পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে অধিকতর সহজ। তাই পূর্বের জীবনযাত্রার তুলনায় অধিকতর পূর্ণাঙ্গ ও পবিত্র জীবন বিধানের দিকে এগিয়ে যাওয়া মানুষের প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু ইসলাম যদি জাহেলিয়াতের মধ্য থেকে মামুলী ধরনের দু' একটি বিষয় পরিবর্তন করেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে মানুষের পক্ষে জাহেলিয়াত পরিত্যাগ করে ইসলামের দিকে ছুটে আসার কোন যৌক্তিকতাই থাকে না। এ অবস্থায় তো পুরাতন ব্যবস্থার উপর সন্তুষ্ট থাকাই অধিকতর সঙ্গত। কারণ পুরাতন ব্যবস্থা সমাজে প্রতিষ্ঠিত এবং মানুষ এ ব্যবস্থার সাথে বিশেষভাবে পরিচিত। প্রয়োজনবোধে পুরাতন ব্যবস্থায় কিছুটা সংশোধন করে নেয়াও দুঃসাধ্য নয়। এমতাবস্থায় যদি পুরাতন জীবন বিধান ও নতুন জীবন বিধানের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য না থাকে, তাহলে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কোনই স্বার্থকতা নেই।

সাফাই পেশ করার প্রয়োজন নেই

কোন কোন ইসলাম দরদী দ্বীনের সমর্থনে যেসব বক্তব্য পেশ করেন, তা শুনে মনে হয় যে, ইসলাম আসামীর কাঠগড়ায় দন্ডায়মান এবং বক্তা উকিল হয়ে আসামীর পক্ষে সাফাই গেয়ে চলেছেন। তারা ইসলামের সাফাই পেশ ও পক্ষ সমর্থনের যে বর্ণনাভঙ্গী অবলম্বন করেন তা নিম্নরূপ ঃ

"আজকাল দাবী করা হয় যে, আধুনিক জীবনাদর্শ অমুক অমুক কাজ করেছে, সে তুলনায় ইসলাম কিছুই করেনি। ভাইয়েরা আমার ! ইসলাম তো এসব কাজ বহু আগেই করেছে। আধুনিক মতবাদ তো ইসলামের চৌদ্দ শত বছর পরে এসে ঐ পুরাতন কাজগুলোর পুনরাবৃত্তি করেছে।"

কি লজ্জাকর পক্ষ সমর্থন ! ইসলাম কখনো জাহেলী ব্যবস্থা ও তার ভ্রান্ত কার্যকলাপকে নিজের গৌরব হিসেবে দাবী করতে পারে না। আধুনিক যুগের তথাকথিত সভ্যতা অনেকের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে এবং তাদের মন-মগযকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে এসব নির্ভেজাল জাহেলিয়াত ইসলামের তুলনায় অত্যন্ত হেয়, অন্তসারশূন্য ও ভ্রান্ত। আধুনিক জীবনাদর্শের ছত্রছায়ায় বসবাসকারীদের জীবন যাত্রার মান কোন কোন নামধারী ইসলামী রাষ্ট্র অথবা ইসলামী জাহান-এর বাসিন্দাদের তুলনায় উন্নত বলে যে যুক্তি পেশ করা হয়, তা মোটেই সুযুক্তি নয়। এসব এলাকার অধিবাসীগণ মুসলমান হবার দরুন দুর্দশাগ্রস্ত হয়নি বরং ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার দরুনই তাদের এ দশা হয়েছে। ইসলাম দাবী করে যে, সে জাহেলিয়াতের তুলনায় সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। সে জাহেলিয়াতকে বহাল রাখার জন্যে নয় বরং তার মূলোৎপাটন করার জন্যেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং মানুষকে আধুনিক সভ্যতার যাতাকলে নিষ্পেষিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে এসেছে।

আধুনিক যুগের প্রচলিত মতবাদ ও চিন্তাধারার ভিতরে ইসলামের সাদৃশ্য খুঁজে বেড়ানোর মত পরাজিত মনোবৃত্তি গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সঙ্গত নয়। জাহেলিয়াতের আদর্শ প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য যে কোন অঞ্চল থেকে আসুক না কেন ; আমরা তাকে সরাসরি বাতিল ঘোষণা করব। কারণ ইসলামের তুলনায় এসব মতবাদ পশ্চাদমুখী এবং ইসলাম মানুষকে যে মর্যাদায় ভূষিত করতে চায়, তার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী।

আমরা যখন মানব সমাজের সামনে উপরোক্ত পন্থায় ইসলামের বাণী পেশ করবো এবং তাদের নিকটেই ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ ব্যাখ্যা করবো, তখন তাদের অন্তর থেকেই জীবনাদর্শের যৌক্তিতকার সমর্থনে আওয়ায উঠবে এবং তারা এক ধরনের আকীদা-বিশ্বাস পরিত্যাগ করে অন্য ধরনের আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ ও এক ধরনের জীবন বিধান বর্জন করে নতুন ধরনের জীবনযাত্রা মেনে নেয়ার স্বার্থকতা উপলব্ধি করতে পারবে। কিন্তু আমরা মানুষকে কখনো নিম্নবর্ণিত যুক্তি দ্বারা আকৃষ্ট করতে পারবো না। যথা, "প্রতিষ্ঠিত পুরাতন ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে একটি নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অবশ্য নতুন ব্যবস্থাটি এখনো কোন ভূখন্ডে রূপলাভ করেনি। তবে নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার কতিপয় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করবে মাত্র, এ সমান্য পরিবর্তনে তোমাদের আপত্তি থাকা উচিত নয়। বর্তমান সমাজে তোমরা যা যা করছ, নতুন সমাজেও তাই করতে থাকবে। নয়া আদর্শ শুধু তোমাদের স্বভাব, চাল-চলন ও রুচিতে কতিপয় মামুলী পরিবর্তন করার দাবী করবে।"

আপাত দৃষ্টিতে এ কৌশল অবলম্বন করে কাজ করা সহজ মনে হয়। কিন্তু এতে কোন আকর্ষণীয় শক্তি নেই। তাছাড়া উল্লেখিত দাওয়াত সত্যও নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম বিনা দ্বিধায় ঘোষণা করেছে যে, সে শুধু মানব জীবন সম্পর্কিত আকীদা-বিশ্বাস ও দৃষ্টিভংগীই পরিবর্তন করে না ; শুধু সমষ্টিগত জীবন, আইন-কানুন ও বিচার ব্যবস্থাই পরিবর্তন করে না বরং অনুভূতি ও ভাবাবেগ পর্যন্ত এমনভাবে পাল্টে দেয় যে, জাহেলিয়াতের সাথে তার কোন সাদৃশ্যই থাকে না। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, মানব জীবনের ছোট-বড় সকল বিষয়ে মানুষকে মানুষের অধীনতা থেকে মুক্ত করে অদ্বিতীয় আল্লাহর বন্দেগীতে স্থানান্তর করাই ইসলামের লক্ষ্য।

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ – الكهف : ٢٩

"যার ইচ্ছা হয় সে ঈমান আনয়ন করুক—আর যার ইচ্ছা হয় সে কুফরী করুক।"— কাহাফ ঃ ২৯

وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○ – ال عمران : ٩٧

"তবে যারা কুফরী করে (তাদের জানা উচিত) আল্লাহ বিশ্ব-জগতের মুখাপেক্ষী নন।"— আলে ইমরান ঃ ৯৭

এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার যে, এটা প্রকৃতপক্ষে ঈমান ও কুফর, তাওহীদ ও শির্ক এবং ইসলাম ও জাহেলিয়াতের প্রশ্ন। যারা জাহেলিয়াতের জীবন যাপন করে তারা হাজার বার মুসলমানিত্বের দাবী করা সত্ত্বেও মুসলমান নয়। তারা যদি মুসলমানকে জাহেলিয়াতের সমপর্যায়ে আনয়ন করা যায় বলে নিজেদের অথবা অপরকে ধোঁকা দিতে চায়, তাহলে কারো কিছু করার নেই। কিন্তু তাদের আত্মপ্রবঞ্চনা অথবা অপরকে প্রবঞ্চনা করার দ্বারা প্রকৃত সত্য পরিবর্তিত হতে পারে না। তাদের ইসলাম প্রকৃত ইসলাম নয় এবং তারা নিজেরাও মুসলমান নয়। আজ ইসলামী আন্দোলন শুরু হলে প্রথমে এসব বিভ্রান্ত মুসলমানকে ইসলামের পথে আহবান করা এবং তাদের নুতন করে মুসলমান বানানো দরকার হবে।

আমরা মানুষের নিকট থেকে প্রতিদানের আশায় তাদের ইসলামী আদর্শ গ্রহণ করার জন্যে আহবান করছি না। আমরা ক্ষমতা দখল অথবা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতেও চাই না। আমরা পার্থিব স্বার্থের লালসায় অন্ধ হয়ে যাইনি। আমাদের হিসাব-নিকাশ ও কৃতকর্মের প্রতিদান মানুষের নিকটে নয় বরং আল্লাহর নিকট প্রাপ্য। আমরা মানুষকে ভালবাসি এবং তাদের মঙ্গল কামনা করি। আর এ জন্যেই তাদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেই। তারা

যদি আমাদের মাথায় অত্যাচারের পাহাড় নিক্ষেপ করে, তবু আমরা আমাদের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবো না। এটাই দ্বীনের পথে আহবানকারীদের বৈশিষ্ট্য—আর এ বৈশিষ্ট্যই তার কাজের সহায়ক। আমাদের জীবনযাত্রা থেকে ইসলাম সম্পর্কে জনগণের মনে সঠিক ধারণা সৃষ্টি হওয়া দরকার। অনুরূপভাবে আমাদের চাল-চলন থেকেই জনগণ জানতে পারবে ইসলাম মুসলমানদের প্রতি কি কি দায়িত্ব অর্পণ করে এবং দায়িত্ব পালনের পুরস্কার স্বরূপ নিশ্চিতরূপে কি কি কল্যাণ আশা করা যেতে পারে। জনগণকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ইসলামের দৃষ্টিতে নিরেট জাহেলিয়াত এবং ইসলামের সাথে তার দূরতম সম্পর্কও নেই। জাহেলিয়াত আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াতের উৎস থেকে না আসার দরুন মানুষের স্বার্থান্ধ ও অজ্ঞতাপূর্ণ খেয়াল-খুশীরই ফল। আর যেহেতু 'আল হক' বা মহাসত্যের সাথে সম্পর্কহীন, সে জন্যে জাহেলিয়াত বাতিল ছাড়া আর কিছুই নয়। فماذا بعد الحق الا الضلال। "সত্যের বাইরে গুমরাহী ছাড়া আর কি থাকতে পারে।"

আমরা যে ইসলামে বিশ্বাসী, তার মধ্যে এমন কোন বিষয় নেই যার জন্যে আমাদের লজ্জানুভব ও পরাজয়ের মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের কোন দোষ চাপা দেয়ার জন্যে ওকালতী করারও কোনই প্রয়োজন নেই। কারণ, ইসলামে এ ধরনের কোন ত্রুটি নেই। ইসলামী জীবনাদর্শ মানুষের নিকট তুলে ধরার পরিবর্তে একে কোন বিশেষ সমাজে পাচার করারও প্রয়োজন নেই। আর প্রকাশ্যে ইসলামের পরিপূর্ণ দাওয়াত ঘোষণা করার পরিবর্তে তার উপর নানা ধরনের লেবেল এঁটে দেয়ার চেষ্টা করাও বাতুলতা মাত্র।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বিরাজমান জাহেলিয়াতের মুকাবিলায় আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে কোন কোন 'মুসলমানের' অন্তর উপরোক্ত ধরনের নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং আক্রান্ত হওয়ার ফলে তারা তাদের রোগগ্রস্ত মন নিয়ে মানব রচিত জীবন বিধানে ইসলামের সমর্থনোপযোগী বিষয়বস্তু অনুসন্ধান করে থাকে অথবা তারা জাহেলিয়াতের কীর্তিকলাপের মধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ কাজের দিকে অংগুলি সংকেত করে বলে থাকে যে, 'ইসলামও এক সময়ে এ ধরনের কাজ সম্পন্ন করেছে'। যে ব্যক্তি ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার স্বপক্ষে সাফাই পেশ করার প্রয়োজন অনুভব করে কিংবা দুর্বল মনোভাব নিয়ে ইসলামের পক্ষে ওকালতী করে, সে ব্যক্তি কখনো এ দ্বীনের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না। কারণ সে ইসলামের নির্বোধ সমর্থক। তার মন-মগয জাহেলিয়াতের নিকট পরাজিত ও জাহেলিয়াতের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। জাহেলিয়াত প্রকৃতপক্ষে কতিপয় পরস্পর

বিরোধী চিন্তা ও অসংখ্য ভুল-ভ্রান্তির সমষ্টি ছাড়া কিছুই নয়। অথচ উল্লেখিত ব্যক্তিগণ নিজেদের অজ্ঞতার দরুন জাহেলিয়াতের ভিতরে ইসলামের সমর্থন খুঁজতে গিয়ে জাহেলিয়াতেরই সহায়তা করে। তারা ইসলামের শত্রু— ইসলামের অনিষ্টই তারা করে থাকে ; তাদের দ্বারা দ্বীনের কোন উপকারই হয় না। পরন্তু, তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তাদের যুক্তি ও আলোচনা থেকে মনে হয় যে, ইসলাম আসামীর কাঠগড়ায় দন্ডায়মান এবং বিচারকের দন্ডাদেশ থেকে রেহাই প্রাপ্তির জন্যে ঐ ভদ্রলোকদেরকে উকিল নিযুক্ত করেছে।

আমার আমেরিকা অবস্থানকালে কিছু সংখ্যক লোক আমার সাথে উপরোক্ত যুক্তি পেশ করে তর্কে লিপ্ত হতো। আমার সাথে ইসলামের সমর্থক হিসেবে পরিচিত কয়েকজন লোকও ছিলেন। তাঁরা তর্কের সময় ইসলামের পক্ষে যুক্তি পেশ করে আত্মরক্ষার ভূমিকা গ্রহণ করতেন। আমি কিন্তু উল্টা পাশ্চাত্য দেশীয় জাহেলিয়াত, ধর্মের প্রতি তাদের দোদুল্যমান মনোভাব, তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্য সমাজের নৈতিক উচ্ছৃংখলতার প্রতি অংগুলি সংকেত করে পাশ্চাত্য সমাজের উপর আক্রমণ চালাতাম। তাদেরকে বলতাম, "খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদের দিকে লক্ষ্য করুন। গুনাহ্ বা পাপের সংজ্ঞা ও গুনাহের কাফ্ফরা (প্রায়শ্চিত্য) ইত্যাদির কোন একটি মতবাদও যুক্তিগ্রাহ্য বা বিবেকসম্মত নয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতি, ইজারাদারী, সুদ গ্রহণের নীতি এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যান্য উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থা মানবতা বিরোধী। এ সমাজের তথাকথিত ব্যক্তি স্বাধীনতায় সমষ্টিগত দায়িত্ববোধ ও পারস্পরিক সহানুভূতির লেশমাত্র নেই। আইনের ডান্ডা ছাড়া অন্য কোন কিছুরই এখানে প্রভাব নেই। এ সমাজের বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগীর দরুন আত্মার মৃত্যু, নর-নারীর অবাধ মেলামেশার নামে জীব-জন্তু সদৃশ যৌন আচরণ, স্ত্রী স্বাধীনতার নামে অশ্লিলতা ও বেহায়াপনার ছড়াছড়ি, অযৌক্তিক ছেলেখেলার ন্যায় বাস্তবতা বিরোধী বিয়ে ও তালাকের আইন, অপবিত্র ও ভাবাবেগ প্রসূত বর্ণবাদ ইত্যাদির কোন বিষয়ই মানবতাবোধের পরিচায়ক নয়। অপর দিকে ইসলামী জীবন বিধানের প্রতি লক্ষ্য করুন। এর বাস্তবমুখী ব্যবস্থাবলীর অন্তর্নিহিত কল্যাণকারিতা, সুখ-সমৃদ্ধি ও উচ্চ দৃষ্টিভংগীর তুলনা কোথায় ? এ জীবনাদর্শ মানবতার যে উচ্চমান উপস্থাপিত করে তা সকলেরই কাম্য—প্রত্যেকেই ঐ উচ্চস্থানে পৌছার জন্যে যত্নবান হয়—যদিও এত উচ্চস্থানে পৌছা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। ইসলাম বাস্তব জীবনের আদর্শ। তাই মানুষের সামগ্রিক প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই সমস্যাবলীর সমাধান দান করে।"

পাশ্চাত্য জীবন যাত্রার এসব বাস্তব সমস্যা আমরা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। ইসলামের আলোকে যখন এ সমাজ ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করতাম,

তখন পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের ঘোরতর সমর্থকগণও লজ্জায় মাথা হেঁট করতে বাধ্য হতো। তবু ইসলামের কিছু সংখ্যক দরদী আছেন যাঁরা পাশ্চাত্যের কলুষতাপূর্ণ সমাজের মুকাবিলায় পরাজয় বরণ করে নিয়েছেন এবং পাশ্চাত্যের দুর্গন্ধময় আবর্জনার স্তূপ ও প্রাচ্যের নোংরা বস্তুবাদের মধ্যে ইসলামী আদর্শের সাদৃশ্য খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

আহবানকারীদের সঠিক ভূমিকা

এ আলোচনার পর আমি আর একথা উল্লেখ করার প্রয়োজনবোধ করছি না যে, দ্বীনের প্রতি আহবানকারীদের কোন প্রকারেই জাহেলিয়াতের সাথে খাপ খাইয়ে চলার নীতি গ্রহণ সম্ভব নয়। জাহেলিয়াতের কোন একটি মতবাদ, কোন রীতিনীতি অথবা তার সামাজিক কাঠামোর কোন একটির সাথেও আপোষ করা আমাদের জন্যে অসম্ভব। এ জন্যে জাহেলিয়াতের ধারক-বাহকগণ যদি আমাদের উপর অত্যাচারের ষ্টীমরোলারও চালিয়ে দেয় তুব আমরা বিন্দুমাত্র নতি স্বীকার করতে রাযী নই।

আমাদের সর্বপ্রধান দায়িত্ব হচ্ছে জাহেলিয়াতের উচ্ছেদ সাধন করে ইসলামী মূল্যবোধ এবং ইসলামী রীতিনীতি প্রবর্তন করা। জাহেলিয়াতের সাথে সহযোগিতার মনোভাব অথবা সূচনায় কিছুদূর জাহেলিয়াতের সাথে সমতা রক্ষা করে চলার মধ্য দিয়ে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে না। আমাদের কোন কোন শুভাকাংখী এ পথে এগিয়ে যাবার চিন্তা করেন। কিন্তু সত্য সত্যই যদি আমরা এরূপ করি, তাহলে প্রথম পদক্ষেপেই আমাদের পরাজয় স্বীকার করে নেয়া হবে মাত্র।

অবশ্য একথাও ঠিক যে, বর্তমান সমাজে প্রচলিত মতাদর্শ ও রীতিনীতি প্রবল চাপ প্রয়োগ করে আমাদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিতে চায়। বিশেষত নারীদের সম্পর্কে এ চাপ আরও বেশী প্রবল হয়ে উঠে। হতভাগ্য মুসলিম নারীসমাজ জাহেলিয়াতের প্রচন্ড ঘুর্ণিঝড়ের সম্মুখীন হয়ে ঘুরপাক খেতে বাধ্য হয়। কিন্তু নিরেট বাস্তবতা থেকে রেহাই নেই। এগুলো হচ্ছে আমাদের এগিয়ে যাবার পথে বাস্তব প্রতিবন্ধকতা। দৃঢ়তা ও সাহসিকতা সহকারে আমাদের প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন এবং প্রতিকূলতার উপর জয়ী হতে হবে। তারপর ইসলামের উচ্চ মূল্যবোধের তুলনায় জাহেলিয়াত যে গভীর অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে, তা তার চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে।

জাহেলিয়াতের সাথে সমতা রক্ষা করে কিছু দূর পর্যন্ত তার সাথে পথ চলার কর্মসূচী গ্রহণ করে এ মহান কাজ সম্পন্ন করা যাবে না। আবার এক্ষুণি জাহেলিয়াতের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আত্মগোপন

করেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা কখনও সম্ভব নয়। আমাদের জাহেলিয়াতের সাথে মেলামেশা করতে হবে, কিন্তু নিজেদের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে। তাদের সাথে লেন-দেন করতে হবে, কিন্তু আত্মমর্যাদা বহাল রেখে। মহাসত্যের বাণী বিনা দ্বিধায় প্রচার করবো কিন্তু ভালবাসা ও প্রেম-প্রীতির সুরে। ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবো কিন্তু শিষ্টাচারের মাধ্যমে। আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আমরা জাহেলিয়াতের পরিবেশেই জীবন যাপন করছি। আমাদের চলার পথ জাহেলিয়াতের তুলনায় সহজ-সরল। তবু জাহেলিয়াতকে পরিবর্তন করে ইসলামী ব্যবস্থার প্রবর্তন অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘমেয়াদী কাজ। আমরা মানবতাকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে ইসলামের আলোকজ্জল পথে তুলে দিতে চাই। জাহেলিয়াত ও ইসলামের মধ্যে রয়েছে এক প্রশস্ত ও গভীর উপত্যকা। এতদুভয়ের মিলনের জন্যে মধ্যস্থলে পুল নির্মাণ সম্ভব নয়। তবে, এমন একটি পুল তৈরী করার চেষ্টা করতে হবে যেন ওপার থেকে মানুষ জাহেলিয়াত পরিত্যাগ করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। আগমনকারী কোন ইসলামী অঞ্চলের মুসলিম বাসিন্দা হোক অথবা অনৈসলামিক অঞ্চলের অমুসলিম হোক, সকলের জন্যেই অন্ধকার বিসর্জন দিয়ে আলোকিত স্থানে আসা এবং আপাদমস্তক দুর্দশার পাকে নিমজ্জিত অবস্থা থেকে নাজাত হাসিল করে ইসলামের প্রতিশ্রুত সুফল ভোগ করার জন্যে ছুটে আসার পথ খুলে দিতে হবে। যারা ইসলামকে ভালভাবে হৃদয়ংগম করে ইসলামের ছত্রছায়ায় জীবনযাপনে আগ্রহী তাদের অবশ্যই জাহেলিয়াতের বন্ধন ছিন্ন করে ইসলামের দিকে ছুটে আসতে হবে। যদি আমাদের দাওয়াত কারো পসন্দ না হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে যা ঘোষণা করতে হুকুম করেছিলেন, আমরাও তাই ঘোষণা করবো—

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ ○ - الكافرون : ٦

"তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্যে আমার দ্বীন।"

—কাফেরুন ঃ ৬

একাদশ অধ্যায়

ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব

আল্লাহ্ তাআলার ঘোষণা

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

"নিরুৎসাহ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। তোমরাই জয়ী হবে, যদি তোমরা মু'মিন হও।"—আলে ইমরান ঃ ১৩৯

উপরের আয়াত পাঠে প্রথমে যে ধারণার সৃষ্টি হয় তা হচ্ছে, সশস্ত্র জিহাদের বেলায় আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের নিশ্চয়তা দান। কিন্তু আয়াতের অন্তর্নিহিত ভাবধারা সশস্ত্র জিহাদের চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। আয়াতটিতে মু'মিনের মানসিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। মু'মিনের চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, ঘটনাবলীর বিচার বিশ্লেষণ ও হিসেব-নিকেশের পদ্ধতি থেকেই তার সদা জাগ্রত বিবেকের পরিচয় ফুটে উঠে। তার মন সকল অবস্থায়, সকল পরিবেশে ও সকল বিষয়েই ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব বহাল রেখে চলবে। যত ঘটনা ও বিষয়াবলীর সম্মুখীন হবে, সবগুলোতেই সে ঈমানের দৃষ্টিতে যাচাই করে কর্মপন্থা নিরুপণ করবে। ঈমানের উৎস বাদ দিয়ে দুনিয়ায় গ্রহণ-বর্জনের যেসব মূল্যবোধ প্রচলিত আছে সেগুলোকে বিনা দ্বিধায় বাতিল করে দিয়ে ঈমানের প্রাধান্য দান করবে। অনুরূপভাবে যেসব পার্থিব শক্তি ঈমানের বলে বলীয়ান নয়, মু'মিনের দৃষ্টিতে তার কোনই গুরুত্ব নেই। যেসব রীতিনীতি, আইন-কানুন, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবন বিধান ঈমানের সম্পদ থেকে বঞ্চিত সেগুলোকে নিসংকোচে পরিত্যাগ করে ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করাই হবে মু'মিনের দায়িত্ব।

ঈমানী শক্তিই মু'মিনের আসল সম্পদ ও মূল শক্তি। দুর্দান্ত ক্ষমতাশালী শাসকের সামনেও ঈমানী শক্তি নতি স্বীকার করে না। কোন সামাজিক রীতিনীতি ও বাতিল আইন-কানুনের সামনেই ঈমান মাথা নত করে না। ঈমানের আলো থেকে বঞ্চিত শাসন ব্যবস্থা যত জনপ্রিয়তাই অর্জন করুক না কেন ; মু'মিন কখনো এ ঈমান বিহীন ব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারে না। এক কথায় মু'মিনের জীবন বেঈমানীর বিরুদ্ধে এক স্থায়ী ও সর্বাত্মক জিহাদেরই জ্বলন্ত নমুনা। সশস্ত্র যুদ্ধে দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে শত্রুর মুকাবিলা করা

ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠারই বাস্তব পদক্ষেপ মাত্র। মু'মিন পার্থিব উপকরণের বিবেচনায় দুর্বল হোক অথবা সবল, তাদের সংখ্যা কম হোক অথবা বেশী, তারা দরিদ্র হোক অথবা ধনী, সকল অবস্থাতেই ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব বহাল রেখে চলবে।

ঈমানের প্রভাবে সৃষ্ট মনোবল, সাময়িক ভাবপ্রবণতা বা ক্ষণাস্থায়ী অগ্নিস্ফুলিংগ নয়। মহাসত্যের অনুভূতি ও এ সত্যের প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপনকারী মু'মিনের অন্তরে এক স্থায়ী শ্রেষ্ঠত্ববোধের জন্ম দেয়। এ সত্যানুভূতি প্রচলিত যুক্তি-তর্ক, পরিবেশের চাপ, সামাজিক অভ্যাস ও পুরুষানুক্রমিক রীতিনীতির তুলনায় অনেক বেশী মযবুত ও স্থায়িত্বের অধিকারী, কারণ চিরঞ্জীব আল্লাহর প্রতি ঈমান মু'মিনের অন্তরে চিরস্থায়ী শক্তির জন্মদান করে।

সমাজে বিশেষ কতক চিন্তাধারা ও মতবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সামাজিক বন্ধন ও কঠোর আইন-শৃংখলা প্রতিটি ব্যক্তিকে প্রচলিত চিন্তাধারা ও মতবাদ মেনে চলতে বাধ্য করে। সমাজের কোন শক্তিমান মহলের আশ্রয় বা বাইরের কোন শক্তির সাহায্য ব্যতীত কারো পক্ষে প্রতিষ্ঠিত মতবাদ ও চিন্তাধারার বিরুদ্ধাচরণ সম্ভব নয়। অপর দিকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত মতবাদের প্রবল প্রভাব বিরাজমান থাকে। একটি উন্নততর মতবাদ ও চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হবার পরই মানুষ পূর্বের মতবাদ ও চিন্তাধারার অসারতা উপলব্ধি করে তা বর্জন করতে প্রস্তুত হয়। অন্যথায় প্রচলিত মতবাদ ও চিন্তাধারার প্রভাব থেকে নিস্তার নেই। প্রচলিত মতবাদ ও চিন্তাধারা যেসব শক্তির সহায়তায় সমাজে টিকে রয়েছে, সেসব শক্তির তুলনায় অধিক পরাক্রান্ত বৃহত্তর এবং উন্নততর শক্তির সহায়তা ছাড়াও প্রতিষ্ঠিত মতবাদের প্রভাব থেকে মুক্তি হাসিল করা সম্ভব নয়।

যে ব্যক্তি সমাজের প্রবহমান গতিধারার বিপক্ষে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, শাসক শক্তির সমর্থন পুষ্ট দৃষ্টিভংগীর বিরোধিতা করে, প্রচলিত রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, চিন্তাধারা ও মতবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অনিষ্টকারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তার জন্যে মানুষের চেয়ে অধিক পরাক্রান্ত পর্বতের চেয়েও অধিকতর মযবুত ও জীবনের চেয়েও অধিকতর প্রিয় কোন না কোন অবলম্বনের প্রয়োজন হবে। অন্যথায় ঐ সমাজে সে শুধু নিজের অসহায়ত্বই উপলব্ধি করবে না বরং বিশাল দুনিয়ায় সে আশ্রয় নেয়ার মত সামান্য ঠাঁইও খুঁজে পাবে না। এমতাবস্থায় রহমানুর রাহীম মু'মিনকে অত্যাচারী সমাজের বুকে দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনের মুকাবিলা করার জন্য

একাকী ছেড়ে দিতে পারেন না। তাই তিনি মু'মিনদের লক্ষ্য করে এ আশ্বাসবাণী নাযিল করেছেন—

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

প্রতিকূল পরিবেশের অন্তহীন অত্যাচারে মানুষের উৎসাহে ভাটা পড়া এবং সাহস শিথিল হয়ে আসা স্বাভাবিক। ঠিক সে মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার এ আশ্বাসবাণী মু'মিনের অন্তরে শক্তি ও প্রেরণার সঞ্চার করে। নিছক ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাহায্যে নয় মু'মিন এক শ্রেষ্ঠত্ববোধ ও মহান লক্ষ্যের দিকে খেয়াল রেখেই সকল প্রতিকূলতার উপর বিজয়ী হয়। ঈমান ও চিন্তার ক্ষেত্রে মু'মিন এত উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যায় যে, সেখান থেকে দুনিয়ার সকল তাগুতী শক্তি, পরাক্রান্ত শাসক, শাসন ক্ষমতার সাহায্য পুষ্ট চিন্তাধারা, আইন-কানুন ও রীতিনীতি সব কিছুই অত্যন্ত হেয় ও তুচ্ছ বিবেচিত হয়।

মু'মিন প্রকৃতপক্ষেই শ্রেষ্ঠ। কারণ তাঁর অবলম্বন যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি শ্রেষ্ঠ তাঁর আকীদা-বিশ্বাসের উৎস। বিশাল সাম্রাজ্য তা' দৃষ্টিতে নগণ্য মাত্র। বিপুল শক্তির অধিকারী ব্যক্তিবর্গ তার নিটক তুচ্ছ। সমাজে প্রচলিত জনপ্রিয় মূল্যবোধ ও মানদন্ড মু'মিনের বিবেচনায় হেয় ও নীচ মনোবৃত্তি প্রসূত।৮বিপুল সংখ্যক মানুষকে কোন বিষয় পসন্দ করভে দেখেই মু'মিন সে বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায় না। এদিক থেকে মু'মিনের স্থান সকল্রে০শীর্ষে। সে সকল জ্ঞানের উৎস একমাত্র আল্লাহ শুাআলার নিকট থেকে পথের সন্ধান লাভ করেছে। প্রতিটি বিষয়ে সে মহান আল্লাহর নির্দেশ জানতে চায় এবং সেখান থেকে যখন যে বিষয়ে যেরূপ হেদায়াত লাভ করে, তা-ই সে মেনে চলে।

বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টি ও স্থিতিশীলতা সম্পর্কেও মু'মিনের আকীদা-বিশ্বাস সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাওহীদের যে দৃষ্টিভংগী ইসলহ্ম তাকে শিখিয়েছে, তার বদৌলতে সে পরিপূর্ব সত্যকে সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। তাহীদের মতবাদ বিশ্ব প্রকৃতির যে চিত্র তুলে!হরেছে, তা দুনিয়ার সকল প্রাচীন ও আধুনিকমতবাদের অনেক উর্ধে। শির্কভিত্তিক ধর্ম, পথভ্রষ্ট আহলে কিতাবদের আকীদা-বিশ্বাস ও ঘৃণ্য বস্তুবাদের সৃষ্ট সকল মতবাদের অসারতা, পরস্পর বিরোধিতা ও অবাস্তবতা পর্যালোচনা করে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, যারা বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণার অধিকারী, তারা নিসন্দেহে সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ।

জীবনের মূল্যবোধ এবং বিষয়-আশয়, পদার্থ ও মানুষ যাচাই-বাছাই করার মানদন্ড সম্পর্কে মু'মিন যে ধারণা পোষণ করে, তা অন্যান্যদের ধ্যান-ধারণার তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও শীর্ষ স্থানীয়। ইসলাম বর্ণিত গুণাবলীর অধিকারী

আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ঈমান আনয়নের ফলে সৃষ্ট বোধশক্তি শুধু সীমাবদ্ধ পৃথিবীরই নয়, অসীম বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যোদ্ঘাটন করে দিয়ে মু'মিনের অন্তরে জীবনের যে মূল্যবোধ এবং গ্রহণ-বর্জনের যে মানদন্ড দান করে তা সাধারণভাবে প্রচলিত সামঞ্জস্য বিহীন ও ত্রুটিপূর্ণ মানদন্ডের তুলনায় উত্তম, নিষ্কলুষ ও বাস্তব। মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত সংকীর্ণ। তাই তারা যুগে যুগে বার বার ভাল মন্দের মানদন্ড পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। এমন কি, একই জাতির মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন মানদন্ড প্রচলিত থাকে। কোন কোন সময় দেখা গিয়েছে যে, একই ব্যক্তি কোন বিষয়ে দিনের পূর্বাহ্নে যে অভিমত ব্যক্ত করেছে, অপরাহ্নে ঠিক তার বিপরীত রায় প্রদান করেছে।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের ফলে বিবেক, বোধশক্তি, চরিত্র ও আচার-ব্যবহারে মু'মিন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ গুণাবলী অর্জন করে। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা উত্তম নাম ও শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অধিকারী। মু'মিনের আকীদা-বিশ্বাসই তার মনে আত্মমর্যাদাবোধ, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, শিষ্টাচার ও ভদ্রতা, ভাল কাজ করার আগ্রহ এবং পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জনের প্রেরণা সৃষ্টি করে। তাছাড়া এ আকীদা-বিশ্বাসই মু'মিনের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, আখেরাতেই কর্মফল প্রাপ্তির সঠিক স্থান এবং সেখানে নেক আমল ও পবিত্র জীবন যাপনের যে পুরস্কার পাওয়া যাবে তার তুলনায় পার্থিব জীবনের দুঃখ কষ্ট অতি নগণ্য। এ ধরনের অনুভূতি সৃষ্টির ফলে মু'মিনের অন্তরে গভীর প্রশান্তি নেমে আসে। ফলে সারা জীবন পার্থিব সুখ সম্পদ থেকে বঞ্চিত থেকেও সে কোন অভিযোগ করে না।

মু'মিন যে আইন-কানুন ও জীবন বিধান মেনে চলে তা সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত মানব রচিত সকল আইন-কানুনের বিচার বিশ্লেষণ করে মু'মিনের মনে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে যে, এ যাবৎ মানুষ বহু চেষ্টা-সাধনা করে যা কিছু হাসিল করেছে সেগুলো ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও আইন-কানুনের তুলনায় নেহায়েত ছেলেখেলা ছাড়া কিছুই নয়। তার মনে আরও প্রত্যয় জন্মে যে, আইন-বিধান রচনার উদ্দেশ্যে মানুষ এ যাবৎ যে পরিশ্রম করেছে, তা অন্ধ ব্যক্তির পথ চলার সাথেই তুলনীয়। তাই নিজের অবস্থান স্থল থেকে মু'মিন যখন পথ হারা মানুষের আকুলতা-ব্যাকুলতা ও অসহায়ত্ব দেখতে পায়, তখন তার মনে তাদের জন্যে সহানুভূতি সৃষ্টি হয় এবং সে নিজেকে বিভ্রান্ত মানব সমাজের উপর বিজয়ী বলে বুঝতে পারে।

জাহেলিয়াতের যুগে মানুষ অন্তসারশূন্য ক্ষমতার দর্প এবং পার্থিব সম্পদের চাকচিক্য ও জাঁকজমকের নেশায় বিভোর ছিল। ইসলামী আকীদা-

বিশ্বাসের বদৌলতে মু'মিন এসব বস্তুপূজার অসারতা উপলব্ধি করে উপরোল্লিখিত গুণাবলী ও চরিত্রের অধিকারী হয়। জাহেলিয়াত যুগ বিশেষে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষ যখনই ইসলামের আলোকজ্জল পথ পরিত্যাগ করবে, তখনই সে জাহেলিয়াতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যাবে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সকল কাল ও সকল যুগের জন্যে একই নিয়ম। বিখ্যাত পারস্য সেনাপতি রুস্তুমের জাঁকজমকপূর্ণ শিবিরে জাহেলিয়াতের বিচিত্ররূপ দেখতে পেয়ে হযরত মুগীরা বিন শাবী (রা) যে মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন তা আবু উসমান নাহদীর ভাষায় উল্লেখ করছি ঃ

"নদীর পুল পার হয়ে মুগীরা বিন শাবী (রা) পারস্য সৈন্যদের শিবিরে উপনীত হলেন। তারা তাঁকে বসিয়ে রেখে রুস্তমের নিকটে তাঁর সাক্ষাতের জন্যে অনুমতির আবেদন জানালো। যুদ্ধে পরাজয় বরণ করা সত্ত্বেও তারা জাঁক-জমক কিছুমাত্র হ্রাস করেনি। মুগীরা অনুমতি পেয়ে সম্মুখে অগ্রসর হলেন। শিবিরের সকলেই নির্দিষ্ট পোশাক পরিহিত ছিল। তাদের কারো মাথায় সোনার তাজ ও শরীরে সোনার কারুকার্য খচিত পোশাক ছিল। শতাধিক গজ পরিমিত স্থান ভারী ও মূল্যবান কার্পেটে আবৃত ছিল। মুগীরা তাবুতে প্রবেশ করলেন। তিনি সোজা উঁচু মঞ্চের উপর উঠে রুস্তুমের পার্শ্বে বসে গেলেন। দরবারী লোকজন ছুটে গিয়ে তাঁকে হাত ধরে সেখান থেকে নামিয়ে নিয়ে আসে। হযরত মুগীরা বলতে শুরু করলেন, আমরা এ যাবত তোমাদের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি। কিন্তু আজ দেখতে পেলাম, তোমরা একটা নির্বোধ জাতি। আমাদের সমাজে সকল মানুষই সমান—কেউ কারো দাস নয়। তবে যুদ্ধবন্দীদের কথা স্বতন্ত্র। আমি মনে করতাম, তোমরা আমাদেরই মত পরস্পরকে সমান মর্যাদা দিয়ে থাক। তোমরা আমার সাথে যে ব্যবহার করলে, তার আগে আমাকে জানিয়ে দিলেই তো ভাল হত যে, তোমাদের সমাজে কিছুসংখ্যক লোক অপরদের উপর খোদায়ী কায়েম করে রেখেছে। আমি তোমাদের আমন্ত্রণে এখানে এসেছি—স্বেচ্ছায় আসিনি। কাজেই তোমরা যে ব্যবহার করলে, তা কিছুতেই সদ্ব্যবহার নয়। আমি বুঝতে পেরেছি যে, তোমাদের সামাজিক কাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। সুতরাং তোমাদের পরাজয় অবধারিত। এ ধরনের চরিত্র ও মন-মানসিকতা নিয়ে কোন সাম্রাজ্যই টিকে থাকতে পারে না।"

কাদেসিয়ার যুদ্ধের প্রাক্কালে রাবী বিন আমের (রা)ও রুস্তম এবং তার সভাসদগণের সম্মুখে একই মনোভাবের পরিচয় দান করেছেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

কাদেসিয়া যুদ্ধের পূর্বে হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাবী বিন আমের (রা)-কে পারস্য সম্রাটের সেনাপতি রুস্তমের দরবারে দূত হিসেবে প্রেরণ করেন। রাবী বিন আমের (রা) শিবিরে প্রবেশ করে দেখতে পান, দরবারকক্ষ মূল্যবান কার্পেটে সাজানো রয়েছে। সোনার তাজ ও মণি-মুক্তা খচিত পোশাক পরিহিত রুস্তম একটি উঁচু মঞ্চের উপরে স্বর্ণ নির্মিত সিংহাসনে বসেছিল। রাবী (রা) ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় হাতে একটি ছোট ঢাল ও বর্শা নিয়ে ক্ষুদ্র ঘোড়ায় চড়ে দরবারে প্রবেশ করেন। একটি মূল্যবান কোল বালিশের সাথে ঘোড়াটিকে বেঁধে তিনি রুস্তমের নিকটে যেতে উদ্যত হন। তাঁর শরীরে তখনও যুদ্ধের পোশাক ছিল। মস্তকে লৌহ শিরস্ত্রাণ ও বর্ম পরিহিত অবস্থায় অগ্রসর হলে দরবারীগণ তাঁকে যুদ্ধের পোশাক খুলে ফেলতে বললো। রাবী বিন আমের (রা) বললেন, "আমি নিজে সাধ করে এখানে আসিনি। তোমরা আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছ। যদি আমার এ পোশাক তোমাদের অপসন্দ হয় তাহলে ফিরে যাচ্ছি।" রুস্তম বললেন, "তাকে আসতে দাও।" তিনি তাঁর হাতের বর্শায় ভর করে এগিয়ে গেলেন। বর্শার খোঁচায় কার্পেটখানা স্থানে স্থানে ক্ষত বিক্ষত হলো। রুস্তম প্রশ্ন করলেন, "তোমরা কি জন্যে এসেছ ?" তিনি জবাবে বললেন, "মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে উদ্ধার করে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর বন্দেগীতে নিয়োগ করার জন্যে আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন। যারা দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে নিজেদের মুক্ত করে আখেরাতের সীমাহীন কল্যাণ পেতে ইচ্ছুক, তাদের সে প্রশস্ত ময়দানে পৌছানো এবং মানব রচিত ধর্মের অত্যাচার থেকে রেহাই দিয়ে মানুষকে ইসলাম প্রদত্ত ন্যায়-নীতির অধীনে আনয়ন করা আমাদের লক্ষ্য।" (আল বিদায়া ওয়া আন নিহায়া ইবনে কাদির)

কালক্রমে এক বিপ্লব এসে মুসলমানদের দৃষ্টিভংগীতে দুর্বলতা সৃষ্টি করে দেয় এবং তারা পার্থিব সম্পদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে যায়। তবু তাদের নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বহাল থাকে। তাদের অন্তরে যদি ঈমানের প্রদীপ জ্বলন্ত থাকে, তাহলে সে নিজে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও বিজয়ী জাতিকে নিজের তুলনায় হেয় ও হীন বিবেচনা করবে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, পার্থিব প্রাধান্য অস্থায়ী ব্যাপার মাত্র। আজ হোক, কাল হোক, বিজয়ী ভ্রান্ত জাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এমনকি মৃত্যুর মুখামুখি দাঁড়িয়েও মু'মিন পার্থিব সম্পদের অভাব সত্ত্বেও বাতিল শক্তির সম্মুখে নতজানু হবে না। মু'মিন বিশ্বাস করে যে, প্রতিপক্ষের মৃত্যু অতি তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু তাঁর নিজের জন্যে রয়েছে শাহাদাতের মর্যাদা। এ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের সাথে সাথেই মু'মিন জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং আজকের শক্তিশালী ও বিজয়ী দল আখেরাতে

কঠোর যন্ত্রণাদায়ক জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে—এ বিষয়ে সে নিশ্চিত। কারণ মু'মিন নিজের ও প্রতিপক্ষের পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহপাকের পরিষ্কার ঘোষণা শুনতে পেয়েছে। তিনি বলেছেন—

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ ۞ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ قف ثُمَّ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ۝ — ال عمران

"দেশের উপর আল্লাহদ্রোহীদের দাপট দেখে তোমরা প্রতারিত হয়ো না। এতো অল্প কয়েক দিনের জন্যে সামান্য সম্পদ মাত্র। পরিণামে তারা অত্যন্ত মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অপর দিকে যারা নিজেদের রবকে ভয় করে জীবন যাপন করে তাদের জন্যে রয়েছে বাগ-বাগিচাময় বাসস্থান—যেখানে প্রবাহিত রয়েছে স্রোতস্বিনী। ঐ বাগ-বাগিচাগুলোতে তারা চিরকাল বাস করবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্যে মেহমানদারীর ব্যবস্থা। আর আল্লাহর নিকট যা কিছু আছে, নেক লোকদের জন্য তা-ই উত্তম।"—আলে ইমরান ঃ ১৯৬-১৯৮

মু'মিনের ঈমান, আকীদা, মূল্যবোধ ও মানদন্ডের বিপরীত আকীদা-বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও মানদন্ড সমাজে প্রাধান্য বিস্তার লাভ করতে পারে। তবু মু'মিনের বিবেক এক মুহূর্তের জন্যেও নিজের উচ্চ মর্যাদা ও অপর সকলের নিম্নমানের বিষয় ভুলে যেতে পারে না। সে নিজের সুউচ্চ অবস্থানস্থল থেকে আত্মমর্যাদাবোধ ও সম্ভ্রম বহাল রেখে ধৈর্য ও সহানুভূতি সহকারে সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং তাদের সুপথ প্রদর্শন ও অধপতিত স্থান থেকে টেনে উন্নতির শীর্ষে পৌঁছানোর জন্যে তার অন্তরে অদম্য আকাঙ্খা জেগে উঠে।

বাতিল অদ্ভূত ধরনের হৈ চৈ সৃষ্টি করে গর্জন ও চিৎকারে চারদিক প্রকম্পিত করে তোলে, বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায়, গোঁফে তা দেয় এবং তার চারিদিকে তোষামোদকারীদের এক বিরাট বাহিনী সমবেত করে অপরের চর্মচক্ষু ও অন্তর্দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে দেয়। সমাজের মানুষ দৃষ্টিশক্তি বিভ্রান্তকারী চাকচিক্যের আড়ালে লুকায়িত বাতিলের ভয়ানক চেহারার কদাকার বিভৎস রূপ দেখতে পায় না। মু'মিন সুউচ্চ আসনে বসে বাতিলের অসার তর্জন-গর্জন লক্ষ্য করে এবং বিভ্রান্ত মানুষের প্রবঞ্চিত অবস্থা দেখতে পায় কিন্তু তার মনে কোন দুর্বলতা প্রশ্রয় পায় না—সে কোন দুঃখ অনুভব করে না এবং মহাসত্যের

প্রতি তার অটল বিশ্বাস বিন্দুমাত্র শিথিল হয় না। সীরাতুল মুস্তাকিম থেকে তার পা এক চুল পরিমাণও বিচলিত হয় না। বরং তার অন্তরে বিভ্রান্ত ও প্রবঞ্চিত মানুষকে হেদায়াতের পথপ্রদর্শনের আগ্রহ ও প্রেরণা আরও প্রবল হয়ে উঠে।

জাহেলী সমাজ কামনা-বাসনায় ডুবে যায়। নীচ প্রবৃত্তি বন্যায় ভেসে যায়। সর্বত্র অশ্লীলতা ও নোংরামী সকল বিধি-নিষেধ থেকে মুক্ত হয়ে নিরাপদে আনন্দ উপভোগ করছে। অবশেষে ঐ সমাজে পবিত্র পরিবেশ ও হালাল খাদ্য দুর্লভ হয়ে যায়—এমনকি, পাওয়াই যায় না। মু'মিন এসবের উর্ধে বসে আবর্জনা ও নোংরামীর স্রোতে ভাসমান সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখে। সে একাকী হলেও সমাজের গতি প্রকৃতি দেখে হতাশ অথবা দুঃখিত হয় না। তার মনে মুহূর্তের জন্যেও পবিত্রতা ও শালীনতার অংগাবরণ দূরে নিক্ষেপ করে অশ্লীলতার প্রবহমান স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়ার ইচ্ছা জাগে না। ঈমানের স্বাদ ও আকীদার সুখানুভূতির বদৌলতে সে নিজেকে ঐ আবর্জনাময় সমাজের অনেক উর্ধে দেখতে পায়।

যে সমাজ দ্বীনের প্রতি বিদ্রোহী, যে সমাজ সম্ভ্রম ও মর্যাদাবোধ হারিয়ে অধপতিত হয়ে গেছে, যে সমাজে উচ্চ মূল্যবোধের অভাব, যে সমাজে ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের অভাব, মোটকথা যে সমাজ পবিত্রতা শালীনতার সকল গুণাবলী বর্জন করেছে, সে সমাজে একজন মু'মিন হাতের মুঠোয় জ্বলন্ত অঙ্গার খন্ড ধরে রাখার মতই দীন ও ইসলামকে আঁকড়ে ধরে রাখে। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতে যারা অভ্যস্ত, তারা মু'মিনের দৃঢ়তা দেখে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তার চিন্তাধারাকে পাগলামী আখ্যা দেয় এবং তার প্রিয় মূল্যবোধকে সমালোচনার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে। কিন্তু মু'মিন সবকিছুই দেখে ও শুনে। কিন্তু তার অন্তরে কোন দুর্বলতা দেখা দেয় না। সে নিজের উদার ও সহনশীল দৃষ্টিতে ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী ও সমালোচকদের দিকে তাকায় এবং তার মুখ থেকে হযরত নূহ (আ)-এর উচ্চারিত শব্দগুলোই বের হয়ে আসে। কন্টকাকীর্ণ দীর্ঘ পথ অতিক্রম কালে ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী জনতাকে লক্ষ্য করে ধৈর্য ও দৃঢ়তার মূর্ত প্রতীক হযরত নূহ (আ) বলেছেন—

اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ○ هود : ٣٨

"আজ তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্রূপ করছ। একদিন আমরাও তোমাদের নিয়ে হাসি-তামাশা করবো, যেভাবে তোমরা এখন আমাদের নিয়ে হাসি-তামাশা করছ।"—হূদ ঃ ৩৮

আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র বাণীর আলোকে মু'মিন নিজের ও বিরোধী মহলের উভয় পক্ষের পরিণাম সুস্পষ্টরূপে দেখতে পায়। আল্লাহ পাক বলেছেন—

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۝ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۝ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ۝ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۝ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ۝ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ۝ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ۝ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ — المطففين : ٢٩ — ٣٦

"অবশ্যই অপরাধী ব্যক্তিরা (দুনিয়াতে) ঈমানদারদের সাথে হাসি-তামাশা করতো। তাদের নিকট দিয়ে যাবার সময় চোখের ইশারায় বিদ্রূপ করতো। নিজের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়ে তাদের সমালোচনায় মুখর হতো। আর মুসলমানদের দেখা মাত্র বলে উঠতো, এরাই তো পথভ্রষ্ট। অথচ মুসলমানদের উপর তাদেরকে রাখাল বানিয়ে পাঠানো হয়নি। আজ (আখেরাতের দিনে) মুসলমান কাফেরদের দেখে হাসবে এবং নিজেদের গদিতে বসে তাদের দিকে তাকাবে। কাফেররা আজ তাদের কৃতকর্মের কেমন ফল লাভ করল !"

—আল মুতাফ্ফিফীন ঃ ২৯-৩৬

পবিত্র কুরআন মু'মিনদের প্রতি কাফেরদের বিদ্রূপের উক্তিও নকল করে আমাদের জানিয়ে দিয়েছে ঃ

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۝ — مريم : ٧٣

"তাদেরকে যখন আমাদের আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে শুনানো হয়, তখন কাফেররা মু'মিনদের লক্ষ্য করে বলে, বল, আমাদের দু'পক্ষের মধ্যে কার অবস্থা ভাল, আর কোন্ পক্ষের মজলিস জাক-জমকপূর্ণ ?"

অর্থাৎ দু'পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ উত্তম ? যেসব গোত্রপতি, সামাজিক নেতা ও ধনী ব্যক্তিগণ হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি

তারা এক পক্ষ এবং যেসব দরিদ্র ও অসহায় লোক ঈমান আনয়ন করেছিলেন, তারা অপর পক্ষ। দু'পক্ষের মধ্যে কে উত্তম, তা-ই ছিল তাদের প্রশ্ন। নসর বিন হারেস, ওমর বিন হিশাম, ওলীদ বিন মুগীরা ও আবু সুফিয়ান বিন হারব ছিল সমাজের প্রতিষ্ঠিত নেতা ও মুরুব্বি। পক্ষান্তরে হযরত বিলাল, হযরত আম্মার, হযরত খাব্বাব (রা) প্রমুখ ব্যক্তিগণ ছিলেন সহায়-সম্বলহীন। কাফেররা বলাবলি করতো, যদি মুহাম্মাদ (সা) সত্য সত্যই আল্লাহর নবী হতেন তাহলে কুরাইশ গোত্রের এসব নিম্নস্তরের লোক তাঁর দলে যোগদান করবে কেন ? এদের চেয়ে অধিকতর মর্যাদাশীল ব্যক্তি কি সমাজে ছিল না ? তাদের নিজেদের একত্রে সমবেত হওয়ার জন্যে একটি সাধারণ মানুষের বাড়ী (হযরত ইকরামার বাড়ী) ছাড়া, ভাল স্থানও তো নেই। ওদিকে ইসলাম বিরোধী দলতো আন-নাদওয়ার মত প্রশস্ত মিলনকেন্দ্রের অধিপতি। তাদের আছে শান-শওকত, আছে প্রাচুর্য এবং জাতির নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা।

পার্থিব স্বার্থপূজারীদের দৃষ্টিভংগীই এরূপ। সকল কালে ও সকল যুগে দুনিয়ার সর্বত্র তাদের দৃষ্টি সর্বদাই নিম্নমুখী রয়েছে। উচ্চ দিগন্তের দিকে তারা কখনো তাকিয়ে দেখেনি।

মহান আল্লাহ তাআলাই এ বিধান করে দিয়েছেন যে, ঈমান ও আকীদার সম্পদে সমৃদ্ধ ব্যক্তিগণ পার্থিব জাঁকজমক ও ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্যের মোহ থেকে উর্ধে অবস্থান করবেন। তারা শাসকদের নৈকট্য, সরকারী অনুগ্রহ, সস্তা জনপ্রিয়তা এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা পরিতৃপ্তির জন্যে লালায়ীত হবে না। তিনিই ঠিক করে দিয়েছেন যে, কঠোর ত্যাগ-তিতিক্ষা ও শাহাদাত পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাওয়াই মু'মিনের কর্মপন্থা। ইসলামের পথে এগিয়ে আসার সময় প্রত্যেককেই ভাল করে উপলব্ধি করতে হবে যে, শুধু ঈমান-আকীদার শ্রেষ্ঠত্বের জন্যেই সে দ্বীন কবুল করে নিয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া এখানে কোন পার্থিব স্বার্থই নেই। যারা লোভ-লালসা ও জাঁকজমকের প্রতি আসক্ত তাদের জন্যে এ পথ বন্ধ। শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি যাদের কাম্য, তারাই এ পথে অগ্রসর হতে পারে, অন্য কেউ নয়।

মু'মিন তার মূল্যবোধ, ধ্যান-ধারণা ও গ্রহণ বর্জনের মানদন্ড নিরূপণের জন্যে কোন মানুষের মুখাপেক্ষী নয়। সে তো সব বিষয়ই বিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহর নিকট থেকে গ্রহণ করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত মানদন্ডই তার জন্যে যথেষ্ট। সে মানুষের মর্জীর উপর নির্ভরশীল নয়। সে জন্যে মানুষের মর্জী পরিবর্তনের সাথে সাথে তার মতামত পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। কারণ, মু'মিন মহাসত্যের উপর ঈমান আনয়ন করেছে। সত্য অটল ও

অপরিবর্তনীয় এবং কখনো তা দোদুল্যমান থাকে না। সীমাবদ্ধ ও অস্থায়ী পৃথিবী থেকে মু'মিন কোন প্রেরণাই গ্রহণ করে না। তাঁর সকল প্রেরণার উৎস হচ্ছে বিশার সৃষ্টির স্রষ্টা, পরিচালক ও প্রতিপালক। তাই মু'মিনের হৃদয় দুর্বল হতে পারে না। সে কখনো নৈরাশ্যের শিকার হয় না। মানুষের প্রতিপালক, সত্যের মহান উৎস ও সকল শক্তির মূল কেন্দ্রের সাথে সংযুক্তির পর ভয়-ভীতি ও আশংকার কোন কারণ থাকতে পারে কি ?

মু'মিন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য থেকে বিচ্যুত হলে বাতিল বা মিথ্যা ছাড়া কিছুই হাসিল হবে না। বাতিলের ঢাক-ঢোল থাকে থাকুক, তার চার-দিকে জনতার ভিড় লেগে থাকে থাকুক ; সত্য সে জন্যে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে না। হক বা সত্য পথ ছেড়ে বাতিলের সাথে কখনো কোন আপোষ করবে না। তার নিকট থেকে এরূপ আশা করা বাতুলতা মাত্র।

رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ○ رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّارَيْبَ فِيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَايُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ○ — ال عمران : ٨-٩

"হে প্রভু ! হেদায়াতের পথ দেখানোর পর আমাদের অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি হতে দিও না। আর তোমার রহমাতের ভান্ডার থেকে আমাদের প্রতি রহমাত বর্ষণ কর। নিশ্চয়ই তুমি উদার ও দাতা। পরওয়ারদিগার ! একদিন তুমি অবশ্যই সকল মানুষকে একত্রে সমবেত করবে। আর সে দিনের আগমন সম্পর্কে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই। আল্লাহ তাআলা কখনো তার ওয়াদা লংঘন করেন না।"—আলে ইমরান ঃ ৮-৯

দ্বাদশ অধ্যায়

রক্ত রঞ্জিত পথ

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۙ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۙ وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ؕ قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۙ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۙ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۙ وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ؕ وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ؕ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ؕ اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ۚ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۙ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ۙ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ؕ

"সুদৃঢ় দুর্গময় আকাশ মণ্ডলের শপথ এবং শপথ সে দিনের যার ওয়াদা করা হয়েছে। শপথ দর্শকের এবং দৃষ্ট বিষয়ের। ধ্বংস হয়েছে গর্ত খননকারীগণ। যাদের খনন করা গর্তে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল। যখন তারা গর্তের মুখে বসেছিল এবং ঈমানদারদের সাথে যা কিছু করা হচ্ছিল, তার তামাশা দেখছিল। ঈমানদারদের সাথে তাদের শত্রুতার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা (ঈমানদারগণ) প্রবল পরাক্রান্ত ও সদা প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিল। যিনি আকাশ ও ভূমণ্ডলের অধিপতি এবং সে আল্লাহ সবকিছুই দেখেন। যেসব লোক ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের প্রতি যুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে এবং তারপর ঐ কাজ থেকে তাওবা করে নাই—নিসন্দেহে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আযাব এবং তাদের জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে আছে ভস্মকারী

আযাব। যারা ঈমান আনয়ন ও নেক আমল করেছে, তাদের জন্যে সুনিশ্চিত পুরস্কার হিসেবে রয়েছে জান্নাতের বাগিচা যার নীচ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত। এটাই হচ্ছে সত্যিকার সাফল্য। মূলত তোমার আল্লাহর পাকড়াও খুবই শক্ত। তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেছেন এবং পুনরায় সৃষ্টি করবেন। আর তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, আরশের অধিপতি ও মহান। তিনি নিজ ইচ্ছায় সকল কাজ সম্পন্নকারী।"—আল বুরুজ ঃ ১-১৬

কুরআনে বর্ণিত গর্ত খননকারীদের কাহিনী সকল ঈমানদার ব্যক্তির জন্যেই চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক করে। যারা দুনিয়াতে দাওয়াতে দ্বীনের কাজ করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্যে এ সূরা (সূরায়ে বুরুজ) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পবিত্র কুরআন কাহিনীর ভূমিকা, বিবরণ, মন্তব্য ও শিক্ষণীয় বিষয় যেভাবে পেশ করেছে, তার মধ্যে আল্লাহর পথে আহবানকারীদের যাত্রা পথ সম্পর্কে সুস্পষ্ট রূপরেখা ফুটে উঠেছে। দ্বীনি আন্দোলনের প্রকৃতি, মানব গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া ও সুপ্রশস্ত পৃথিবীতে এ দাওয়াত প্রসার কালে যা যা ঘটতে পারে, সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দান করা হয়েছে। কাহিনী বর্ণানার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা ঈমানদারদের চলার পথে যেসব বাধা বিপত্তি আসতে পারে তা উল্লেখ করেছেন এবং সম্ভাব্য সকল প্রকার বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টকে বরণ করে নেয়ার জন্যে উৎসাহ্ দিয়েছেন।

কাহিনীটি হচ্ছে একদল ঈমানদারের। তাঁরা তাঁদের পরওয়ারদিগারের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিলেন এবং তাঁদের ঈমানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রকাশ্য ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সমাজের অত্যাচারী ও পরাক্রান্ত শত্রুগণ প্রশংসিত ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি ঐ ব্যক্তিদের ঈমান আনয়ন করার অধিকার দান করতে রাযী ছিল না। তাই ঈমানদারগণ চরম নির্যাতনের সম্মুখীন হন। শত্রুদল আল্লাহ্ প্রদত্ত মর্যাদা হরণ করে তাদের শাসকগোষ্ঠীর হাতের ক্রীড়নক বানানোর অপচেষ্টায় নিষ্ঠুর দৈহিক অত্যাচার চালিয়ে নিজেদের বিকৃত রুচিবোধের পরিচয় দেয়।

কিন্তু ঈমানের বলে বলীয়ান পবিত্র হৃদয় ব্যক্তিগণ তাঁদের উপর আপতিত পরীক্ষায় পরিপূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হন। তাঁদের ঈমান নশ্বর দেহের উপর বিজয়ী হয়। তাই তাঁরা অত্যাচারীদের ভয়-ভীতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি বরং জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়ে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করেছেন। তবু তাঁরা নিজেদের দ্বীন থেকে চুল পরিমাণ সরে যেতেও রাযী হননি। তাঁরা পার্থিব জীবনের মায়া ও আকর্ষণ থেকে মুক্ত ছিলেন। এ জন্যেই নির্মম পন্থায় তাঁদেরকে পশুর মতো হত্যার উদ্যোগ আয়োজন করা হলেও তা দেখে তাঁরা

জীবনের বিনিময়ে আকীদা পরিত্যাগ করতে পারেননি। তাঁরা অস্থায়ী দুনিয়ার সুখ-সম্পদের মায়া কাটিয়ে নির্ভীক চিত্তে ঊর্ধজগতে চলে যান। স্বল্পস্থায়ী জীবনের উপর ঈমানী শক্তির কি অপূর্ব প্রাধান্য।

পূর্ণ ঈমানদার, উন্নত চরিত্র, সৎকর্মশীল ও সদাচারী ব্যক্তিদের বিপক্ষে ছিল আল্লাহদ্রোহী, হঠকারী, অসচ্চরিত্র ও অপরাধ প্রবণ হীন প্রকৃতির মানুষেরা। তারা জ্বলন্ত অগ্নি গহ্বরের কিনারায় বসে মু'মিনদের যন্ত্রণাকাতর শোচনীয় মৃত্যুর দৃশ্য উপভোগ করছিল। জ্বলন্ত আগুনে কিভাবে জীবন্ত মানুষকে গ্রাস করে এবং জ্বালিয়ে ভস্মে পরিণত করে তা দেখার কৌতূহল নিয়ে তারা গর্তের পাশে জড় হয়েছিল।

যখন কোন ঈমানদার যুবক, যুবতী, শিশু, বৃদ্ধা কিংবা বয়স্ক ব্যক্তিকে আগুনে নিক্ষেপ করা হতো, তখন তাদের আনন্দ উন্মত্ততায় রূপান্তরিত হতো। এবং রক্তের ফিনকি ও জ্বলন্ত মাংস খন্ড দেখে তারা আনন্দে নৃত্য করতো। এ লোমহর্ষক কাহিনী থেকে বুঝা যায় যে, অত্যাচারী দল সম্পূর্ণরূপে বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল। কারণ হিংস্র জন্তু ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে শিকার করে থাকে। তারা আনন্দ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে জীব হত্যা করে না।

একই ঘটনা থেকে ঈমানদারদের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা করা যায়। তাঁরা আধ্যাত্মিকতার শীর্ষস্থানে আরোহণ করেছিলেন। আল্লাহর প্রতি তাঁদের অটল নির্ভরশীলতা পূর্ণতা লাভ করেছিল। সকল যুগ ও সকল কালের মানুষের জন্যেই ঈমানের এ স্তর পরম কাম্য হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে।

স্থুলদৃষ্টিতে দেখা যায় যে, অত্যাচার নির্যাতন ঈমান ও আকীদার উপর জয়যুক্ত হয়েছে। যদিও এ সচ্চরিত্র, ধৈর্যশীল ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের ঈমানী শক্তি শীর্ষস্থানে পৌঁছে গিয়েছিল, তথাপি ঘটনার পরিণতি দৃষ্টে মনে হয় যেন বাতিলের সাথে শক্তি পরীক্ষায় তাদের ঈমানী শক্তি ব্যর্থতা অর্জন করেছে। এ জাতীয় জঘন্য অপরাধের দরুন নূহ (আ), হূদ (আ), ছালেহ (আ), শুয়াইব (আ) ও লূত (আ)-এর জাতিগুলোকে যেভাবে শাস্তি দেয়া হয়েছিল, সেরূপ গর্ত খননকারীদেরকেও দেয়া হয়েছিল কিনা, তা কুরআন পাক অথবা অন্য কোন গ্রন্থ থেকে জানা যায় না। অথবা ফিরাউন ও তার লোক-লস্করকে আল্লাহ তাআলা যে কঠোরতার সাথে পাকড়াও করেছিলেন, সেভাবে এদেরও দন্ডবিধান করেছিলেন কি না তাও জানার কোন উপায় নেই। ফলে বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগীর নিরিখে এ ঘটনায় ঈমানদারদের পরিণতি ছিল খুবই মর্মান্তিক।

কিন্তু ব্যাপারটির পরিসমাপ্তি কি এখানেই ? ঈমানের উচ্চতম পর্যায়ে যারা পৌঁছে গিয়েছিলেন, সে আল্লাহ ভীরু ও সচ্চরিত্র দলটি কি অত্যাচার নির্যাতনের আবর্তে গর্তের আগুনে জ্বলে পুড়ে ভস্মে পরিণত হয়েই শেষ হয়ে গেলেন ? আর অত্যাচারী পশুসদৃশ মানুষগুলো কি সম্পূর্ণরূপে শাস্তি এড়িয়ে গেল। পার্থিব দৃষ্টিতে এ বিষয়টি সম্পর্কে মনে নানাবিধ প্রশ্ন জাগে। কিন্তু কুরআন ঈমানদারদেরকে অন্য ধরনের শিক্ষা দান করে এবং তাদের সামনে অপর একটি রহস্যের দ্বারোদঘাটন করে। কুরআন ভাল মন্দ নির্ণয়ের এক নতুন মানদন্ড পেশ করে, যে মানদন্ড হক ও বাতিলের সংঘর্ষে মু'মিনদের চলার পথ নিরূপণে সহায়ক হয়।

দুনিয়ার জীবন, তার আরাম-আয়েশ, ভোগ ও বঞ্চনা ইত্যাদিই মানব জীবনের সিদ্ধান্তকর বিষয় নয়। শুধু এগুলোই লাভ ও লোকসানের হিসেব নির্ধারক নয়। সাময়িকভাবে প্রাধান্য বিস্তারের নাম বিজয় নয় যদিও বিজয়ের বিভিন্ন উপায়-পন্থার অন্যতম হচ্ছে প্রাধান্য। আল্লাহর মানদন্ডে একমাত্র ঈমানের ওজনই ভারী। আল্লাহর বাজারে শুধু ঈমানের পণ্যেরই চাহিদা রয়েছে। বিজয়ের উৎকৃষ্ট নমুনা হচ্ছে বস্তুর উপর ঈমানের প্রাধান্য। উল্লেখিত ঘটনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ঈমানদারদের রূহ, ভয়-ভীতি, দুঃখ-কষ্ট এবং পার্থিব জীবনের আরাম-আয়েশ ও ভোগ লিপ্সার উপর পরিপূর্ণরূপে বিজয়ী হয়। চরম নির্যাতনের মুখে ঈমানদারগণ যে বিজয় ও সম্ভ্রম অর্জন করে গিয়েছেন তা মানব জাতির ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। আর এ বিজয়ই হচ্ছে সত্যিকার বিজয়।

সকল মানুষই মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু মৃত্যুর উপলক্ষ হয় বিভিন্ন ধরনের। উল্লেখিত ঈমানদার ব্যক্তিদের মত সাফল্য সকলের ভাগ্যে ঘটে না। এমন উচ্চ পর্যায়ের ঈমান অর্জন করাও অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। এ ধরনের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা সকলে ভোগ করতে পারে না। এবং তাদের মত উচ্চ স্তরে বিচরণ করার সৌভাগ্যও সকলের হয় না। আল্লাহ তাআলাই তাঁর অপার অনুগ্রহে একদল লোককে বাছাই করে নেন যারা সকল মানুষের মত মৃত্যুবরণ করে কিন্তু তাদের উপলক্ষ হয় অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক। এ সৌভাগ্য অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। তাঁরা মহান ফেরেশতাদের চেয়েও উচ্চ মর্যাদা এবং সম্মান লাভ করে থাকেন। সম্মান ও মর্যাদার উল্লেখিত নিরিখে তাঁরা মানব জাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার অধিকারী হয়ে যান।

উল্লেখিত মু'মিনদের ঈমান পরিত্যাগ করে জীবন বাঁচানোর সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এরূপ করার ফলে তারা নিজেরা এবং সমগ্র মানবগোষ্ঠী কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হতো ? 'ঈমান বিহীন জীবনের এক কানাকড়ির মূল্যও নেই'—এ

মহান সত্যকে যদি জীবন রক্ষার খাতিরে বর্জন করে দেয়া হতো তাহলে মানবজাতি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। আকীদা-বিশ্বাসের স্বাধীনতা হারানোর পর মানুষ হয়ে যায় নিঃস্ব। যালিম শাসক গোষ্ঠী যদি দেহের উপর নির্যাতন চালিয়ে আত্মার উপরও শাসনদন্ড কায়েম করতে সক্ষম হয়, তাহলে মানব সত্তা চরমভাবে অধপতিত হয়। উল্লেখিত ঈমানদারগণ ঈমানের যে পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন, তার ফলে তাঁদের জীবন্তদেহে আগুনের দাহিকা শক্তি কার্যকর হবার সময়ও তারা মহাসত্য ও পবিত্রতার উপর অটল ছিলেন। তাদের নশ্বর দেহ যে সময় আগুনে জ্বলছিল, সে সময় তাঁদের মহান ও সুউচ্চ আদর্শ সফলতার সোপান বেয়ে ঊর্ধে আরোহণ করছিল। বরং আগুন তাদের আদর্শ পরায়ণতাকে আরও ঔজ্জল্য দান করেছিল।

সত্য ও মিথ্যার (হক ও বাতিলের) এ লড়াই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। আর শুধু পার্থিব জীবনই পরিপূর্ণ মানব জীবন নয়। সংগ্রামে শুধু সমসাময়িক যুগের মানুষই অংশ গ্রহণ করে না। বাতিলের বিরুদ্ধে হকের যুদ্ধে ফেরেশতাগণও শরীক হন, লড়াইয়ের গতিধারা পর্যবেক্ষণ করেন এবং যা কিছু হয়, তা প্রত্যক্ষ করেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা ঘটনাবলীকে তুলাদন্ডে ওজন করেন। এ তুলাদন্ড সকল যুগ ও সকল ধরনের মানবীয় তুলাদন্ড থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বরং সমগ্র মানব গোষ্ঠীর তুলাদন্ড থেকেও ফেরেশতাদের তুলাদন্ড স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ফেরেশতাগণ আল্লাহর মহান সৃষ্টি। এক সময় সমগ্র দুনিয়ায় যত সংখ্যক মানুষ বাস করে, ফেরেশতাদের সংখ্যা তাদের চেয়েও কয়েকগুণ বেশী। তাই নিসন্দেহে বলা যায় যে, হকপন্থীদের উদ্দেশ্যে ফেরেশতাদের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা দুনিয়ার অধিবাসীদের শ্রদ্ধা ও প্রশংসার তুলনায় অনেক বেশী মূল্যবান।

এ সকল স্তরের পরে হচ্ছে আখেরাত। আর সেটাই হচ্ছে ফলাফল প্রকাশের প্রকৃত স্থান। দুনিয়ার এ মঞ্চটি আখেরাতের সাথে সংযুক্ত—বিচ্ছিন্ন নয়। এটাই প্রকৃত সত্য এবং মু'মিনের অবিচল ঈমানও তাই। হক ও বাতিলের লড়াই দুনিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রেই সমাপ্ত হয়ে যায় না। প্রকৃত সমাপ্তির স্তর তো এখনো আসেনি। দুনিয়ার মঞ্চে লড়াইয়ের যে অংশটুকু সংঘটিত হয়েছে, সেটুকুর উপর ভিত্তি করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা সঠিক ও ন্যায়সংগত হতে পারে না। কারণ তাহলে এ সিদ্ধান্ত যুদ্ধের কয়েকটি সাধারণ ঘাত-প্রতিঘাত পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে।

যারা পার্থিব জীবনকেই একমাত্র জীবন মনে করে, তাদের দৃষ্টিভংগী খুবই সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। চঞ্চলমনা ব্যক্তিগণই এ ধরনের দৃষ্টিভংগী পোষণ করে।

দ্বিতীয় ধরনের দৃষ্টিভংগী (অর্থাৎ আখেরাতের দৃষ্টিভংগী) সুদূর প্রসারী ; বাস্তব ও ব্যাপক। কুরআন ঈমানদারদের মনে দ্বিতীয় ধরনের দৃষ্টিভংগী গড়ে তোলে। আর এটিই হচ্ছে বাস্তবমুখী দৃষ্টিভংগী। এ দৃষ্টিভংগীর উপরই প্রতিষ্ঠিত হয় ঈমান ভিত্তিক চিন্তাধারার বিশাল ইমারত। আল্লাহ্ তাআলা ঈমানদারদের জন্যে ঈমান ও আনুগত্যের দৃঢ়তা এবং ঈমানের অগ্নিপরীক্ষায় অটল ধৈর্য ধারণের প্রতিদানে যে পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন, তা হচ্ছে অন্তরের প্রশান্তি। এরশাদ হচ্ছে—

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ط اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝ — الرعد : ٢٨

"যারা ঈমান আনয়ন করেছে তাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরের ফলে প্রশান্তি অর্জন করেছে। জেনে রাখ, আল্লাহর যিকিরই অন্তরে প্রশান্তি এনে দেয়।"
—আর রাআদ ঃ ২৮

আর এর সাথেই শামিল রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও প্রেম-ভালোবাসার ওয়াদা।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং নেক আমল করে জীবন কাটিয়েছে, তাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলা (মানুষের) অন্তরে মুহব্বত পয়দা করে দেবেন।"—মরিয়াম ঃ ৯৬

তাছাড়া উর্ধজগতে তাদের সম্পর্কে আলাপ আলোচনার ওয়াদাও রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "যখন আল্লাহর কোন বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতাদের ডেকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি আমার অমুক বান্দার সন্তানের রূহ হরণ করেছ ?"

ফেরেশতাগণ বলেন, 'জি, হ্যাঁ'।

আল্লাহ্ তাআলা পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা কি আমার বান্দার কলিজার টুকরো হরণ করেছো ?"

তাঁরা বলেন, "জি হ্যাঁ, পরওয়ারদিগার !"

আল্লাহ্ বলেন, "আমার বান্দা সে সময় কি বলেছে ?"

ফেরেশতা বলেন, "তিনি আপনার প্রশংসা কীর্তন করেছেন" এবং اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ "আমরা নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্যে এবং তাঁর দিকেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে—একথা বলেছে।"

আল্লাহ্ তাআলা তখন আদেশ দেন, "আমার ঐ বান্দার জন্যে বেহেশতে একটি প্রাসাদ তৈরী কর এবং তার নাম দাও বায়তুল হামদ (প্রশংসার ঘর)।" (তিরমিযী)

হযরত নবী করীম (স) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করে, আমি হুবহু সেরূপ। সে যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথেই থাকি। সে যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, তাহলে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। যদি সে লোকের সামনে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে আরও বড় মজলিসে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তাহলে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে আসি। যদি সে আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, তাহলে আমি তার দিকে কয়েক হাত এগিয়ে যাই। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে তাহলে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।" (বুখারী ও মুসলিম)

আরও ওয়াদা রয়েছে যে, ঊর্ধজগতে ঈমানদারগণের জন্যে দোয়া করা হয় এবং তাদের জন্যে সেখানে গভীর প্রেম ও সহানুভূতি রয়েছে।

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ج رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ○ — المؤمن : ٧

"যেসব ফেরেশতা আরশ বহন করে এবং যাঁরা আল্লাহর চার পার্শ্বে থাকেন, সকলেই নিজেদের রবের প্রশংসা সহ তাসবীহ পাঠ করেন এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেন। আর তাঁরা ঈমানদারদের জন্যে আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত কামনা করে বলেন, 'প্রভু! পরওয়ারদিগার ! তোমার রহমাত ও জ্ঞান সর্বত্র পরিবেষ্টন করে আছে। সুতরাং যারা তাওবা করে এবং তোমার প্রদর্শিত পথে জীবন যাপন করে, তাদের ত্রুটি মাফ করে দাও এবং তাদেরকে দোযখের আগুন থেকে রেহাই দাও।"—আল মু'মিন ঃ ৭

শহীদানের জন্যে আল্লাহ তাআলা শাশ্বত জীবনের ওয়াদা করেছেন—

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ○ فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ لا

وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ لا اَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لا وَّاَنَّ اللّٰهَ لاَ يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না বরং তারা জীবিত এবং তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে রিয্ক দেয়া হয়। আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, তা পেয়ে তারা খুবই প্রীত ও সন্তুষ্ট। এ বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত যে, ঈমানদারদের মধ্যে যারা এখনো দুনিয়ায় রয়েছেন এবং এখনো পরপারে পৌঁছেননি, তাদের জন্যেও কোন ভয় বা দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আল্লাহর দেয়া পুরষ্কার ও অনুগ্রহ লাভ করে তারা পরিতুষ্ট এবং তারা বুঝতে পেরেছে যে, আল্লাহ মু'মিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।"—আলে ইমরান ঃ ১৬৯—১৭১

অনুরূপভাবেই মিথ্যা প্রতিপন্নকারী, যালিম ও অপরাধীদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার সতর্কবাণী রয়েছে। তিনি বলেন যে, পার্থিব জীবনে কিছুকাল তাদের রশি ঢিলা করে দিয়ে কিছুটা সুযোগ দান করেন এবং আখেরাতে তাদের বিচার হবে। অবশ্য কোন কোন সময় আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেও পাকড়াও করে থাকেন। তবু প্রকৃত শাস্তির জন্যে আখেরাতই নির্দিষ্ট।

لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلاَدِ ۝ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ قف ثُمَّ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝ — ال عمران : ١٩٦ ــ ١٩٧

"দেশের ভিতরে আল্লাহদ্রোহীদের তৎপরতা দেখে তোমরা যেন প্রতারিত না হও। এসব তো স্বল্পকালীন জীবনের অস্থায়ী সম্পদ মাত্র। পরিণামে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম এবং সেটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান।"

وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ط اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ۝ لا مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِىْ رُءُوْسِهِمْ لاَيَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ج وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ۝ — ابرهيم : ٤٢ ــ ٤٣

"যালিমরা যা কিছু করছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালাকে গাফিল মনে করো না। আল্লাহ তাদেরকে সময় দান করছেন এমন এক দিনের জন্যে যেদিন তাদের চোখ বিস্ফারিত হয়ে যাবে এবং তারা মাথা সোজা করে

দৌড়াতে থাকবে। সেদিন তাদের দৃষ্টি থাকবে উপরের দিকে আর প্রাণপাখী উড়ে যাবার জন্যে ছটফট করবে।"— ইবরাহীম ঃ ৪২-৪৩

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلٰقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ○ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ○ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ط ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ○ — المعارج : ٤٢-٤٤

"তাদেরকে বাজে কথাবার্তা ও খেলা-ধূলায় মত্ত থাকতে দাও, যে পর্যন্ত না ওয়াদাকৃত দিন এসে যায়। সে দিন তারা কবর থেকে বের হয়ে আসবে এবং দৌড়াতে শুরু করবে যেন কোন গন্তব্য স্থলের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের দৃষ্টি হবে অবনত এবং মুখমণ্ডলে লাঞ্ছনা ও অপমানের চিহ্ন ফুটে উঠবে। এটিই তো ওয়াদাকৃত দিন।"

—আল মাআরিজ ঃ ৪২-৪৪

এভাবেই মানব জীবন ফেরেশতাদের জীবনের সাথে এবং দুনিয়ার জীবন আখেরাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। হক ও বাতিল, ভাল ও মন্দ এবং ঈমান ও আল্লাহদ্রোহিতার লড়াই দুনিয়ার অস্থায়ী মঞ্চেই সমাপ্ত হয়ে যায় না এবং তার ফলাফলও এখানে প্রকাশ পায় না। পার্থিব জীবনের আরাম-আয়েশ ও দুঃখ-কষ্ট, ভোগ ও বঞ্চনা আল্লাহর মানদন্ডে সিদ্ধান্তকরী বিষয় নয়। এ দিক দিয়ে ভাল ও মন্দের শক্তি পরীক্ষার ময়দান বহুদূর বিস্তৃত এবং দীর্ঘস্থায়ী। আর সফলতা ও ব্যর্থতার মাপকাঠি এবং এদের পরিধি অনেক সম্প্রসারিত। এ জন্যেই মু'মিনের চিন্তা ও মতামতের দিগন্ত সুদূর প্রসারী এবং তার আশা-আকাংখা অনেক উচ্চে। তাই এ পৃথিবী এবং তার সাজ-সরঞ্জাম, এ জীবন ও তার প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী মু'মিনের নিকট তুচ্ছ বিবেচিত হয়। তার দৃষ্টি ও মতামত প্রসারের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে তার জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে থাকে। এ ধরনের উদার ও মহান হৃদয় এবং খাঁটি ঈমান সৃষ্টির জন্যে গর্ত খননকারীদের কাহিনী খুবই সহায়ক।

গর্ত খননকারীদের কাহিনী ও সূরায়ে বুরুজের আলোচনা থেকে দাওয়াতে দ্বীনের প্রকৃতি ও এ পথের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার মুখে আহবায়কদের ভূমিকা সম্পর্কে অপর একটি দিকেও আলোকপাত করা হয়েছে। দাওয়াতে দ্বীনের আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যান্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রত্যক্ষ করেছে।

এ আন্দোলন হযরত নূহ (আ), হযরত হুদ (আ), হযরত শুয়াইব (আ) এবং হযরত লূত (আ)-এর নিজ নিজ জাতির ধ্বংস এবং অল্প সংখ্যক ঈমানদারদের রক্ষা প্রাপ্তির দৃশ্য দেখতে পেয়েছে। কিন্তু যারা ধ্বংস থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন তারা পরবর্তীকালে কি ভূমিকা পালন করেছেন, তা কুরআন আমাদেরকে বলেনি। এসব দৃষ্টান্ত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহদ্রোহীদের বাড়াবাড়ির প্রতিকারার্থে আল্লাহ্ তাআলা কোন কোন সময় দুনিয়ার জীবনেই তাদেরকে আংশিক আযাবের স্বাদ গ্রহণ করিয়ে দেন। পরিপূর্ণ বিচার শেষে যথোপযুক্ত আযাব তো আখেরাতেই দেয়া হবে।

ইসলামী দাওয়াতের আন্দোলন, সৈন্য-সামন্ত সহকারে ফিরাউনের ধ্বংস, অনুচরসহ হযরত মূসা (আ)-এর উদ্ধার প্রাপ্তি এবং পরবর্তীকালে তাঁর রাজ্য লাভ প্রত্যক্ষ করেছে। সে যুগের ইতিহাসে বনী ইসরাঈলরা ছিল উত্তম চরিত্রের অধিকারী। যদিও তাঁরা কখনো পরিপূর্ণ দৃঢ়তা দেখাতে পারেননি এবং দুনিয়াতে আল্লাহর দ্বীনকে তাঁরা পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে কখনো কায়েম করেননি, তবু পূর্ববর্তীদের তুলনায় তাঁদের দৃষ্টান্ত ছিল ভিন্ন ধরনের। যারা নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি এবং তাঁর আনীত জীবন বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, ইতিহাস সেসব মুশরিকদের লাশের স্তূপও দেখতে পেয়েছে। ইতিহাস আরও দেখতে পেয়েছে কিভাবে ঈমানদারদের অন্তরে পরিপূর্ণরূপে ঈমানের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর আল্লাহর সাহায্য এসে তাদের গলায় সাফল্যের মালা পরিয়ে দিয়েছিল। আর দুনিয়া সর্বপ্রথম মানব জীবনের উপর পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর ব্যবস্থা বাস্তবায়নের নমুনা দেখতে পেল। এ সময়ের আগে বা পরে কখনও এরূপ দেখা যায়নি।

ইতিহাস গর্ত খননকারীদের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। তাও আমরা দেখেছি। এ ছাড়াও ইতিহাস অনেক প্রাচীন ও নতুন ঘটনা ঘটতে দেখেছে। অবশ্য এগুলো ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেনি। আর আজকালও ইতিহাস অসংখ্য ঘটনা দেখতে পাচ্ছে, যেগুলো ইসলামী ইতিহাসের শত শত বছরের প্রাচীন ঘটনাবলীর সাথে কোন না কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।

অন্যান্য ঘটনাবলীর পর্যালোচনা করা অবশ্যই জরুরী। তবে গর্ত খননকারীদের ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কারণ এ ঘটনায় ঈমানের অগ্নি পরীক্ষার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ পরীক্ষায় হকপন্থীদের পক্ষে কোন পার্থিব সাহায্য এগিয়ে আসেনি এবং বাতিলপন্থীদেরও পার্থিব জীবনে কোন শাস্তি দেয়া হয়নি। ঈমানদার ও আল্লাহর পথে আহবানকারীদের মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করার জন্যে তাদের বাঞ্ছিত পথে এগিয়ে যাবার ফলে এরূপ

ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। এ জাতিয় ঘটনায় তাদের পক্ষে কোনই শক্তি এগিয়ে আসবে না। তাদের এবং তাদের ঈমানের বিষয়াবলী সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। এ অবস্থায় ঈমানদারদের দায়িত্ব হচ্ছে কর্তব্য কাজে অটল থেকে দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করা। তাদের কর্তব্য হচ্ছে একমাত্র আল্লাহকেই পরম ও চরম কাম্য হিসেবে গ্রহণ করা, আকীদা-বিশ্বাসকে জীবনের চেয়েও অধিক মূল্যবান মনে করা এবং অগ্নি পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হলে ঈমানী শক্তিতে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। ঈমানদারগণ এরূপ অবস্থায় অন্তর, মুখ এবং আমলের দ্বারা আল্লাহর দ্বীনের সত্যতার সাক্ষ্যদান করবে। আর দ্বীনের দুশমনদের পরিণাম কিরূপ হবে এবং দাওয়াতে দ্বীনের কাজ কিভাবে অগ্রসর হবে, এসব বিষয় আল্লাহ তাআলার উপর ছেড়ে দেয়াই উত্তম। ইসলামের অতীত ইতিহাসে যেসব পরিণামের নযীর রয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সে ধরনের পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারেন অথবা দ্বীনে হকের পতাকাবাহী ও বাতিলপন্থীদের জন্যে কোন নতুন পরিণামও নির্ধারণ করতে পারেন।

হকপন্থীগণ আল্লাহর দ্বীনের কর্মী। আল্লাহ তাদেরকে দিয়ে যে ধরনের কাজ করাতে চান ; যখন যে স্থানে ও যে পদ্ধতিতে কাজ করিয়ে নেন, ঠিক সেভাবেই কর্তব্য সম্পন্ন করে নির্দিষ্ট পুরস্কার গ্রহণই মু'মিনের দায়িত্ব। ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত তাদের নিজেদের হাতে নেই এবং এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতাও তাদের নেই। এটা একমাত্র প্রকৃত মালিক যিনি, তাঁরই কাজ। কর্মীদের এ বিষয়ে মাথা ঘামানোর কোনই প্রয়োজন নেই।

ঈমানদারগণ তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারের প্রথম কিস্তি তো দুনিয়াতেই হাসিল করেন। আর এ পুরস্কার হচ্ছে অন্তরের প্রশান্তি, চিন্তা ও উপলব্ধির উচ্চমান, উৎকৃষ্ট ধ্যান-ধারণা, পার্থিব লোভ-লালসা, ভয়-ভীতি ও দুঃখ-কষ্টের অনুভূতি থেকে মুক্তি লাভ। দ্বিতীয় কিস্তিও তাঁরা এ পৃথিবী থেকেই আদায় করে নেন। সে পুরস্কার হচ্ছে, ফেরেশতা মহলে তাঁদের সম্মান বৃদ্ধি ও তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা। পৃথিবীর গুণগ্রাহী লোকেরা তো তাদের প্রশংসা করেই থাকে। ফেরেশতা মহলে আলোচনা–উর্ধজগতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধিরই পরিচায়ক। পুরস্কারের সবচেয়ে বড় কিস্তিটি আখেরাতেই দেয়া হবে। সেখানে তাঁদের সহজ ও মামুলী ধরনের হিসেব-নিকেশ হবে এবং তাঁরা অপরিমিত লাভ করবেন। আর এসব কিস্তির মাধ্যমে দেয় সকল পুরস্কারের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হচ্ছে সকল কিস্তিতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। তাঁর অশেষ মেহেরবাণীতে তিনি মু'মিনদেরকে তাঁর কাজের জন্যে বাছাই করে নিয়েছেন এবং দুনিয়ায় আল্লাহর সৈনিক হিসেবে তাঁরই ইচ্ছানুসারে সকল কাজে ব্যবহার করার জন্যে তাঁদেরকে মনোনীত করেছেন। এটাও পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

কুরআন প্রদত্ত শিক্ষার ফলে ইসলামী আন্দোলনের প্রথম মহান কাফেলাটির মধ্যে উল্লেখিত ধরনের চরিত্র উচ্চতম মান অর্জন করেছিল। তাঁরা আল্লাহর সৈনিক হিসেবে কাজ করার প্রেরণায় নিজেদের সত্তা ও ব্যক্তিত্ব ভুলে গিয়েছিলেন এবং সকল অবস্থায় ও সকল সময়ই তাঁরা আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট ছিলেন।

কুরআনের পাশাপাশি নবী করিম (স)-এর প্রশিক্ষণের ফলে জান্নাতের দিকে তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে কোন মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত অটল-দৃঢ়তার সাথে নিজেদের দায়িত্ব পালন করার মনোভাবও গড়ে উঠে। আল্লাহর মীমাংসাই দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্যে তাঁদের নিকট পরম ও চরম কাম্য ছিল। হযরত আম্মার (রা) ও তাঁর মাতা-পিতাকে যখন মক্কার যালিমরা চরম দৈহিক নির্যাতনের শিকারে পরিণত করেছিল তখন নবী (স) স্বচক্ষে তাদের অবস্থা দেখেন এবং মাত্র এ কথা কয়টি উচ্চারণ করেন ঃ

صَبْرًا اٰلِ يَاسِرْ مَوْعِدُكُمُ الْجَنَّةِ

"ইয়াসিরের লোকজন, তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, তোমাদের জন্যে জান্নাতের ওয়াদা পাকাপোক্ত হয়ে গেছে।"

খাত্তাব বিন আরাত (রা) বলেন, "আমরা নবী (স)-এর খেদমতে অভিযোগ করেছিলাম, তিনি তখন কাবা ঘরের দেয়ালের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কেন আল্লাহর দরবারে সাহায্যের আবেদন করছেন না ? কেনই বা আমাদের জন্যে দোয়া করছেন না ? তিনি জবাবে বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদের সময় মানুষকে ধরে জীবন্ত প্রোথিত করা হতো। এ ছাড়াও করাত দিয়ে তাদেরকে জীবন্ত চিরে ফেলা হতো। লোহার চিরণী দিয়ে হাড় থেকে গোস্ত ছিন্ন করে পৃথক করা হতো। কিন্তু তবু তাদেরকে দ্বীনে হক থেকে ফিরানো সম্ভব হয়নি। আল্লাহর কসম ! তিনি তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এমন সময় আসবে, যখন একজন আরোহী সানয়া থেকে হাযরামাওত পর্যন্ত একাকী ভ্রমণ করবে এবং পথিমধ্যে তাকে আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করতে হবে না। আর তার মেষ পালের উপর নেকড়ে বাঘের সম্ভাব্য আক্রমণ ছাড়া অন্য কোন বিপদের আশংকা থাকবে না। কিন্তু তোমরা খুবই অধৈর্য হয়ে পড়েছ।"

আল্লাহর প্রতিটি কাজেই কল্যাণকর উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকে। তিনি সমগ্র সৃষ্টি জগত পরিচালনা করেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা সৃষ্টির খবরা-খবর সম্পর্কে তিনি সর্বদা অবহিত থাকেন। দুনিয়াতে যা কিছু ঘটে তাঁরই

ব্যবস্থাপনায় তা ঘটে। অদৃশ্য জগতে যে কল্যাণকারিতা লুকিয়ে আছে তা শুধু তিনিই অবগত আছেন। লুকানো কল্যাণ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীনেই ইতিহাস রচনা করে এবং তাঁরই মরযী মাফিক ঘটনাবলীর রহস্য এক সময়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

কোন কোন সময় কয়েক শতাব্দী পর অতীত ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। অথচ ঘটনাবলীর সমাকালীন যুগের মানুষ সে সবের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেনি। তারা তাদের যুগে কেবলই প্রশ্ন করেছে, 'এসব কি ? হে পরওয়ারদিগার ! এসব কি ঘটছে এবং কেন ঘটছে?' ইত্যাদি। এ ধরনের প্রশ্ন অজ্ঞতারই পরিচায়ক। তাই মু'মিন এসব প্রশ্নও উত্থাপন করে না। কারণ তারা ভালভাবেই বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাআলার সকল কাজেই হিকমত ও কল্যাণ নিহিত আছে। মু'মিনের ধ্যান-ধারণার ব্যাপকতা, স্থান, কাল ও পাত্রের মূল্যবোধ ও দূরদৃষ্টি তাকে এ ধরনের চিন্তা থেকে দূরে রাখে। সে পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তি ও আনুগত্যের মনোভাব নিয়ে আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত পথে দ্বীনি কাফেলার সাথে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলে।

কুরআন পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফতের দায়িত্ব বহন করার যোগ্য অন্তর তৈরী করছিল। এ জন্যে এমন অন্তরের প্রয়োজন, যেগুলো হবে বলিষ্ঠ, পবিত্র এবং নিষ্ঠাবান। দ্বীনের পথে অগ্রসর হতে গিয়ে এসব অন্তর সবকিছু কুরবানী দিতে প্রস্তুত। সাহসিকতার সাথে প্রতিটি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে উৎসাহী। অপরদিকে পার্থিব ধন-সম্পদের পরিবর্তে আখেরাতের সুখ-সমৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধকারী এবং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই সে হৃদয়ের পরম কাম্য। অর্থাৎ এমন অন্তর তৈরী হবে যে, আমরণ দারিদ্র, দুঃখ কষ্ট ও দৈহিক নির্যাতনের মুকাবিলায় ত্যাগ ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করবে। এবং অতি দ্রুত সুফল প্রাপ্তির কোন আশা করবে না। এমন কি দাওয়াতে দ্বীনের প্রসার, ইসলামের বিজয়, মুসলমানদের ক্ষমতা ও প্রাধান্য লাভ অথবা পূর্ববর্তী কালে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের দুশমনদের যেভাবে পাকড়াও ও ধ্বংস করেছেন ঠিক সেভাবে সমসাময়িক যালিম এবং আল্লাহদ্রোহী দলের ধ্বংস ও পরাজয় ত্বরান্বিত করার জন্যেও উৎকণ্ঠিত হবে না।

যখন উল্লেখিত ধরনের অন্তর তৈরী হয়ে যায় এবং তা পার্থিব জীবনে প্রতিদানের আশা ব্যতীতই দ্বীনের দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকে, আখেরাতকেই হক ও বাতিলের প্রকৃত মীমাংসার ক্ষেত্র বিবেচনা করে আর যখন আল্লাহ তাআলা তাদের আন্তরিকতা, দৃঢ়তা, ত্যাগ ও ঐকান্তিকতায় সন্তুষ্ট হন তখন তিনি দুনিয়াতেই তাদের সাহায্য করেন। পৃথিবীতে খেলাফত

পরিচালনার পবিত্র আমানত তাদের হাতে সোপর্দ করেন। মু'মিনদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে নয় বরং দ্বীনে হকের স্বার্থেই তাদেরকে এ আমানত অর্পণ করা হয়।

এ মহান দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা ও অধিকার তারা সে দিনই অর্জন করেছে, যেদিন দুনিয়ায় সম্ভাব্য প্রতিদানের কোন প্রতিশ্রুতি ব্যতিরেকেই তারা এ পথে অগ্রসর হয়েছে এবং তাদের দৃষ্টি পার্থিব স্বার্থের পরিবর্তে পরকালীন স্বার্থের দিকে নিবদ্ধ হয়েছে। তারা যেদিন আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অপর সকল প্রতিদানের আকাংখা পরিত্যাগ করেছিল, সে দিন থেকেই তারা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের যেসব আয়াতে মু'মিনদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের ওয়াদা করা হয়েছে গনীমাতের ধন-সম্পদ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, দুনিয়াতেই কাফেরদের ধ্বংস করার সতর্কবাণী শুনানো হয়েছে, সেসব আয়াতই মদীনায় নাযিল হয়েছে।

মু'মিনদের অন্তর থেকে পার্থিব স্বার্থের সকল কামনা বিদূরিত হবার পর আল্লাহ তাআলা স্বয়ং অগ্রসর হয়ে তাদেরকে সাহায্য দানের সুসংবাদ প্রদান করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র দ্বীনকে মানব সমাজের জীবন বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই ঐরূপ সাহায্য দানের ওয়াদা করেন। মু'মিনদের কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ ও সাহসিকতার পুরস্কার স্বরূপ তাদের প্রতি পার্থিব জীবনে সাহায্য নাযিল হয়নি বরং এটা আল্লাহ তাআলার নিজেরই সিদ্ধান্ত ছিল। আর এ সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত কল্যাণকারিতা আমরা আজ উপলব্ধি করতে পারছি।

দাওয়াতে দ্বীনের কাজে আগ্রহী সকল দেশ, জাতি ও বংশের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এ বিষয়টি সম্পর্কে ভালো করে চিন্তা করা প্রয়োজন। এ সূক্ষ্ম বিষয়টিই দাওয়াতে দ্বীনের সমগ্র পথ ও তার প্রতিটি মনযিল ও মোড় সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে এবং যারা পরিণাম ফলের তোয়াক্কা না করেই পথের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌছতে দৃঢ়সংকল্প, তাদের অন্তরে অটল ধৈর্যশক্তি দান করে। তারা মনে করে, আল্লাহ তাআলা দাওয়াতে দ্বীন ও এ পথের আহবায়কদের যে পরিণামই নির্ধারণ করে রেখেছেন, তা যথার্থ। তারা সহকর্মীদের মৃতদেহের উপর দিয়ে—চরম বিপদ সংকুল খুনরাঙ্গা পথ ধরে এগিয়ে যাবার সময় আশু বিজয় লাভের আশায় উদগ্রীব হবে না। অবশ্য স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই যদি দাওয়াতে দ্বীনের আন্দোলনকে পূর্ণত্ব প্রদান করে তার দ্বীনকে মু'মিনদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহলে সে তো ভালো

কথা। অবশ্য যদি এরূপ সিদ্ধান্ত হয় তবে তা নিছক আল্লাহ তাআলারই মর্জী বলতে হবে—মু'মিনদের কষ্টসহিষ্ণুতা ও ত্যাগের পুরস্কার স্বরূপ নয়। কারণ, এ পৃথিবী কর্মফল প্রাপ্তির ক্ষেত্র নয়।

গর্ত খননকারীদের কাহিনীর উপর মন্তব্য প্রসংগে কুরআন অপর একটি তথ্যের প্রতিও ইঙ্গিত করেছে। আমাদের প্রত্যেককেই সে বিষয়ে মনোযোগ দেয়া উচিত। কুরআন বলে—

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلاَّ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ○

"এবং এ ঈমানদার লোকদের সাথে তাদের শত্রুতার একমাত্র কারণ ছিল এই যে, তারা প্রবল পরাক্রান্ত ও সপ্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে।"—বরুজ ঃ ৮

সকল যুগের ও সকল বংশের লোকদেরই গভীর মনোযোগ সহকারে আয়াতে বর্ণিত তথ্য সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। ঈমানদার ও বিরোধী দলের মধ্যে লড়াই অনুষ্ঠিত হয় শুধু মাত্র ঈমান-আকীদা ও চিন্তাধারার পার্থক্যের দরুন। অন্য কোন পার্থিব স্বার্থের কারণে নয়। বিরোধী পক্ষ মু'মিনদের ঈমানকে সহ্য করতে পারে না। তাদের সকল ক্রোধ ও শত্রুতার মূল কারণ হচ্ছে মু'মিনদের আকীদা-বিশ্বাস। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, অর্থনৈতিক স্বার্থ অথবা বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন, এ লড়াইয়ের লক্ষ্য কখনই নয়। এ জাতীয় বিরোধ তো সহজেই মিটানো অথবা নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। কিন্তু এখানে তো নির্ভেজাল আদর্শের লড়াই চলছে। বিরোধের বিষয়বস্তু হচ্ছে, "কুফরী ব্যবস্থা চলবে, না ঈমান? জাহেলিয়াত থাকবে, না ইসলাম?"

মক্কার মুশরিকগণ নবী (সা)-এর নিকটে ধন-সম্পদ, শাসন ক্ষমতা ও অপরাপর পার্থিব সুযোগ সুবিধা দানের প্রস্তাব পেশ করেছিল। তাদের শর্ত ছিল মাত্র একটি। আর সেটি হলো, নবী করিম (স) যেন আকীদা-বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব-কলহ বন্ধ করে তার বিনিময়ে তাদের নিকট থেকে অন্য সুযোগ-সুবিধা ও স্বার্থ আদায় করে নেন। নবী (সা) যদি তাদের ইচ্ছা পূরণে সম্মত হতেন, তাহলে তো মুশরিকদের সাথে তাঁর কোন বিবাদই থাকতো না। তাহলে, বুঝা গেল যে, ঝগড়ার মূল বিষয় হচ্ছে ঈমান ও কুফর অর্থাৎ জীবন সম্পর্কিত আকীদা-বিশ্বাস। যে ক্ষেত্রেই দুশমনদের সম্মুখীন হোক না কেন, মু'মিনদের সর্বদা বিবাদের মূল বিষয়টি সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। কেননা, শত্রু দলের শত্রুতা ও ক্রোধের কারণ হচ্ছে এই যে, মু'মিনগণ সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তারা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই আনুগত্য করে—শুধু তাঁরই সামনে মাথা নত করে থাকে।

শত্রুপক্ষ মু'মিনদেরকে লড়াইয়ের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে বিভ্রান্ত করা এবং তাদের অন্তরের প্রজ্জলিত ঈমানের অগ্নিশিখাকে নিভিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে আকীদা-বিশ্বাসের লড়াইকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা গোত্রীয় বিবাদের রূপ দেয়ার অপচেষ্টা চালাতে পারে। তাই মু'মিনদের কখনো প্রতারিত হলে চলবে না। তাদের বুঝতে হবে যে, পরিকল্পিত উপায়ে ষড়যন্ত্র মারফত তাদের পদচ্যুত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ যুদ্ধে যারা এ জাতীয় ধূঁয়া তোলে, তারা প্রকৃতপক্ষে মু'মিনদেরকে চূড়ান্ত বিজয়ের অমূল্য হাতিয়ার থেকে বঞ্চিত করতে আগ্রহী। এ বিজয় আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, গর্তে নিক্ষিপ্ত ঈমানদারদের মত অটল মানোন্নয়ন জনিত পার্থিব লাভের আকৃতিতেও অর্জিত হতে পারে।

আজকের দুনিয়াতে, বিশেষ করে, খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রতারণামূলক প্রচার ও ইতিহাস বিকৃতকরণ প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা বিভ্রান্তির অপচেষ্টা প্রত্যক্ষ করছি। তারা বলে বেড়াচ্ছে যে, ক্রুশ যুদ্ধের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্য লাভ। তাদের এ উক্তি একেবারেই মিথ্যা। সত্যি কথা এই যে, ক্রুশ যুদ্ধের অনেক পরে ক্রুশ পন্থীদল সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ ধারণ করে। কারণ, ক্রুশীয় আকীদা-বিশ্বাসের পক্ষে মধ্যযুগে যেরূপে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভবপর ছিল ঠিক সেরূপে আজ পুনরায় ময়দানে আসা সম্ভব নয়।

এ জন্যে তাদেরকে নতুন মুখোশ ধারণ করতে হয়েছে। কারণ ক্রুশের আকীদা বংশ-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে রচিত গলিত ধাতু নির্মিত প্রাচীরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। উল্লেখিত মুসলমানগণের মধ্যে কুর্দ গোত্রের সালাহুদ্দীন, মামলুক গোত্রের তুরান শাহ প্রমুখ ব্যক্তিগণ নিজেদের গোত্রীয় ও বংশীয় পার্থক্য ভুলে গিয়ে শুধু ঈমানী শক্তিকে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেন এবং একমাত্র ইসলামের পতাকা হস্তে বিজয় লাভ করেন।

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلاَّ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ○

"ঈমানদারদের সাথে তাদের শত্রুতার একমাত্র কারণ হচ্ছে এটা যে, তারা (ঈমানদারেরা) প্রবল পরাক্রান্ত ও সদা প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিলেন।"—বরুজ ঃ ৮

আল্লাহ তাআলার বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য এবং প্রবঞ্চক, ভোজবাজ ও অত্যাচারী দল মিথ্যাবাদী ও পথভ্রষ্ট।

সমাপ্ত